ইতিহাস-দর্শন চর্চার আলোকে পঞ্চানন বর্মার চিন্তন

ড. রাজর্ষি বিশ্বাস
গবেষক ও শিক্ষক
জোড়পাটকি হাইস্কুল, কোচবিহার

প্রাক্‌কথন

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বঙ্গদেশে ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে বিভিন্ন পন্ডিতবর্গ চিন্তাভাবনা কোন স্তরে ছিল— তা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি মধ্যেই স্পষ্টত উল্লেখ আছে। তিনি বলেছিলেন, যে কোনও জাতির গর্বের কারণ লৌকিক ইতিহাসের সৃষ্টি বা উন্নতি। উনিশ শতকে নেবুর, র‍্যাঙ্কে প্রমূখ পণ্ডিতরা ইতিহাসকে জ্ঞানের স্বতন্ত্র শাখা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন; পজিটিভিজম-এর তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন বিভিন্ন ঐতিহাসিকেরা; ইতিহাসের বস্তুবাদী আলোচনা যখন শুরু হয়েছে, তখন বঙ্গদেশে ইতিহাস চিন্তা চেতনার সামান্য উন্মেষ ঘটলে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এ' জাতীয় উক্তি থেকে বিরত থাকতেন। তবে এ' উক্তি ক্রমে শিক্ষিত বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে নিঃসন্দেহে ইতিহাস চেতনায় ও অনুসন্ধানে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইতিহাস চিন্তা চেতনার এই বিলম্বিত অধ্যায়ের পেছনে অনেক কারণ ছিল। এ' ক্ষেত্রে শুধু যে আধুনিক শিক্ষার অভাব ছিল তাই নয়, সামাজিক প্রতিবন্ধকতা ও সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ছিল অন্যতম কারণ। ব্রিটিশরা এ' দেশে শাসনভার গ্রহণ করার পর প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তারা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও স্থানীয় ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন— যেগুলি উত্তরকালে ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। যদিও এই বিবরণগুলি ছিল নিতান্তই একপেশে ও পক্ষপাতদুষ্ট এবং এ' সবের ঐতিহাসিকতা নিয়েও একাধিক সংশয়ের উদ্রেক হয়।

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ১৭৮৪-তে উইলিয়াম জোনসের উদ্যোগে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' গঠন এ' দেশের ইতিহাস চর্চার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জোনস, কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখরা ছাড়াও; বহু গবেষক ও পণ্ডিতেরা প্রাচীন ভারতের গৌরবময় উপাদান আবিষ্কারের নেশায় মেতে ওঠেন। শুধু প্রাচীন ভারতেরই নয়, মধ্যযুগেরও ইতিহাস অনুসন্ধানেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন অনেকে। তবে স্থানীয় স্তরের ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করা এবং তা লিপিবদ্ধ করার প্রবণতা পরিলক্ষিত হতে আরও কিছুটা সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। ১৮১৭-তে প্রকাশিত জেমস মিলের প্রথম ভারতের ইতিহাস বিষয়ক 'History of British India' গ্রন্থটির পক্ষপাতদুষ্টতা ভারতীয় পন্ডিতবর্গকে সচেতন করে তোলে সঠিক ইতিহাস অন্বেষণের জন্য। সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের অপমানসূচক ও একবগ্গা ইতিহাসের বিরুদ্ধে ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধানের কাজে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক পেশাদার ও অপেশাদার ঐতিহাসিকরা মূলত যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, সেগুলি হল— সংস্কৃত পুঁথি সংগ্রহ করা ও আঞ্চলিক সাহিত্যগুলি থেকেও তথ্যসমূহ সংগ্রহ করা; পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক উপাদানগুলিকে সংগ্রহ করা; বুরঞ্জি বা ক্রোনোলজিগুলিকে ইতিহাস রচনা কাজে লাগানো প্রভৃতি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ইতিহাস রচনা সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সর্বভারতীয় বিষয়গুলিকেই অতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এর ফলে স্থানীয় ঐতিহ্য ও জনজীবন ইতিহাস গবেষণা অঙ্গনে সম্পৃক্ত হয়নি। এই অবহেলায় ইতিহাস ছিল কার্যত বৈচিত্রহীন। তবে এই শতকের বিশেষত দ্বিতীয়ার্ধ ছিল এক যুগসন্ধিক্ষণের কালপর্ব। এ' সময়ে শিল্পপুঁজির একচেটিয়া আধিপত্য বৃদ্ধি, শিল্পায়নের সূচনা, রেল ও টেলিগ্রাম ব্যবস্থার সূচনা, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাজারের সম্প্রসারণ অনেকাংশে দেশের বস্তুগত উন্নয়নের সহায়ক হয়। এছাড়াও মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার ও মানোন্নয়ন এবং আধুনিক শিক্ষার প্রচলনের ফলে এদেশে শিক্ষা, ধর্মীয়-সামাজিক সংস্কার, অতীতের পুনরুজ্জীবন ইতিহাস চিন্তাচেতনা ও দেশাত্মবোধ এবং সংগঠিত সামাজিক ক্রিয়াকলাপের সূচনা ঘটে, যা বহু ক্ষেত্রে সামাজিক সংহতির পরিসরকে বৃদ্ধি করে যেমন, তেমনিই অতীত ঐতিহ্যের প্রতি মনোনিবেশ করায়। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৮-এ 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের পর উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিতদের একাংশ স্থানীয় স্তরে ইতিহাস অনুসন্ধানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রশাসকরা প্রশাসন পরিচালনার স্বার্থে স্থানীয় ইতিহাস রচনা শুরু করেন। বিশেষত ১৮৭২ সালে প্রথম সেন্সাস শুরু হলে জেলাভিত্তিক পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এরই সূত্র ধরে এ' দশকেই W.W Hunter *Statistical Accounts of Bengal* নামে বঙ্গদেশের জেলাভিত্তিক ভৌগোলিক

বিবরণ, জনসংখ্যা, জনগোষ্ঠীর বিবরণ সহ আংশিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থগুলি প্রশাসনিক স্বার্থে লিখিত হলেও, তা পরোক্ষে বঙ্গদেশের ইতিহাস চেতনা জাগরণের সহায়ক হয়।

পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস চিন্তা চেতনা

উনিশ শতকের এই প্রেক্ষিতে অনুন্নত অবিভক্ত বঙ্গদেশের উত্তরাঞ্চলে বিশেষত কুচবিহার রাজ্যে ইতিহাস চর্চার যে সূচনা হয়ে যায়, তা বিচ্ছিন্ন কোনও ঘটনা ছিল না। প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের অংশবিশেষ রূপে এই রাজ্যের সমৃদ্ধ ইতিহাসের এক গরিমা ছিল। বঙ্গদেশের উত্তরপ্রান্তে অবস্থিত কুচবিহারের অতি প্রান্তিক গ্রাম খলিসামারি থেকে উঠে এসে পঞ্চানন বর্মা যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছিলেন— তা আজও বিস্মিত করে। কারণ উনিশ শতকের শেষ ভাগেও যেখানে বৃহৎ বঙ্গে শিক্ষার হাল ছিল হতাশাব্যঞ্জক; সেখানে গ্রামীণ এলাকা থেকে উঠে আসা এক পড়ুয়ার এম.ই পরীক্ষায় রাজশাহী বিভাগের মধ্যে প্রথম স্থান দখল করা ছিল একটি বিস্ময়কর ঘটনা। এমনকি তাঁর সংস্কৃতে এম.এ ও বি.এল ডিগ্রি অর্জনও ছিল নিঃসন্দেহে এক বিরল ঘটনা। শুধু রাজবংশী সমাজেই নয়, সমগ্র রাজ্যে তাঁর মতো উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা ছিল নিতান্তই হাতেগোনা। এ' রকম কৃতি ও মেধাবী মানুষ ইতিহাস চিন্তা চেতনা বিবর্জিত হবেন— এটা কল্পনাতীত। তবে এ' বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও চর্চা ঠিক কোন মুহূর্ত থেকে শুরু হয়েছিল তা নির্ণয় করা দুরুহ হলেও, একটি সম্ভাব্য সময়কাল নির্ণয় করা অসম্ভব নয়।

W.W Hunter লিখিত *Statistical Accounts of Bengal* গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে বহু তথ্য যেমন উঠে এসেছে, তেমনই অনেক ইতিহাস চাপা পড়ে যায় অন্ধকারে। তা সত্ত্বেও এর 'দশম খন্ড'টি প্রাথমিক পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের ক্ষেত্রে ছিল যথেষ্টই সহায়ক। কারণ এই খন্ডে কুচবিহার রাজ্য সহ জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হয়েছে। এই শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস রচনায় অধিক আগ্রহ দেখা যায়নি। অথচ রাজ্যের শাসকবৃন্দ প্রত্যেকেই ছিলেন শিক্ষানুরাগী। আসলে তখনও ইতিহাস লিখনের গুরুত্ব ও প্রয়োজন সেভাবে অনুভূত হয় নি। তথাপি বৃহৎ বঙ্গের অন্যত্র যখন ইতিহাস বিষয়ে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস রচনা

কাজ শুরু হয়। তবে তা ছিল সম্পূর্ণরূপেই রাজসভাকেন্দ্রিক ও রাজস্তুতি নির্ভর। ইতিহাস রচনার ঊষাকালে মুন্সী জয়নাথ ঘোষের 'রাজোপাখ্যান' এবং বৃন্দেশ্বরী দেবীর 'বেহারোদন্ত' শীর্ষক গ্রন্থ দু'টি মূলত রাজপরিবারের ঐতিহাসিক আখ্যানধর্মী বৃত্তান্ত বলেই চিহ্নিত হয়। তবে মন্থর গতিতে হলেও, পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট হতে থাকে। এ' শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা ইতিহাস রচনার কাজে হাত দেন। ১৮৬৪-তে স্থাপিত 'কোচবেহার হিতৈষিণী সভা'-র অধিবেশনে আনন্দচন্দ্র ঘোষের 'কোচবেহারের ইতিহাস' শীর্ষক বক্তৃতাটি হান্টারের উল্লেখিত গ্রন্থ প্রকাশের এক দশকেরও অধিক সময় আগে রচিত হয়েছিল। এই বক্তৃতায় তিনি রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করেন, যা প্রথাগত লিখনধারার থেকে অনেকটা মুক্ত ছিল। এর প্রায় দু' দশক পর রাজ্যের অন্যতম প্রশাসনিক কর্তা যাদবচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৮৩-তে 'কোচবিহারের ইতিহাস' প্রকাশ করেন। এছাড়াও রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট ভগবতীচরণ বন্দোপাধ্যায় ১৮৮৫-তে 'কোচবিহারের ইতিহাস' শীর্ষক একটি তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তবে এ' গুলি মূলত ব্রিটিশ প্রশাসকদের দ্বারা লিখিত গেজেটিয়ার ঘরানার অনুরূপ সম্পূর্ণ বিবরণ ভিত্তিক ইতিহাস ছিল। কুচবিহারের প্রাচীন ইতিকথার পাশাপাশি জনসংখ্যা, নদ-নদী, ফ্লোরা ও ফোনা, প্রশাসনিক বিবরণ প্রাধান্য পায় এই গ্রন্থগুলিতে। অর্থাৎ ইতিহাস লিখনের সমস্ত প্রকরণগুলি এখানে অনুসৃত হয়নি।

পঞ্চানন বর্মা যেহেতু কুচবিহারের অধিবাসী ছিলেন, সেহেতু তাঁর এই রাজ্যের ইতিহাসের প্রতি অধিক আগ্রহ যে থাকবে তা অস্বাভাবিক নয়। উনিশ শতকের শেষ দশকে তিনি যখন উচ্চশিক্ষায় অধ্যায়নরত ছিলেন, তখনও পর্যন্ত হাতে গোনা এই গ্রন্থগুলিই ছিল কুচবিহার রাজ্যের ইতিহাস জানার নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। অথচ সে'গুলিতে রাজ্যের সমগ্র ইতিহাসের যথাযথ প্রতিফলন ঘটেছে, এমনটা নয়। ১৯০১-এ পঞ্চানন বর্মা রাজ্য ত্যাগের প্রাকমুহূর্ত পর্যন্ত এই গ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করেছেন— এ' কথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ তাঁর মতো একজন উচ্চশিক্ষিত পন্ডিত এতদঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকবেন, এ' কথা যুক্তিযুক্ত নয়। রংপুরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করার পর, তিনি সেখানকার বৌদ্ধিক সমাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যান। ১৯০৫-এর ২৪ এপ্রিল 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর শাখা হিসাবে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' গঠিত হলে প্রথম থেকেই তিনি

সেই সংগঠনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠক রূপে পরিচিত হয়েছিলেন। এই সংস্থার গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রকাশ সমিতির অন্যতম সদস্য যেমন ছিলেন; তেমনই পত্রিকা সম্পাদক হিসাবে তাঁর মনোনয়ন ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ রংপুর শহরের এলিট সমাজ সহজে সবাইকে মান্যতা দিতে প্রস্তুত ছিল না। অথচ এই সংগঠনে এবং গ্রন্থ ও পত্রিকা কমিটিতে বর্ণ হিন্দু সদস্যদের আধিপত্য সত্ত্বেও দেখা গেল, তাঁকেই সম্পাদক রূপে মনোনীত করা হয়েছে। সে' সময়ের বিচারে তা নেহাত তুচ্ছ ঘটনা ছিল না। রংপুর শহরে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি নিজ প্রতিভা ও পান্ডিত্যের পরিচয় প্রমাণে সমর্থ হন। 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' গঠনের সময়ে এতদঞ্চলের ইতিহাস ও ঐতিহ্যকে যেভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছিল, তাতে পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ভূমিকাকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। এই পরিষদের মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তরবঙ্গ ও আসামের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলির আবিষ্কার করা ও ইতিহাস রচনায় সেগুলিকে প্রামাণ্য হিসেবে তুলে ধরা; দুষ্প্রাপ্য নথি পুথি ও গ্রন্থ সংগ্রহ করে সেগুলি প্রকাশ করা; প্রাচীন নিদর্শনগুলির সংগ্রহ ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা; স্থানীয় ভাষা, বাংলা সাহিত্য চর্চার সহায়তা করা; শিল্পকলার গবেষণা এবং প্রাচীন রাজবংশগুলি ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা। অর্থাৎ এই কর্মকান্ডের মধ্যে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর অন্যতম কর্মকর্তা হিসাবে পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস চেতনার আভাস পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ব্যক্তিগত ভাবে সংগ্রহ করা বহু দুষ্প্রাপ্য পুঁথি এই পরিষদের পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন বলেই এতদঅঞ্চলের মানুষের মধ্যে ইতিহাস চেতনা বৃদ্ধি পায়।

পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস চিন্তা-চেতনার স্ফুরণ ঘটে তাঁর সম্পাদিত 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর পত্রিকায়। তিনি ইতিহাস বিষয়ক লেখাগুলিকে পত্রিকায় যথাযোগ্য স্থান দিতেন। যেমন সুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী 'প্রাচীন কামরূপ', হরগোপাল দাস কুন্ডুর 'করোতোয়া', কালীকান্ত বিশ্বাসের 'গরুর স্তম্ভ লিপি' বা 'বোদাল স্তম্ভের শিলালিপি' প্রভৃতি ইতিহাস নির্ভর প্রবন্ধাবলীর প্রকাশ তারই ইঙ্গিত দেয়। শুধু কুচবিহার রাজ্য ও কামরূপের ইতিহাস সম্পর্কে পঞ্চানন বর্মা সম্যক ধারণা ছিল তাই-ই নয়, সমগ্র বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্পর্কেও তাঁর সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল। আর এর প্রমাণ পাওয়া যায় 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ'-এর পত্রিকায় তাঁর লিখিত সম্পাদকীয়গুলিতে। সে' সময়ের স্থানীয় ইতিহাস অনেক ক্ষেত্রেই মৌখিক ইতিহাস

নির্ভর হওয়ায় তথ্যের অসামঞ্জস্যতা ও বিভ্রান্তির দোষে দুষ্ট ছিল। 'আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' গঠনের পর থেকে ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকরা বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের ওপর জোর দিলে প্রচলিত ধ্যান-ধারণায় পরিবর্তন আসে। উপরন্তু স্থানীয় স্তরে অনেক তথ্যভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়। যদিও স্থানীয় পণ্ডিতেরা পুরনো মনগড়া অনেক তথ্য ও ইতিহাস আঁকড়ে ধরে রাখেন। পঞ্চানন বর্মা ছিলেন এ' ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। তিনি যে প্রকৃত অর্থেই ইতিহাস সচেতন এক ব্যক্তি ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়— যখন কানিংহাম প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানী হিসাবে মহাস্থানগড়কে চিহ্নিত করেন, তখন তিনি সেই মতকে দ্বিধাহীন কণ্ঠে সমর্থন জানান এই পত্রিকায়। অর্থাৎ ইতিহাসের প্রথাগত ধারণাগুলি থেকে বেরিয়ে এসে নতুন অন্বেষণকে তিনি স্বাগত জানিয়েছিলেন। আবার সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন পুঁথিগুলি অনুসন্ধানে কতটা উৎসাহী ছিলেন তা-ও প্রমাণিত হয় গোবিন্দ মিশ্রের 'গীতা'-র আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। এ'গুলি কুচবিহার রাজ্যে থাকাকালীনই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন মূলত কুচবিহার ও মাথাভাঙ্গা পরগণা থেকে। অর্থাৎ এ' রাজ্যে থাকাকালীনই তিনি অতীত ও ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন।

খ্যাতনামা ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'উত্তরবঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন'-এ যোগ দিলে পঞ্চানন বর্মার সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক নিদর্শন, প্রাচীন পুঁথি, পুরাতাত্ত্বিক উপাদান প্রভৃতি অন্বেষণের ওপর জোর দিলে পঞ্চানন বর্মার কাছ থেকে সমর্থন ও সহযোগিতা পান। এই সহযোগিতার ফলে মৈত্রেয় মহাশয়ের কাজ অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল। সে' সময়ে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে পুঁথিগুলিরই গুরুত্ব ছিল সর্বাধিক। রংপুরে স্থায়ীভাবে থেকেও, কুচবিহার রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে তিনি যে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। তিনি পুঁথি ও ইতিহাসের উপাদানসমূহ সংগ্রহের জন্য রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে নির্বাচিত করেন। যেমন কুচবিহারের কেদারনাথ দাস, মাথাভাঙ্গার মুন্সী পসর মহম্মদ ও পদ্মনাথ দাস, দিনহাটার মহেন্দ্রনাথ অধিকারী, মেখলিগঞ্জের আমিরউদ্দিন আহমদ ও বড়মরিচার দেবীপ্রসাদ সরকার প্রমূখ ব্যক্তিত্ব। এঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সমাজে উচ্চশিক্ষিত ও স্বনামধন্য। রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা থেকে সুচিন্তিতভাবে এই পন্ডিতবর্গকে তিনি নির্বাচিত করেছিলেন যাতে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হয়।

পত্রিকার সম্পাদক রূপে পঞ্চানন বর্মা নিজ তাগিদেই অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ‘উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্বানুসন্ধান’ শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। শুধু উত্তরবঙ্গেরই নয়, পঞ্চানন বর্মা প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাস সম্পর্কে সম্যক ধারণা ছিল বলেই পৌন্ড্রদেশের অবস্থান সম্পর্কে বলেছিলেন, “হিমালয় হইতে বাহির হইয়া করোতোয়া নদী রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, জলপাইগুড়ি, পাবনা প্রভৃতি জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং করোতোয়া প্লাবিত দেশই পৌন্ড্রদেশ বলিলে ঠিক কোন স্থানকে বুঝাইতেছে, তাহা সঠিক বলা যায় না।” ১৯০৮-০৯-এ কুচবিহারের একাধিক রাজবংশী ও অ-রাজবংশী উচ্চশিক্ষিত মানুষ পঞ্চানন বর্মার সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— ১৯৩৬-এ প্রকাশিত ‘কোচবিহারের ইতিহাস’ গ্রন্থের প্রণেতা খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমদ। প্রকৃতপক্ষে এই ইতিহাস গ্রন্থ রচনায় পঞ্চানন বর্মার চিন্তা-চেতনার প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। কারণ পঞ্চানন বর্মা রাজ্যের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে প্রাচীন পুঁথিকে যেভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ঠিক সেই প্রণালী অনুসরণ করেই খাঁ চৌধুরী আহমতউল্লা আহমেদ রাজসভার মহাফেজখানায় সংরক্ষিত প্রাচীন পুঁথিগুলি থেকে প্রভূত তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়াও আসামের বুরুঞ্জিগুলিরও সাহায্যও নিয়েছিলেন। তবে লক্ষণীয় রাজ্যের ‘রিজেন্সি কাউন্সিল’-এর প্রধানরূপে মহারানি ইন্দিরা দেবীর প্রতি এই গ্রন্থে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হলেও, পঞ্চানন বর্মা ভূমিকা বা অবদানের কোনও উল্লেখই নেই। কারণ পঞ্চানন বর্মাকে ১৯২৬-এ ‘ডিপোর্টেশন অ্যাক্ট’ দ্বারা রাজ্য থেকে বিতাড়িত করেছিলেন স্বয়ং মহারানি ইন্দিরা দেবী। হয়তো সে’ কারণেই গ্রন্থের কৃতজ্ঞতা স্বীকারে মহারানির নামোল্লেখ থাকলেও, পঞ্চানন বর্মা অনুল্লেখিত থেকে যান। সামগ্রিকভাবে দেখলে, তখন রাজ্যে রাজপরিবার ও উচ্চপদস্থ রাজআমলাদের কাছে পঞ্চানন বর্মা ব্রাত্যই ছিলেন।

পঞ্চানন বর্মা সংস্কৃত ভাষায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করে ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে যতটা খ্যাতি অর্জন করেছিলেন ততটা আলোচনা তাঁর ইতিহাস বোধকে নিয়ে হয় নি। গবেষকরা কেন এ’ বিষয়ে অনুধ্যান করলেন না— তা কৌতূহল উদ্রেক করে বৈকি! তবে পেশাদারী ইতিহাসবিদ না হয়েও, তিনি যেভাবে একজন প্রকৃত ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিতে পরিণত হন, তা সবিশেষ উল্লেখের দাবি

রাখে। তাঁর ইতিহাস চিন্তা-চেতনাকে বিশ্লেষণ করলে প্রধানত দুটো প্রধান বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—

১. রাজবংশী জাতির উৎসের ইতিহাস অনুসন্ধান;

২. বৃহত্তর ও কামতা রাজ্যের গৌরবময় ইতিহাস অনুসন্ধান।

১. রাজবংশী জাতির উৎসের ইতিহাস অন্বেষণ

১৯১০-এর ১ মে ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র প্রথম অধিবেশনে পঞ্চানন সরকার সম্পাদকের প্রতিবেদনে যে বিস্তারিত বক্তব্য পেশ করেছিলেন— তাতে ক্ষত্রিয় সমিতি গঠনের উদ্দেশ্য, প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট করেন। সমিতি গঠনের পূর্বে তিনি যে ভাবে রাজবংশী জাতির উৎস অনুসন্ধান করেছেন তা তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট। তিনি প্রথমেই ‘ভঙ্গ ক্ষত্রিয়’ কথাটির বিরোধিতা করে ‘ব্রাত্য ক্ষত্রিয়’ ব্যবহারের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করেন এবং ১৯০১-এর জনগণনায় রাজবংশীদের কোচ বলারও বিরোধিতা করেন। এছাড়াও রাজবংশীদের মধ্যে আর্যদের প্রভাব যে আছে সে’ কথাও উল্লেখ করেন। পঞ্চানন বর্মার ইতিহাস অনুসন্ধানের এটাই ছিল অন্যতম প্রতিপাদ্য।

২. বৃহত্তর কামতা রাজ্যের ইতিহাস অন্বেষণ

রাজবংশীদের বীরত্ব তুলে ধরতে তিনি দেবী সিংহের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের গৌরবময় ইতিহাসকে স্মরণ করিয়েছেন। তাঁর মতে, অত্যাচারী দেবী সিংহের বিরুদ্ধে রংপুরে রাজবংশীরা অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেছিল বীরত্বের সঙ্গে এবং সেই রক্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কারণ বলে তিনি মনে করতেন। শুধু বীরত্বপূর্ণ লড়াই নয়, তিনি চিলা রায়ের নেতৃত্বে রাজবংশী সেনাদের বীরত্বের ইতিহাসও স্মরণ করেছিলেন। উক্ত ভাষণে তিনি চিলা রায়ের রাজ্যসীমারও উল্লেখ করেন— তাতে উত্তরে ধবলগিরি, পূর্বে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণে সাগর, পশ্চিমে পান্ডুয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিশাল রাজ্য যে গড়ে উঠেছিল, তা রাজবংশী যোদ্ধাদের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল বলে তিনি মনে করতেন। এই যুক্তির সারবত্তা খণ্ডন করা যায় না। এমনকি হোসেন শাহের কামতা রাজ্য ধ্বংসের প্রতিশোধও চিলারায় ও তাঁর সৈন্যরা নিয়েছিলেন। পঞ্চানন বর্মা শুধু চিলারায়ের বীরত্বের কাহিনীর মধ্যে এই অঞ্চলের ইতিহাসকে সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং তিনি দূর

অতীতের ইতিহাসকে তুলে ধরতে চেয়েছেন। উক্ত সভায় তিনি আরও জানিয়েছেন, কান্তেশ্বর রাজার উজ্জ্বল কীর্তি ছিল গোসানিমারি মন্দির প্রতিষ্ঠা; এছাড়াও এই অঞ্চলে গড় ও যুদ্ধপথগুলি প্রতিষ্ঠা করে তিনি এতদঞ্চলে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর মতে, বঙ্গের বিজেতা বখতিয়ার খলজির পরাক্রমশালী সৈন্যদেরকে প্রতিহত করেছিলেন এই অঞ্চলেরই স্থানীয় মানুষেরা। এরও আগে হর্ষবর্ধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভাস্করবর্মাকে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেন এখানকার স্থানীয় মানুষেরাই। অর্থাৎ পঞ্চানন বর্মা ইতিহাসের ঘটনাক্রম থেকে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, এতদঞ্চলে বহিরাগত আক্রমণের মুখে শাসকদের পাশে দাঁড়িয়ে বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করেছেন যে রাজবংশীরা তাঁরা কখনওই ‘ক্ষত্রিয়’ ভিন্ন অন্য কিছু হতে পারে না।

‘রংপুর সাহিত্য পরিষৎ’-এর প্রথম পত্রিকা অধ্যক্ষ বা সম্পাদক রূপে যে সাত বছর (১৩১৩ আশ্বিন থেকে ১৩১৯ পর্যন্ত) তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন— তা ছিল একজন ইতিহাস অনুসন্ধানীর মতোই। এ’ সময়ে তিনি বহু কথা, ছিল্কা আবিষ্কার করেছিলেন। ‘গোবিন্দ মিশ্রের গীতা’, রংপুরের বিভিন্ন রূপকথা-সহ একাধিক অতীত উপাদান সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গের ইতিহাস গবেষণায় নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের গতিপথ যে জটিল ও বৈচিত্রপূর্ণ! সেই চোরাগলিতে না গিয়েও, যে প্রকরণগুলি সমাজকে ঐক্যবদ্ধ ও নৈতিক অনুপ্রেরণা রূপে কাজ করবে— সেটুকুই হয়ে ওঠে তাঁর কাছে মূল প্রতিপাদ্য। তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন ইতিহাস চেতনা বিহীন শিক্ষা অসম্পূর্ণ। এই কালপর্বে এতদঞ্চলের ইতিহাস এবং পূর্বপুরুষদের গৌরবের আখ্যান আবিষ্কারে মনোনিবেশ করার ক্ষেত্রে তাঁর আরও বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল। কারণ গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সন্ধান যে তাঁর সামাজিক আন্দোলনের তাত্ত্বিক অবস্থানকে দৃঢ়তর করবে— সেই বাস্তব সত্য যথাযথ উপলব্ধি করেছিলেন। বিশেষত পূর্বপুরুষদের জ্ঞান, গৌরব ও মাহাত্ম্য পুনরুদ্ধার হলে জাতির ইতিহাস সমৃদ্ধ হবে বলেও বিশ্বাস করতেন। তাই তাঁর নিজের ও তাঁর নেতৃত্বাধীন ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র লক্ষ্যও হয়ে ওঠে অভিন্ন। মনে রাখতে হবে তখনও রাজবংশি জাতির প্রামাণ্য ইতিহাস রচনার কাজে সেভাবে কেউই অগ্রসর হন নি। আর এই কঠিন কাজ সম্পন্ন করা যেমন পরিশ্রম সাধ্য, তেমনই দুরূহ। কারণ ইতিহাস নির্মিতির জন্য প্রয়োজন প্রামাণ্য উপাদান।

এতদঞ্চলে ইতিহাস লিখনে বস্তুগত উপাদানের অভাবজনিত কারণে সমাজ জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা পরম্পরাগত উপাদানগুলি সংগ্রহের প্রয়োজন আবশ্যিক হয়ে পড়ে। ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র অষ্টম বর্ষের অধিবেশনে তাই বলা হল, “প্রচলিত কথা ও ছিল্কাগুলি একাধারে আনন্দ ও নীতি যোগাইয়া থাকে। এইগুলির আনন্দ যেমন নিত্য-নতুন, নীতি ও উপদেশগুলিও তেমন নিত্যসত্য, ইহার রচনাও তেমনই চমৎকার। এইগুলি সংগ্রহ করিয়া সমাজের প্রাচীন জ্ঞান-ভাণ্ডার ও আনন্দের ঝরণা উন্মুক্ত করিয়া সমাজের গোচর করিতে হইবে।” বিশেষত ‘রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা’-র সম্পাদক রূপে তিনি উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিস্তৃত ভূভাগে যে প্রত্নক্ষেত্রগুলি রয়েছে সেগুলির উৎখনন করে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ গঠনের পূর্বেই যে পঞ্চানন বর্মা এ’ সব বিষয়ে গভীর মনোনিবেশ যে করেছিলেন, তার একাধিক সাক্ষ্য রয়েছে। ১৯১২-এর ১৪ সেপ্টেম্বর ‘রংপুর সাহিত্য পরিষৎ’-এর সভায় পত্রিকা’-র সম্পাদক রূপে ‘কামতা-বরেন্দ্র’ ইতিহাস বিষয়ে পঞ্চানন বর্মা যে দীর্ঘ বক্তব্য উপস্থাপন করেছিলেন— তাতে তাঁর গভীর ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু মননের পাশাপাশি এতদঞ্চলের ইতিহাস সম্পর্কেও সম্যক ধারনার পরিচয় পাওয়া যায়। এই বক্তব্যে তিনি গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরার পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর ভাষায়, “বহু পূর্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে দেশের সভ্যতা, বরেন্দ্র-ধ্বংসের বহুকাল পরে মুসলমান রাজত্বের ধ্বংস প্রাপ্তির সময় পর্যন্ত ভারতময় জানিত ছিল, সেই কামতাবিহারের পরিচয় অনেকের অবিদিত নাই, তাহারও একটু পরিচয় প্রদান করিতেছি। এই কামতাবিহার বঙ্গদেশের সহিত সর্বদা পৃথক থাকিয়া সর্ববিষয়েই উৎকর্ষের পরিচয় দিয়াছে। রঙ্গপুর-সাহিত্য-পরিষৎ সেই কামতারই অঙ্কে স্থাপিত হইয়াছে। এককালে সমগ্র বরেন্দ্র এই কামতারই অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। গৌড়দ্বারে কামতার ধ্বজা প্রথিত হইয়াছিল। যে সময়ে মুসলমানদিগের হস্তে গৌড় আত্ম-সমর্পণ করিয়াছে, সে সময়েও কামতার শুক্লধ্বজ বা চিলারায়ের সৈন্যাপত্যে মহারাজ মল্লনারায়ণ হিন্দু স্বাধীনতা অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। বীর বক্তিয়ারকে এই কামতা রাজ্য জয় করিতে আসিয়া প্রাণ হারাইতে হইয়াছিল। বিক্রান্ত কামতার রাজধানী কামতাপুরের ১৪ মাইল ব্যাপী ধ্বংসাবশেষ কুচবিহারের ১২ মাইল দূরে অবস্থিত। এই কামতাপুরেই ভাস্কর-বর্মার রাজধানী ছিল। তাঁহার

রাজত্ব কুশীনদী হইতে যবদ্বীপ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। এই রাজ্যের কীর্তির অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আজও বিলুপ্ত হয় নাই। কুচবিহারের রাজধানীর পূর্বে চিলারায়ের কোট বলিয়া যে স্থান আছে, তাহাতে গলিত লৌহস্তূপ ২/৩ মাইল পরিসর স্থান ব্যাপিয়া এখনও বর্তমান আছে। যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শুক্লধ্বজের আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা ঐ স্থানেই ছিল।” অর্থাৎ স্পষ্টতই তিনি কুচবিহার রাজ্যের অতীত গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। লক্ষণীয় যে, তখনও এই ইতিহাস সম্পর্কে জনমনে কোনরূপ স্পষ্ট ধারনাই ছিল না।

‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ গঠনের পর আরও বৃহত্তর পরিসরে তিনি এতদঞ্চলের ইতিহাস সংরক্ষণ ও সচেতনতার ওপর জোর দেন। কারণ ততদিনে তিনি এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস প্রাচীন কালের এবং এর চর্চা একান্তই জরুরী। গৌড়, পৌণ্ড্রবর্ধন, মহাস্থানগড়, বান রাজাদের বাড়ি সবই সেই প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহণ করে। অথচ এই বিস্তৃত ভূভাগের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সেভাবে রচিত হয় নি। সে সময়ে শুধু গৌড়ের ইতিহাস নিয়ে কিয়দংশ গবেষণা শুরু হয়েছিল— যা উৎসাহ বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পঞ্চানন বর্মার দৃষ্টিতে এই বৃহত্তর ভূখণ্ডে প্রত্যেক পরিবার, গ্রাম, ধর্মীয় পীঠস্থান প্রভৃতির মধ্যে জড়িয়ে রয়েছে যে সব কিংবদন্তী ও প্রাচীন জনশ্রুতি, তা ইতিহাস রচনার সহায়ক। এ’ সব আবশ্যকীয় উপাদান সংগ্রহের জন্য ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’ সদস্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। এই বৃহত্তর কাজকে সুশৃঙ্খল উপায়ে সমাধানের জন্য তিনি যে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তা যে কোন ইতিহাস গবেষকের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক। তাঁর নেতৃত্বে ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র সুসংগঠিত রূপ সেই বৃহত্তর কর্মকাণ্ডের উপযোগী হয়ে ওঠে। ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র তৎকালীন বার্ষিক অধিবেশনে রংপুর, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর, গোয়ালপাড়া, বগুরা থেকে যে বিপুল সংখ্যক প্রতিনিধিরা (যা কখনও ৭/৮ হাজারের অধিক হত। অনেক সময় স্থান সঙ্কুলানও হত না।) নিয়মিত যোগ দিতে আসতেন, তাঁদেরকেই প্রথমে ইতিহাস চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এই প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও ইতিহাস চেতনা অনেকাংশেই ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ অতীতে উত্তরবঙ্গবাসীদের ইতিহাস উদাসীনতা পঞ্চানন বর্মাকেও গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই তিনি প্রথমেই অনুগামীদের মধ্যে ইতিহাস চেতনা জাগিয়ে তুলতে স্থানীয় স্তরের উপাদান সংগ্রহের

ওপর বিশেষ জোর দেন। কারণ তা সংগৃহীত না হলে ইতিহাস লিখনের কাজটি কার্যত অধরাই থেকে যাবে। ‘বৃত্ত বিবরণী’-র প্রতিবেদনগুলি পড়লে লক্ষ্য করা যায়— উত্তরবঙ্গের পথে প্রান্তরে ছড়িয়ে থাকা উপাদানগুলি সংগৃহীত করে ইতিহাস রচনার এই কঠিন কাজ কীভাবে সুসম্পন্ন করা যাবে তা নিয়ে কত গভীর ভাবে ভেবেছেন। বিশেষত ইতিহাস লিখন প্রণালী নিয়ে চর্চার অভাবে তখনও বঙ্গদেশে ছিল প্রকট। এমনকি অনেকের মধ্যেই এ’ বিষয়ের স্বচ্ছ কোনও ধারনাও ছিল না। আর স্থানীয় বা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চায় উদাসীনতা তো ছিল সীমাহীন!

তবু এই প্রেক্ষিতেই ১৩২৭ বঙ্গাব্দের ‘ক্ষত্রিয় সমিতি’-র একাদশ সম্মিলনীতে একাদশ প্রস্তাব ছিল ‘জাতীয় জ্ঞান ভাণ্ডার ও ইতিহাস’-এর নির্মাণ করা হোক। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন পঞ্চানন বর্মার ভাবশিষ্য প্রসন্নকুমার বর্মা। তিনি ‘ক্ষত্রিয়’ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করার প্রসঙ্গে তিনি সভায় বলেছিলেন, “তথ্য নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। সংগ্রহ করিয়া একত্র করিতে পারিলে ধারাবাহিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা যায়, জ্ঞান ভাণ্ডার সংগৃহীত হয়।” উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ ছিল— ক. পরম্পরাগত পরাণি কথা; খ. রূপকথা; গ. কিংবদন্তী; ঘ. কথা ও ছিল্কা; ঙ. দেশের পূর্ব কীর্তির চিহ্ন বিবরণ ও সে বিষয়ে পরম্পরাগত সংবাদ; চ. পূর্ব চিহ্নের ও পূর্ব ঘটনার নিদর্শনের সংগ্রহ করা। প্রসন্নবাবুর এই প্রস্তাব ইতিহাস গবেষণায় সময়োপযোগী ছিল। আর এই প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন স্বয়ং পঞ্চানন বর্মা। তিনি সম্যক জানতেন, এতদঞ্চলের যে সমৃদ্ধ অতীত ছিল— তা পুনরুদ্ধার করতে না পারলে তাঁর সামাজিক আন্দোলনের গতি শ্লথ হয়ে যাবে। মানুষের উৎসাহেও ভাঁটা পড়বে। সর্বোপরি ইতিহাস বিচ্যুত হলে কোন জাতিরই কাঙ্খিত উন্নয়ন হয় না। তাই মানুষকে সংঘবদ্ধ করা ও আন্দোলনের প্রেরণা জাগিয়ে তুলতে ইতিহাস চেতনার উন্মেষ জরুরী। এতদঞ্চলের ইতিহাস নির্মাণের সীমাবদ্ধতা নিয়েও সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। সে দিকে চোখ খোলা রেখেই ওই সভায় তিনি বলেছিলেন, “আমরা এখন গৌরবহীন, দীনবেশী। আমাদের দেশেরও বর্তমান গৌরবের কিছু নাই। কিন্তু আমাদের কতকগুলি চিন্তা, ভাবনার কথা আছে। সেগুলি যেন একালের এদেশের বা এ অবস্থার নয়। আমাদের দেশের কতকগুলি ভগ্নচিহ্ন আছে। সেগুলিও একালের বা এ অবস্থার নয়। চিরাগত সেই ভাব চিন্তা ও কথা অভ্যাসক্রমে পুনঃপুনঃ উদিত হইয়া পূর্বকালীয় মহোজ্জ্বল জ্ঞানের

কথা টানিয়া আনে। এদেশের সর্বতঃ পরিদৃষ্ট বিপুল ভগ্নাবশেষ পূর্বকালীয় উজ্জ্বল গৌরবের বিপুলা কীর্তির কথা বলিয়া দেয়; প্রাচীন উদ্ভস্বর মাহাত্ম্যের কথা ভাবাইয়া পূর্ব স্মৃতি জাগাইয়া দেয় এবং ব্যাকুল অন্তরে পূর্বাপর কালের অবস্থার তুলনা করাইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছড়ায়।" এর থেকে স্পষ্ট হয়ে যায়— এতদঞ্চলের ইতিহাস রচনায় তিনি কতটা ব্যাকুল ছিলেন।

প্রাথমিক পর্বের ইতিহাস অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সংরক্ষণের জন্য অনুগামীদের উদ্বুদ্ধ করে যান ধারাবাহিকভাবে। তিনি বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের প্রত্নস্থানগুলির গৌরব চিহ্ন রক্ষণাবেক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেন। আর সেটা যে শুধু কুচবিহারের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়— দিনাজপুরের বানরাজার গড়; রংপুরের উত্তরাঞ্চলে ধর্মপালের গড়; জলপাইগুড়ির বৈকুন্ঠপুর ও বোদার মধ্যবর্তী পৃথুরাজার গড় এবং অবশ্যই গোসানীমারী বা কামতাবিহারের খেন রাজাদের রাজপাট প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য সোচ্চার হন। লক্ষণীয় যে, এ' সব ধ্বংসাবশেষ খনন করা এবং প্রাপ্ত উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষার বিষয়ে অনেকেরই স্পষ্ট ধারনা ছিল না। 'ক্ষত্রিয় সমিতি'-তে এই প্রত্নক্ষেত্রগুলি সংরক্ষণের বিষয় যখন আলোচিত হচ্ছে— তখনও ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ সিন্ধু সভ্যতা বা হরপ্পা সভ্যতার উৎখনন করে নি। প্রত্নক্ষেত্র উৎখননের ফলে কীরূপ ঐতিহাসিক উপাদান সংগৃহীত হতে পারে— তা নিয়েও পণ্ডিতবর্গ বা ঐতিহাসিকদের মধ্যে স্পষ্ট ধারনা ছিল না। সেই প্রেক্ষিতেও পঞ্চানন বর্মা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পেয়েছেন— এই প্রত্নক্ষেত্র উন্মোচিত হলে এতদাঞ্চলের গৌরবের যে ইতিহাস কয়েক শত বছর ধরে চাপা পড়ে আছে, তা এক নতুন দিশা দেখাবে ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। পেশাদার ঐতিহাসিক না হয়েও, তিনি এক বৃহত্তর ইতিহাস উন্মোচনের সম্ভাবনা দেখেছিলেন। তাই স্পষ্টতই বলেছিলেন, "... বিপুল গৌরব চিহ্ন সমাকুল এই স্থানগুলি হইতে প্রসৃত চতুর্দিকে বিস্তৃত জলচ্ছায়া সবন্বিত সুপ্রসস্ত দেশব্যাপী সুদীর্ঘ সরণাবলি— এই দেশের পূর্ব গৌরবের কথা, জ্ঞানের কথা ভাবাইয়া ভগ্নচিহ্নগুলির কর্তা বা প্রতিষ্ঠাতা বা রক্ষিতা মহাপুরুষদের বা মহাপুরুষবংশীয়দের মাহাত্ম্য চিন্তার উদয় করায়; চিন্তা ব্যাকুল অন্তরে তাহাদের ও দেশের বিষয়িনী অনুসন্ধিৎসা জাগাইয়া দেয়। ঐ ভগ্নচিহ্ন রাশির মধ্য হইতে উত্তোলিত প্রস্তর খণ্ড বা ধাতু খণ্ড নিজের দেহস্থিত অঙ্কন বা লিখন দ্বারা কোন মহাপুরুষের স্থিতি বা কীর্তি বহুদিন

পরে মানব সমাজে প্রচার করিয়া কাল প্রভাবে লুপ্তপ্রায় বা বিস্মৃত ঘটনাবলীর কথা বা ইতিহাসের দুই এক অধ্যায় বা দুই এক কণ্ডিকা পুনরায় অনুসন্ধিৎসু পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করে।"

ক্ষত্রিয় জাতির গৌরবের এই ইতিহাস তুলে ধরতে তাঁর প্রচেষ্টায় কোন খামতি ছিল না। তিনি স্পষ্টতই বলেছিলেন, "আমাদের ক্ষত্রিয়গণ দ্বারা অধ্যুষিত এই দেশের নানা স্থানে পূরাকীর্তি চিহ্ন এখনও তৎসম্বধীয় যে সকল বিবরণ এখনো চলিতেছে, তাহা যদি এক এক করিয়া সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তবে সমস্ত মিলাইয়া আমাদের দেশের ধারাবাহিক উজ্জ্বল গৌরবময় ইতিহাসের উদ্ধার হইতে পারে। দেশ যেমন পূরাকীর্তি চিহ্নগুলি অন্তরে বহিয়া আনিয়া দেশবাসী পূর্বপুরুষগণের বিপুল গৌরবের কথা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে, দেশবাসীর মানব সমাজগুলিও সেইরূপ নিজ অন্তরে পরিপোষিত পুরুষ পরম্পরাগত চিন্তা, ভাব, কথা আচার ব্যবহার ও অনুষ্ঠানগুলি আমাদের গোচরে আনিয়া তাহাদের পূর্বপুরুষগণের স্বভাব ও মাহাত্ম্য জনসমাজে সুচাইয়া দিতেছে।" পঞ্চানন বর্মা সমাজ জীবনের বিভিন্ন প্রথা ও চিহ্নগুলির মধ্যে ইতিহাসের নানা অনুষঙ্গ ও অতীতের বহমান ধারার অনুসন্ধান করে দেখাতে চেয়েছেন যে, ক্ষত্রিয় সমাজের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। এমনকি এ-ও বলেছেন, "আমাদের সমাজে ব্যবহৃত 'কুপিস', 'চান্দরী খাওয়া' প্রভৃতি অন্যান্য সমাজে ব্যবহৃত কথাগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যায়, এই সমাজ অতি পূরাকালীয় এবং অতি পূরাকাল হইতে আপনার নিজস্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে।" ক্ষত্রিয় আন্দোলনকে তাত্ত্বিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমাজের অতীত গৌরবের সম্পৃক্তকরণ যে কত জরুরী ছিল তা উপলব্ধি করেন। ইতিহাস লিখনের প্রয়োজনীয়তা জনমনে জাগিয়ে তুলতে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'-র দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত স্বচ্ছ ও ইতিবাচক। তাই বিশেষ করে এই সমিতিটি উত্তরবঙ্গের পূরাকীর্তি সংরক্ষণের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল।

'ক্ষত্রিয় সমিতি'-র প্রতিবেদনে গোসানিমারীর রাজপাটের গৌরবের ইতিহাস তুলে ধরা হয়। তখনও এই স্থানের ইতিহাস মূলত বুকানন সাহেবের বিবরণকেই প্রামাণ্য বলে মনে করা হত। হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর ১৯০৩-এ প্রকাশিত ইতিহাস গ্রন্থেও সেই বিবরণকেই গুরুত্ব দিয়েছেন। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে সমিতির যে 'লক্ষ্য ও পন্থা' পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়েছিল, সেখানেও ইতিহাস চেতনায়

উদ্দীপ্ত করতে বলা হয়— "...আমাদের দেশের পূর্বপুরুষগণের কীর্তি এখনও পড়িয়া আছে। দুই চারিটী যথা— গোসানিমারী-গোসানিমারীর গড় ও রাজপাট, পৃথু রাজার গড়, ময়নামতীর কো্ ধরমপালের গড় ইত্যাদি দেখ ও তাহার কথা ভাব, তোমার অন্তর আশ্চর্যে পূরিয়া উঠিবে।... ঐরূপ যদি কীর্তিগুলি দেখ, ভাব এবং তাহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ কর, তবে বুঝিবে, 'আমরা কি ছিলাম আর এখন কি হইয়াছি'। আর এই চিন্তাটী তোমাকে আবার সেইরূপ হইতে চেতনা বা উদ্দ্যোতনা দিবে; তোমাকে সেই শক্তির ও সেই মহিমার পুনরায় অর্জন জন্য সর্বদা উন্মুখ করিবে।" অর্থাৎ এই প্রাচীন ধ্বংসস্তুপগুলির মধ্যে ইতিহাসের যে বিপুল আকর উপাদান চাপা পড়ে আছে— তা তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তবে কিছুটা আক্ষেপ ও ক্ষোভ ছিল না তা নয়। কারণ পুস্তিকায় আরও বলা হয়েছে, "... ঐ যে মালদহের অন্তর্গত পাড়ুয়ার বা গৌড়ের বিপুল ধ্বংস দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হও, তাহার কথা ভাব, বুঝিবে, গৌড়ের বা পাণ্ডুয়ার গঠন আমাদের কীর্তি নয় বটে, কিন্তু উহার ধ্বংস আমাদের কীর্তি, আমাদের অপমানের প্রতিশোধ।" গোসানিমারীর এই রাজপাটের ধ্বংস হয়ে যাওয়া আজও এতদঞ্চলের ইতিহাস লিখন ও চর্চার অন্তরায় হয়ে আছে। কয়েক বছর পূর্বে পুরাতত্ত্ব বিভাগ রাজপাটের আংশিক উৎখনন করে যে উপাদানগুলি পেয়েছে, তা খেন রাজত্বেরও পুরাতন বলে মনে করা হচ্ছে। এর সম্পূর্ণ উৎখনন হলে আজও নিম্ন আসাম-সহ বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের ইতিহাসে গতিমুখ পাল্টে যেতে পারে।

শত বছর পূর্বে পঞ্চানন বর্মা যে অতীত ইতিহাসের রূপরেখা নির্ণয় করেছিলেন, তা-ই পরবর্তীতে ক্ষত্রিয় জাতির গৌরব মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। ওই পুস্তিকায় স্পষ্টতই বলা হয়— "করতোয়ার পূর্বে প্রাগজ্যোতিষপুর ও পশ্চিমে পৌণ্ড্র দেশ। প্রাগজ্যোতিষপুরে ভগদত্ত ভাস্করবর্মা প্রভৃতি এবং পৌণ্ড্র দেশে পৌণ্ড্রক বাসুদেব প্রভৃতি বীরাগ্রগণ্য ব্যক্তিগণ জন্মিয়া তাহাদের কীর্তি দ্বারা জগৎ আলোকিত অলঙ্কৃত ও প্রাণঝঙ্কারি করিয়া গিয়াছেন। তৎপরবর্তী কালেও ক্ষিপ্রতেজস্বী বীর বকতীয়ার খিলিজী দিল্লী হইতে বাঙ্গালা পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রতাপে আসিয়া তৎপর করতোয়া তীরে ক্ষত্রিয় বীর্য দ্বারা বিদ্ধস্ত হৃততেজ হইয়া আর অধিক দীন জীবন রাখিতে সমর্থ হন নাই।" প্রথম দিকে এতদঞ্চলের স্থানীয় মানুষরাই বহিরাগত অপ্রতিহত শক্তিকে আটকে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অথচ অতীতের এই গৌরবের

আখ্যান বিস্মৃত হয়ে যাওয়ার পেছনে রয়েছে ইতিহাস সচেতনতার অভাব। পঞ্চানন বর্মা ও তাঁর 'ক্ষত্রিয় সমিতি' খেন রাজত্ব ও এর শাসকদের মান্যতা দিয়েছেন এবং পূর্বপুরুষ বলেও চিহ্নিত করেছেন। পুস্তিকায় লেখা হয়েছিল, "আমাদের শেষ রাজা কান্তেশ্বর ৪৫০ বৎসর পূর্বে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমরা আমাদের এদেশের ইতিহাস ও পূর্ব পুরুষগণের কীর্তিকাহিনী জানিতে না পারিয়া তাহাদের তেজঃ, শক্তি ও প্রাণের ঝঙ্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি আত্মগৌরব ও জাতীর প্রাণ চেতিয়া উঠিতেছি না।" এভাবে পঞ্চানন বর্মা ক্ষত্রিয় আন্দোলনের সঙ্গে ইতিহাস চেতনা জাগরণের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। তাই তিনি ইতিহাস রচনার বিষয়টিকে সমিতির গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ বলেই মনে করতেন। তাঁর স্পষ্টতই বক্তব্য ছিল— "আমাদের এদেশের ইতিহাস সংগ্রহ ও সঙ্কলন করিতে হইবে।" কারণ তাঁর বৃহত্তর লক্ষ্য ছিল— "আমরা 'আমরা' হইব। আমাদিগকে 'আমরা' হইতে হইবে। ক্ষত্রিয় সমিতিকে তাহার লক্ষ্যের সাধনা করিতে হইবে।" 'কামতা অনুসন্ধান সমিতি' গঠন সেই দৃষ্টিভঙ্গিরই ফলশ্রুতি।

কথান্ত

পঞ্চানন বর্মা বঙ্গদেশের উত্তরাংশের স্থানীয় মানুষের মধ্যে যেভাবে ইতিহাস সচেতনতায় উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, তা ইতিপূর্বে পরিলক্ষিত হয় নি। সর্বোপরি এই লক্ষ্য পূরণে সামাজিক একটি সংগঠনকেও অনুঘটক রূপে কাজে লাগিয়েছিলেন। তৎকালীন বঙ্গদেশে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'-র মত বৃহত্তর আর কোনও সামাজিক সংগঠন ছিল না এবং তাঁদের মতো ইতিহাস সচেতনতা বৃদ্ধির কাজে আর কেউ এতটা সক্রিয়তা দেখিয়েছে বলে মনে হয় না। অবিভক্ত উত্তরবঙ্গের ইতিহাস অনুসন্ধানে তাই তাঁর অবদান এককথায় অনস্বীকার্য। ইতিহাস লিখন প্রণালীর মধ্যে স্থানীয় স্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম উপাদানগুলি ব্যবহারের গুরুত্ব আরোপ করে পঞ্চানন বর্মা চর্চার পরিসর প্রসারিত ও বৈচিত্রপূর্ণ করে তোলেন।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১. উপেন্দ্রনাথ বর্মণ, 'উত্তর-বাংলার সেকাল ও জীবন স্মৃতি', জলপাইগুড়ি, ১৩৯২ বঙ্গাব্দ

২. আনন্দগোপাল ঘোষ, গিরীন্দ্রনাথ বর্মণ, নীলাংশুশেখর দাস, নির্মলচন্দ্র রায় (সম্পা.), 'বৃত্ত বিবরণী (ক্ষত্রিয় সমিতির অধিবেশন-বিবরণ) ১৯১০-১৯৩৫', মাথাভাঙ্গা, ২০১৯

৩. ক্ষিতীশচন্দ্র বর্মণ, (সম্পা.), 'ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক', কলকাতা, ২০01

৪. গিরিন্দ্রনাথ বর্মণ, (সম্পা.), 'পঞ্চানন চরিত মানস ও উত্তরকাল', মাথাভাঙ্গা

৫. দীপক কুমার রায়, (সম্পা.), 'রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'

৬. আনন্দগোপাল ঘোষ, 'মনীষী পঞ্চানন বর্মা ও তাঁর আন্দোলনের উত্তরাধিকার', মালদা, ২০15

৭. অনিন্দ্য ভট্টাচার্য, রাজর্ষি বিশ্বাস, (সম্পা.), 'মানসাই, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জনজীবন- কোচবিহার রাজ আমল থেকে বর্তমান মাথাভাঙ্গা মহকুমা, সারস্বত উৎসব, মাথাভাঙ্গা, ২০০৮

৮. 'পশ্চিমবঙ্গ, বিশেষ সংখ্যা-রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা', পঃবঃ সরকার, ২০০5

স্বাধীনোত্তর কুচবিহারের আর্থ-সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক অন্বেষণ

*রতন বর্মন
সহকারী অধ্যাপক, রাজনগর মহাবিদ্যালয়, রাজনগর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ
*ড. মাধবচন্দ্র অধিকারী,
অধ্যাপক, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ

সংক্ষিপ্তসার

১৯৪৭ এ ভারতের স্বাধীনতা এবং যুগপৎ দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বহু উদ্বাস্তু অভিবাসীর কুচবিহারে আগমন ঘটে। ১৭৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের স্বাধীনসত্তা ছিল। ১৭৭৩ সাল থেকে রাজ্যটি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির 'করদ মিত্র' রাজ্যে পরিণত হয়। ১৯৪৯ সালের ২৮ আগস্ট এই দেশীয় রাজ্য কুচবিহার ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলায় পরিণত হয়। কুচবিহারের এই সংযুক্তিকরণ উত্তর-পর্বে দেশভাগ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই জেলায় বহু উদ্বাস্তুর আগমন ঘটে। ফলে কুচবিহারে আর্থ-সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের পালা শুরু হয়েছিলো। আমি এই প্রবন্ধে ঐতিহাসিক গবেষণার বিভিন্ন পদ্ধতি (সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহ) অনুসরণ করে এ বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করেছি। এর ফলে আশাকরি স্বাধীনোত্তর কুচবিহারের সমাজ, কৃষি-অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিভিন্ন বিষয়ে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারব।

সূচক শব্দ : উদ্বাস্তু, রাজবংশী, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, বিবর্তন, সংশ্লেষণ।

বিশ্লেষণ-অন্বেষণ

১৯৪৭ সাল কুচবিহার তথা আপামর ভারতবাসীর কাছে একদিকে চরম উৎসাহ-উদ্দীপনা, সুখ-শান্তি ও আনন্দের চরম প্রাপ্তি, অন্যদিকে এক চরম বিষাদময় ও অভিশপ্ত বছর। ঐ বছর 'ভারতীয় স্বাধীনতা আইন' পাশ হয়। ঐ আইন বলে

১৯৪৭-এর ১৪ আগাস্ট অখন্ড ভারত ভেঙে পাকিস্তান এবং ১৫ই আগস্ট স্বাধীন ভারতের জন্ম হয়। ভারতবাসীর স্বাধীনতার স্বপ্ন প্রথমেই কলঙ্কিত হল দেশ-দশকে বিভাজনের মধ্য দিয়ে। দ্বিখন্ডিত হল বাংলা ও পাঞ্জাবও। অপরদিকে ধর্মের ভিত্তিতে দেশ-ভিটে-মাটি বিনিময়ের সূত্রে আগমন ও বহির্গমনের ফলে অগণিত মানুষ দেশ-ভিটে-মাটি হারায়— যারা 'উদ্বাস্তু' নামে পরিচিত। স্বাধীনোত্তর ভারতে এই দেশ-ভিটে-মাটি হারানো উদ্বাস্তু মানুষদের নিদারুন কাহিনীর কথা শুনলে হৃদয় শিহরিত হয়ে ওঠে।

১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারির আগে পর্যন্ত কুচবিহার ছিল ঐতিহ্যসম্পন্ন দেশীয় রাজ্য। কুচবিহার ছিল প্রাচীন কামরূপ সাম্রাজ্যের অংশ। প্রাচীন কামরূপের চারটি অংশ পূর্ব থেকে সৌমারপীঠ, কামপীঠ, রত্নপীঠ ও স্বর্ণপীঠ। দেশীয় রাজ্য কুচবিহার (বর্তমানে জেলা কুচবিহার) ছিলেন সে-সময়ের রত্নপীঠের অন্তর্গত।[1] ১৫১০ সালে কুচবিহারে কোচ রাজবংশের শাসনের শুভ সূচনা ঘটে। ১৭৭৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত এই দেশীয় রাজ্যের স্বাধীনসত্ত্বা ছিল। ১৭৭৩ সাল থেকে ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যটি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির 'করদমিত্র' রাজ্য হিসেবে শাসিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারী পর্যন্ত কুচবিহার ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং ১৯৫০ সালের ১লা জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশ ঘটে। কুচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের জনগোষ্ঠির একটি বৃহৎ অংশ ছিল রাজবংশী সম্প্রদায়ের যা বিভিন্ন আদমশুমারি ও জাতিগত সংখ্যার বিচারে জানা যায়। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে সর্বাধিকা রাজবংশী জনজাতির বাস কুচবিহার জেলায় দেখা যায় । এরপর জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলায়ও এই জনজাতির বাস চোখে পরার মতো লক্ষ্য করা যায়। কোচ ও রাজবংশী সমাজকে কেন্দ্র ও ভিত্তি করে কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলায় একটি বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে উঠেছিল। যদিও রাজবংশিদের প্রাচীন বসতি ছিল তিব্বত ও ব্রহ্মদেশের পাহাড়ি ও মালভূমি এলাকা। পরে এরা কুচবিহারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ, বিহার, মুর্শিদাবাদ, রংপুর (বাংলাদেশের কিয়দংশ) দিনাজপুর ও অসমের বিভন্ন অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এ বিষয়ে E. A. Gait বলেছেন— 'In Jalpaiguri, Cooch Behar and Goal Para, the persons now known as Rajbangsi are either pure Koches who, though dark have

distinctly Mongoloid physiogimony, or else a mixed breed in which the Mongoloid element usually preponderates.'[2] তাই প্রকৃতির নিয়মেই এখানে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রাধান্য লাভ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা ও যুগপৎ দেশভাগ এবং পরবর্তীতে দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের ভারতভুক্তি এবং পশ্চিমবঙ্গের জেলা হিসেবে গৃহীত হওয়ার পর কুচবিহারের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন তথা বিবর্তন-এর সূচনা ঘটে; যার মূলে উদ্বাস্তু প্রবাহকে দায়ী করা যায়। বিশেষ করে রাজবংশী সম্প্রদায়ের সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। সমাজ, ধর্ম, কৃষি-অর্থনীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সংগীতকলা– সব ক্ষেত্রেই অভিবাসীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। আবার অভিবাসীরাও দেশীয় রাজবংশিদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি গ্রহণ করতে থাকেন। এককথায় স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে রাজবংশী, অরাজবংশী এবং অভিবাসীরা পাশাপাশি সহাবসথানের ফলে সামাজ, অর্থনীতি এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রীতি-নীতি ও কৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে গ্রহণ ও সমন্বয়ের ফলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বের সূচনা ঘটে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে

প্রথমে কুচবিহারের অর্থনৈতিক অবস্থার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করা যাক। দেশভাগের ফলে কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে কুচবিহারে আমূল পরিবর্তন দেখা যায়। বহুমূল্যবান উপাদান সমৃদ্ধ এবং সংস্কৃতি-সম্পন্ন জনগোষ্ঠীর সমাহার সমৃদ্ধ কুচবিহার জেলা মূলতঃ বহু জঙ্গলময়, গাছ-গাছড়া ও নদ-নদী-বেষ্ঠিত এক সবুজ গ্রামাঞ্চল। রাজ আমল থেকেই কুচবিহারের অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। এই কৃষির উপর ভিত্তি করেই এই জেলা সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে। তবে রাজ আমলে কুচবিহারে কৃষি ক্ষেত্রে তেমন প্রসার ও অগ্রগতি তেমন ঘটে নি। কৃষি বলতে সামগ্রিকভাবে শুধু ফসল উৎপাদনকেই বোঝায় না, এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে কৃষিজীবী মানুষের জীবন-জীবিকা নির্বাহের বিভিন্ন পেশা-বৃত্তিকেও বোঝায়। কুচবিহারের কৃষির অনুকূল ও উপযোগী আবহাওয়া ও জলবায়ু, মাটির গ্রথন হাল্কা, বেলে-দোঁয়াশ প্রকৃতির, পর্যাপ্ত ও উপযোগী বৃষ্টিপাত, হিমালয়ের পাদদেশের সমতল অংশে অবস্থান, বিভিন্ন নদনদীর অবস্থান, উপযোগী

তাপমাত্রা, এখানকার মানুষদের কৃষিকাজের প্রতি আগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে কুচবিহারের কৃষিকাজ এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।

কুচবিহারে রাজবংশীদের অধিকাংশই ছিলেন কৃষিজীবী। কুচবিহারের প্রধান ফসল হল ধান। এই ধানই এখানকার রাজবংশীদের প্রধান ফসল, অর্থ এবং খাদ্য। সাধারণত কুচবিহারে আউশ, আমন ও বোরো এই তিন ধরনের ধান উৎপাদিত হয়। এই ধান থেকে প্রাপ্ত চাল ও তা থেকে তৈরি বিভিন্ন প্রকার উপাদান সামগ্রী কুচবিহারবাসীরা সারা বছর ধরে তাদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবাদিতে ব্যবহার করে থাকেন। রাজবংশীদের প্রধান খাদ্য দানাশস্য চাল। এই চাল কয়েক রকমভাবে তৈরী করা হয়। যেমন— আলোয়া চাল(ধান সেদ্ধ না করে রোদে শুকিয়ে তৈরী) বা আতব চাল, ঊষা চাল (ধান সেদ্ধ করে তৈরী), ভাদোই চাল (শীতের ধান থেকে প্রস্তত), হেইতি চাল (বর্ষার ধান থেকে তৈরী)।[3] এইসব চাল থেকে ভাত ছাড়াও চিড়ে, মুড়ি, খই, পিঠে, পায়েস খুব পছন্দের খাবার। ধান ছাড়াও কুচবিহারের প্রধান ফসলগুলি হল— তামাক, পাট, পান, সুপারি, ভুট্টা, তৈলবীজ, ডালশস্য, আলু, বিভিন্ন ধরনের ফল, ফুল ও সবজি ইত্যাদি। তবে সাম্প্রতিক কুচবিহারে ভুট্টা ও আলু চাষ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে একথা স্বীকার করতেই হয় যে, কুচবিহারে কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন— লাঙল(জমি চাষ করার যন্ত্র যা কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরী হয়), মই(বাঁশ, কাঠ ও লোহা দিয়ে তৈরী), জোয়াল, ধান ব্যাদা(বলদ দিয়ে বিদে দেওয়া), হাত ব্যাদা(হাত দিয়ে মাটি সমান করা), ফাউড়ি(ধান জড়ো করার যন্ত্র), কুরসি(মাটির ডলা ভাঙার যন্ত্র), বিভিন্ন ধরনের দাও, কুড়াল প্রভৃতি যন্ত্রগুলি এখন কৃষিকাজে তেমন প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ হল আধুনিক উন্নতমানের প্রযুক্তি বিদ্যা কৃষিক্ষেত্রে বিপ্লব নিয়ে এসেছে। সেইসঙ্গে দেশভাগের পর এই জেলায় আগত অভিবাসীরাও কৃষিকাজে যোগ দেন এবং নতুন নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তদের অধিকাংশই ছিল কৃষক, কৃষি পরিবারের সদস্য ও কৃষি শ্রমিক। জমির ক্ষুধা ছিল তাদের মধ্যে সর্বগ্রাসী। ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চলের খাসজমি, নদীচরের কৃষিজমি ও খাস জমিতে দরিদ্র উদ্বাস্তদের একাংশ বস্তি স্থাপন করেন; অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন উদ্বাস্ত কৃষকরা গ্রামের জোতদারদের কাছ থেকে সস্তায় কৃষিজমি ও বাড়ি কিনে নিয়ে বসতি গড়ে তোলে চাষবাসের কাজে মন

দিয়েছিলেন। ফলে কৃষি ফসল উৎপাদনে অভিবাসীরা স্থানীয়দের তুলনায় এগিয়ে ছিলেন।

কৃষকদের পাশাপাশি উদ্বাস্তদের একাংশ ছিলেন নানা কারিগরি বিদ্যা ও পেশায় দক্ষ। কামার, স্বর্ণকার, কুমোর, নাপিত, কাঠমিস্ত্রি, ধোপা, তাঁতি, বিড়ি শ্রমিক প্রমুখদের সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরাও উদ্বাস্ত স্রোতের সঙ্গে কোচবিহারে চলে আসেন। বয়ন শিল্পীরা নিজেদের পরিবার ও পরিজন নিয়ে নিজস্ব উদ্যোগেই হাতে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন শুরু করেছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানের উদ্বাস্ত তাঁতিরা কুচবিহার শহরের পাশদিয়ে প্রবাহিত বুড়ি তোর্ষার পাড়সহ চকচকা অঞ্চলে তাঁত বস্ত্র উৎপাদন শুরু করেন এবং এই অঞ্চল সরকারের উদ্যোগে ‘তাঁতি কলোনি’ হিসেবে স্থান পেয়েছে।[4] বর্তমানে এটি তাঁত বস্ত্র বিপণন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। সেই সঙ্গে কুচবিহারের রেশম শিল্প, মুগা শিল্প, শীতলপাটি শিল্প, পাটশিল্প, শোলা শিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ শিল্প প্রভৃতিতে ব্যাপক সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।[5] এর প্রধান কারণ হল স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে বিপুল পরিমাণে আগত উদ্বাস্ত ও দেশীয়দের আগ্রহ এবং বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ। এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে ১৯৫৩ এর জমিদারি বিলোপ আইন এবং ১৯৭৭ সালের ‘অপারেশন বর্গা আইন’ -এর ফলে এই অঞ্চলে রাজবংশী জোতদার এবং বড় কৃষকদের একাংশ জোতজমি হারিয়ে ফেলে। ফলে সাধারণ মানুষ ও পূর্ববঙ্গীয়রা কৃষিকাজে মনোনিবেশ করেন। একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়, ১৯৪৬ থেকে ১৯৫১ খ্রিষ্টাব্দে মধ্যে কুচবিহারে মোট ৯৭৭২৩ জন উদ্বাস্ত স্থায়ীভাবে চলে আসে।[6] উচ্চবর্গীয়, নিম্নবর্গীয়, ধনী-নির্ধন, কৃষিজীবী, খেটে খাওয়া সাধারণ মানুষ সকলেই কুচবিহারে এসে ভীড় জমাতে থাকে, যা জনজীবনে ব্যাপক আলোড়ন ফেলে। অর্থবান শিক্ষিত ও ব্যবসায়ীরা কুচবিহার শহরসহ মহকুমার শহর ও বন্দরগুলিতে দ্রুত জমি ক্রয় করে বসতি গড়ে তোলে। এমন কি উপজাতিরাও উদ্বাসিত হয়ে আসেন কুচবিহারে। ড. দুর্গাদাস মজুমদার এবিষয়ে ‘West Bengal District Gazetteers: Koch Behar’-এ বলেছেন— ‘These came mostly from the adjacent districts of Rangpur and that portion of Jalpaiguri district which was partitioned off from India by the Radcliff Award.’[7] ড. মজুমদার ‘West Bengal District Gazetteers: Koch Behar’-এ আরও লিখেছেন— ‘After 1951 there was a migration of

some tribal people from Mymensingh District."[8] তাই বলা যায়, ১৯৫০-৫১ সালের পর এই উদ্বাস্তু স্রোত ব্যাপকভাবে চলতে থাকে। এই ধারা ১৯৭১ সাল ও তারও পরবর্তী সময় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ফলে রাজবংশী অধ্যুষিত কুচবিহারে শুধু জনসংখ্যাই বৃদ্ধি হয়নি, সেই সঙ্গে জন-বৈচিত্র্যময় পরিবেশ গড়ে ওঠে। এই ছিন্নমূল মানুষেরা কুচবিহারের পথে-ঘাটে, পরিত্যক্ত এলাকায়, খোলা আকাশের নীচে, নদীর চরে, উঁচু বা ডাঙা এলাকায় আশ্রয় নেয়ে। এইসব নিরুপায় অসহায়, সহায়-সম্বলহীন উদ্বাস্তু মানুষেরা কুচিহারের অনাবাদী, জঙ্গলাকীর্ণ, নদী চর ও পরিত্যক্ত অঞ্চলগুলোকে তারা তাদের বাসস্থান হিসেব বেছে নেন। এই অনাবাদী ও অনুর্বর জমিগুলোকে এরা আবাদি ও চাষযোগ্য করে তোলেন। ফলে কুচবিহারের কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে এক ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন ক্ষেত্রে রাজ আমলের চেয়ে জেলা কুচবিহারের উৎপাদন বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে এই পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের অবদানকে অস্বীকার করা যায় না। অর্থবান ব্যবসায়ী ও শিক্ষিতরা শহর ও বন্দরগুলোতে এসে দ্রত জমি ক্রয় করে বসতি গড়ে তোলে। অন্যদিকে গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র কৃষিজীবীরা বসবাস শুরু করে। বর্ণহিন্দু ছাড়াও বিপুল সংখ্যায় রাজবংশী ও নমশূদ্র সম্প্রদায় মানুষ এই জেলায় আসেন এবং ক্রমে কৃষিকাজ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন।[9] ফলে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে একটি ব্যাপক ও অভূতপূর্ব বিবর্তন ঘটেছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিক্ষা ক্ষেত্রে

পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের অভিবাসনের ফলে কুচবিহার জেলার জন-বিন্যাসের যেমন ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে, তেমনি তাদের বয়ে আনা ওপার বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিক কাঠামো ও ঐতিহ্য এই অঞ্চলের সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিসরকে প্রভাবিত করেছে। ফলে গড়ে উঠেছে এক নতুন আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল। স্বাধীনতার পর ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে এমনকি তারও পরে, কুচবিহার জেলায় গড়ে ওঠা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, সামাজিক সংস্থা, গ্রন্থাগার, মন্দির, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ইত্যাদির প্রতিষ্ঠা সেই ঈঙ্গিত বহন করে। স্বাধীনতার পূর্বে কুচবিহারে শিক্ষার ক্ষেত্রে হাই স্কুল ও মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল খুবই নগণ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পরে এই অঞ্চলে গড়ে ওঠেছে অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।[10] এই

বিপুল পরিমাণ শিক্ষা প্রতিষ্টান স্থাপন জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রতিই ইঙ্গিত বহন করে। এটা ঠিক যে, এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা ছিল। এজন্য উদ্বাস্তুরা প্রাথমিকপর্বে নিজেরা অর্থ সংগ্রহ করে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে এবং নিজেদের মধ্যে থেকে দক্ষ লোকদেরকে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এরপর এরা সরকারি অনুমোদন লাভের জন্য সচেষ্ট হন। কারণ, সে সময় গোটা কুচবিহারে সরকারি অনুমোদিত স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। এভাবে উদ্বাস্তুরা তাদের পরিবারের সন্তানদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী হন। তাছাড়াও এই সময়কালে কুচবিহারে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যালয় প্রতিষ্টিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার এই স্কুলগুলোকে অনুমোদন দেয়। এই স্কুলগুলোতে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী হিসেবে পূর্ববঙ্গেরর উদ্বাস্তু শিক্ষিত লোকেরাই নিযুক্ত হয়েছিলেন এবং এরা এই কাজকে আগ্রহের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যান। এককথায় এরফলে কুচবিহারে শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রসার ঘটে এবং দেশীয় ও পূর্ববঙ্গীয় রীতিনীতির সমন্বয় সাধিত হয়।

ধর্ম ও বিভিন্ন ধর্মীয় লোকাচারের ক্ষেত্রে

ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুচবিহারে রাজবংশিদের পূজা-পার্বণ বিষয়টি একটি বহু আলোচিত বিষয়। রাজবংশীরা প্রকৃতির দেব ও দেবীকে পূজা করেন। সেইসঙ্গে তাঁরা ভূত, পেতনির পূজাও করেন এবং তাদের তুষ্টির জন্য বলিও দেন। তবে রাজবংশীরা মূলতঃ শৈব। তাঁদের উপাস্য দেবতা হলেন ভগোবান শিব। কিন্তু তাঁদের ধর্মীয় আচরণে শাক্ত, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও তন্ত্রশাস্ত্র সকলের একটা অদ্ভুত মিশ্রণ ঘটিয়েছে।[11] তাঁরা ডাকনীতন্ত্রে বিশ্বাস করেন, শিব (মহাকাল), বিষহরী (মনসা), দূর্গা, কালী, লক্ষ্মী পূজা করেন। আবার বিষ্ণু, নারায়ণ আর পবিত্র তুলসী গাছেরও পূজা করেন। তাঁরা ভগবানের নাম-সংকীর্তন করেন, চন্ডীপূজা করেন, ধর্মঠাকুরের পূজা দেন, গোরখনাথের গান করেন এমনকি পূর্বপুরুষকেও পূজা দেন, যা 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান' নামে পরিচিত। কুচবিহারের রাজবংশিরা যুগ যুগ ধরে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের লৌকিক দেব-দেবি যেমন- মদনকাম, হুদুমদেও সুবচনী ঠাকুর, ধর্মঠাকুর, বুড়াবুড়ি ঠাকুর, যকাযকি, মাসান ঠাকুর, ভান্ডানীপূজা, বিষহরীপূজা, ডাংধরা দেব, বুড়ীমা, কুমির দেব, ঢেল দেব, বাবা ঠাকুর, সন্ন্যাসী ঠাকুর, গোরক্ষনাথ ঠাকুর, হাতী

পোষা ঠাকুর, কোড়াকুড়ি, শীতলা, মনসা দেবী, শ্মশানকালী, সত্যনারায়ণ, ব্যাঘ্র দেবতা, সোনারায় ইত্যাদির পূজো করে আসছেন।[12] এইসব পূজা কুচবিহারের রাজবংশীসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এইসব দেবদেবীর ক্ষেত্রে তাঁদের নির্দিষ্ট কোন স্থান বা মন্দির দেখা যায় না। সাধারণত গ্রাম ও শহরের কোন রাস্তার পাশে, নদী তীরে, ব্রিজ (স্থানীয় ভাষায়- পুল), গাছের নীচে, কোন জলাশয়ের ধারে, বনজঙ্গলে, শ্মশান ইত্যাদি বিভিন্ন স্থানে এইসব দেব দেবীদের পূজা-পার্বণ পালন করা হয়ে থাকে। অনেক সময় গ্রামের দিকে খড়ের ছন বা টিনের এক চালা বা কখনও দো-চালা মণ্ডপজাতীয় মন্দিরেও এঁদের পূজা করা হয়ে থাকে। অনেক পূজা-পার্বণের ক্ষেত্রে দেবদেবীর কোন বিগ্রহ বা মূর্তি থাকে না; তখন সেক্ষেত্রে কোন পাথর বা শিলা, কোন প্রাচীন গাছ বা ত্রিশূল ইত্যাদিকে দেব-দেবী জ্ঞানে পূজা বা উপাসনা করা হয়। কুচবিহারের গ্রামবাসীরা এইসব লৌকিক দেবদেবীর মন্দিরকে অনেক সময় মন্দির না বলে 'থান' বা 'পাট' বলে থাকেন। অনেক ক্ষেত্রে এইসব থান বা পাঠের পূজার্চনার জন্য পুরোহিত ছাড়াই করা হয়ে থাকে। কিন্তু দেশভাগের পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে এই ধরনের পূজার প্রচলন কমে যায়। এর পিছনে অনেক কারণ থাকলেও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিবাসীদের আগমনের ফলে এই পরিবর্তন বলে অনেকে মনে করেন।

ভারতের স্বাধীনতার পর এবং আজ থেকে কয়েক দশক আগেও কুচবিহারে দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, গণেশ পূজা তেমন হত না। তবে 'বড়দেবী পূজা' কুচবিহারের মহারাজাদের উদ্যোগে অনেক আগে থেকেই মহাসমারোহে কুচবিহারে অনুষ্ঠিত হত। দুই দশক ধরে অভিবাসী পূর্ববঙ্গীয়দের সঙ্গে ওঠাবসা করার ফলে এতদঞ্চলে গ্রাম ও শহর মিলে এইসব পূজার সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে গেছে। বিশেষ করে দুর্গাপূজা ও কালীপূজার সংখ্যা তো বহুগুণ বেড়েছে। স্থানীয় অধিবাসীদের একটা বড় অংশ ক্লাব ও পূজা সংস্কৃতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও লক্ষ্য করা যায় কোন কোন পূজামণ্ডপে। সাম্প্রতিককালে সার্বজনীন দূগাপূজা কমিটিগুলোতে অভিবাসীদের সঙ্গে দেশীয় কুচবিহারবাসীদেরও উদ্যোক্তা হিসেবে দেখা যাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে উভয়ের মধ্যে এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনের পরিবেশ গড়ে উঠেছে।[13] এ বিষয়ে ড. আনন্দগোপাল ঘোষ বলেছেনঃ " দেশবিভাগ যে জাতপাতের বেড়াজাল খানিকটা ভেঙ্গে দিয়েছে,

সেটি মানতেই হবে। আবার পূর্ববঙ্গের যে অবর্ণ-হিন্দুরা দূর্গাপূজা, কালীপূজার আয়োজন করতে পারেননি, কুচবিহার ও তদসংলগ্ন অঞ্চলে আসার পরে তাঁরাও তা নির্বিঘ্নে করতে পারছেন"[14]। এককথায়, বর্তমানে দূর্গাপূজা, কালীপূজা কুচবিহার তথা পশ্চিমবঙ্গে সার্বজনীন পূজায় পরিণত হয়েছে। কুচবিহারের রাজ আমলের পূজা 'বড়দেবী পূজা' এখন রাজবংশী, অ-রাজবংশী সকলেই পূজো করে থাকেন। এখন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় স্তরে সরস্বতী পূজা, বিশ্ব কর্মা পূজা, রাখীবন্ধন ও হোলী উৎসবে স্থানীয় হিন্দু-মুসলমান- জৈন- বৌদ্ধ-উদ্বাস্তু নৃগোষ্ঠীর মানুষজন অংশগ্রহণ করছে যা সমাজ-সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকচিহ্ন হিসেবে কাজ করছে।

শুধু তাই নয়, সাম্প্রতিককালে আধুনিক বিভিন্ন ধর্মগুরু যেমন- ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র, বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী, স্বামী প্রণবানন্দ প্রমুখ ধর্মগুরু কুচবিহারে ধর্মীয় ক্ষেত্রে কুচবিহারবাসীদের বিশেষতঃ রাজবংশী, নমশূদ্র, রাভা প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছেন। এই ধর্মগুরুদের অধিকাংশই ছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র ছিলেন পাবনার নিবাসী। ভারত সেবাশ্রম সংঘের আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের প্রধান কার্যালয় ছিল অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে। স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে দেশভাগের ফলে ব্যাপকহারে উদ্বাস্তু মানুষজনের আগমন ঘটে। এই অভিবাসীরা অনেকেই ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। তাদের উৎসাহ ও আগ্রহের ফলে দেশীয় কুচবিহারবাসীরা ঠাকুর অনুকূলচন্দের সৎসঙ্গের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন এবং অনেকেই দীক্ষা গ্রহণ করেন। সাম্প্রতিক বিগত দুই দশক ধরে ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য ও অনুগামীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে। তাঁর সহজ-সরল নীতি- আদর্শ ও বিভিন্ন বাণী কুচবিহারবাসীদের আকৃষ্ট করে।[15] একাজে দেশীয় ও ভাটিয়া (পূর্ববঙ্গ থেকে আগতদের) উভয়েরই অবদান অনস্বীকার্য। কুচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বহু মন্দির গড়ে ওঠে। জামালদহের সৎসঙ্গের মন্দির হল কুচবিহার জেলার সবথেকে বড় মন্দির। তাছাড়া, মাথাভাঙ্গার সৎসঙ্গের মন্দির, গোসাইরহাট মন্দির, দিনহাটা , হলদিবাড়ি, মেখলিগঞ্জ, কুচবিহার সদরসহ জেলার সর্বত্র ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের মন্দির গড়ে উঠেছে। গোসাইরহাট সৎসঙ্গ কেন্দ্রের ঋত্বিক শ্রীসুনীলচন্দ্র প্রামাণিক মহাশয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে উঁনি বলেছেনঃ "স্বাধীনতা এবং এর ঠিক পরে এ এলাকায় ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের ধর্মের প্রভাব থাকলেও জনগনের মধ্যে তেমন আগ্রহ ছিল না; কিন্তু

বর্তমানে এর প্রভাব বহুগুণ বেড়েছে। ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের সৎসঙ্গের প্রভাবে সমাজে অনেক অসামাজিক খারাপকাজ ও হিংসা অনেকটা কমে গেছে এবং সেইসঙ্গে দেশী-ভাটিয়া বিরোধও কিছুটা প্রশমিত হয়েছে”।[16] আচার্য স্বামী প্রণবানন্দের ভারত সেবাশ্রম সংঘের মতাদর্শ গোটা কোচবিহারজুড়ে কুচবিহারবাসীদের অন্তরে ছোঁয়া পড়েছে। শুধু কুচবিহার নয়, সমগ্র ভারতব্যাপী এই সংঘের মতাদর্শ ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। কুচবিহারে স্থানীয় রাজবংশি ও অ-রাজবংশি এবং পূর্ববঙ্গ থেকে আগত আভিবাসীদের অনেকেই আজ এই ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মতাদর্শ মেনে নিয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছেন। শ্রী শ্রী বাবা লোকনাথ ঠাকুরের আদর্শ ও মতাদর্শ অনেকে গ্রহণ করেছেন। তবে, বর্তমানে শ্রী চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মের মহামন্ত্র ‘নাম-সংকীর্ত্তন’ কুচবিহারবাসীরা সাদরে গ্রহণ করেছেন এবং কুচবিহারের গ্রাম থেকে শহর সবত্র এই নাম-সংকীর্ত্তন এর প্রভাব ও জনপ্রিয়তা বহুগুণ বেড়ে গেছে। এখন প্রায় প্রতিটি হাট-বাজারে, গ্রামে-গঞ্জে, পাড়ায়, বিভিন্ন মন্দিরে এই নাম-সংকীর্ত্তন অষ্টপ্রহর, ষোল প্রহর, বত্রিশ প্রহর, আটচল্লিশ প্রহর চৌষট্টি প্রহর ধরে অনুষ্ঠিত হয়। দেশীয় রাজবংশি, নমোশূদ্র, বোরো, উদ্বাস্তু, ভাটিয়া সকলেই এই অনুষ্ঠানগুলির আয়োজক হিসেবে কাজ করেন। এক্ষেত্রে সংস্কৃতির সংশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে আগত অভিবাসীরাও এদেশীয় লোকাচার ও লোকশিল্প ইত্যাদির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায়- ভারতের স্বাধীনতার পূর্বে কুচবিহারে স্থানীয় লোকাচার ও কৃষ্টি যেমন- মাসান পূজা, মেচিনীপূজা, নবান্ন উৎসব, ভাদ্র মাসে মামী হাতে ভাত খাওয়া, ভাওয়াইয়া সংগীত ও নৃত্যকলা প্রভৃতি সম্পূর্ণভাবে ছিল রাজবংশীদের অনুষ্ঠান। দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে ভাটিয়ারাও(পূর্ববঙ্গীয়দের স্থানীয়রা ‘ভাটিয়া’ বলে ডাকত) সমানভাবে এসব লোকাচার ও উৎসব পালন করে চলেছেন। ‘মাড়াই পূজা’(মনসা পূজারই একটি রূপ) কুচবিহারের রাজবংশীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ পূজা যা, সাত দিন বা পাঁচদিন বা তিনদিন ধরে পূজিত হয়। সাধারণত বিবাহ, অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠানের আগে এই পূজা করা হয়ে থাকে। পূর্ববঙ্গীয় অভিবাসীরাও এখন এই পূজা পালন করে থাকেন। অন্যদিকে ভাদ্র মাসের সংক্রান্তিতে ‘মনসা পূজা’ দেশি-ভাটিয়া উভয়ই সমানভাবে পালন করে থাকেন। অর্থাৎ রাজবংশী সমাজের আরাধ্য

দেবতাদের পূজা এখন অ-রাজবংশী ও উদ্বাস্তুরাও পালন করছে, যা সামাজিক সংশ্লেষণের একটি বড় উদাহরণ। স্বাধীনোত্তর কুচবিহারে প্রথম দিকে এই চিত্র ছিল না। বর্তমানে কুচবিহারে ওপারের (পূর্ববঙ্গীয়) মানুষেরা দেশীয়দের সংস্পর্শে থাকার ফলে তারা অনেক ক্ষেত্রেই এপারের ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখছে। কুচবিহার জেলার শীতলকুচি ব্লকের ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভোগডাবরি গ্রামের জনৈক ফণীভূষণ বর্মন (বয়স ৭৪ বছর) এর কাছে সাক্ষাৎকার নিতে গিয়ে এবিষয়ে তিনি বলেছেনঃ “ আগোত ভাটিয়ালা পূজে নাই, এলা পূজে। উমরা(ভাটিয়ালা) হামার সাথত বসবাস করার ফলে হামার (দেশীয়রা) নিয়ম-নীতিগুলা এলা মেনে চলছে। এলা ভাটিয়ালাতো মাসানও পূজে।”[17] উনি এর দ্বারা এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, কুচবিহারে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুরা দেশীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে এদেশীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। তাই তিনি উদাহরণ হিসেবে রাজবংশীদের উপাস্য দেব মাশান ঠাকুরের পূজার কথা বলেছেন। শুধু মাসান ঠাকুরের পূজা নয়, ওনার কাছ থেকে কুচবিহারের অন্যান্য দেব-দেবীর পূজার বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি আরও বলেনঃ “ এলা আর বাদ নাই সগায় সঔক ঠাকুর পূজে। উমরা যেমন মাসান, মদনকাম, জকা-জকনি, হুদুম দ্যাও, মাড়াই, সুবচনী, ভান্ডানী পূজে, হামরাও (দেশীয়রা) মানষিলা এলা রামনবমী, গণেশ পূজা, শনি, শীতলা, মনসা, কালী, সন্তোষী এইল্যা ঠাকুর পূজছি”[18]। অর্থাৎ এর দ্বারা তিনি একটি সংকৃতির মেলবন্ধনের কথা বলেছেন যা গ্রহণ ও আত্তীকরণের দ্বারাই সম্ভব।

অন্যদিকে, রাজর্ষি বিশ্বাস সম্পাদিত ‘দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল’ নামক বই এ ফনীন্দ্রনাথ রায় তাঁর এক প্রবন্ধে লিখেছেনঃ “ রাজবংশিদের বহু পূজো-পার্বণ ক্রমশ বিলীন হচ্ছে। চণ্ডীনাচ, কামদেব, হুদুমদ্যাও পূজা প্রায় উঠে গেছে। কিন্তু পূর্বঙ্গীয়দের শীতলাপূজা-কীর্ত্তন-অষ্টপ্রহর রাজবংশিরা আয়ত্ত করছে। বানেশ্বরের শিব ও জল্পেশ্বরের শিব মেলা অভিবাসীরাও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংশ্লেষণ করছে। মহাকাল পাহাড়ে ভুটিয়া, রাজবংশী, বর্ণহিন্দু, পূর্ববঙ্গীয় নমশূদ্র, প্রত্যেক নৃগোষ্ঠী মানত করে। রথযাত্রায় অভিবাসী বনাম কোচ রাজবংশী, অবাঙালি প্রশাসকগণও রথের রশিতে টান দেন”।[19] দীর্ঘদিন পারস্পরিক সহাবস্থান এবং বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্তরে পারস্পরিক মিলনেরই ফলশ্রুতি এইসব খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি, প্রেক্ষিত যাই হোক না কেন। মূল কথা হল

পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তুদের আগমনের পর পাশাপাশি সহাবস্থান এবং পারস্পরিক সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ফলে একটি সাংস্কৃতিক ঐক্য প্রতিষ্টা পেয়েছে। তাই হোলী এখন দেশীয় ও অভিবাসীদের কাছে রং- আবিরের মিলন উৎসব। তবে একথা সত্যিই স্বীকার করতেই হয় যে, কুচবিহারে আজ হুদুম দ্যাও পূজা, মদনকাম পূজা, ব্যাঙের বিয়াও, ভান্ডানী পূজা, সোনার গাওয়া, পালবাশ খেলা, হাঁচাও গাওয়া ইত্যাদি প্রচলিত সামাজিক কৃষ্টি এখন প্রায় নেই বললেই চলে। এ বিষয়ে আমার মনে হয়, গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা দরকার।

সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান ও লোকাচার

দেশীয় ঐতিহ্যবাহী সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানের উপরও পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যেতে পারে, কুচবিহারের রাজবংশীদের ভাদ্র মাসে 'মামী হাতে ভাত খাওয়া' বহুল প্রচলিত একটি অনুষ্ঠান, যা পরম্পরা ধরে চলে আসছে। গোটা ভাদ্র মাস ধরে চলে এই অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের প্রধান বিষয় হল ভাগ্না-ভাগ্নীরা ভাদ্র মাসে মামা-মামীর বাড়ীতে গিয়ে মামীর রান্না করা ভাত খাবে। কথিত আছে যে, এই ভাদ্র মাসে ভাত খেলে ভাগ্না-ভাগ্নীর আয়ু বেড়ে যায়। বর্তমানে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন অনেকটাই কমে গেছে। তবে এই অনুষ্ঠানে বর্তমানে এখন অনেকটা আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে, তা হল ভাগ্না- ভাগ্নি মামীর জন্য বস্ত্র ও সেই সঙ্গে মিষ্টি নিয়ে আসেন। তবে একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত অভিবাসীরাও এই অনুষ্ঠান ধুমধাম করে পালন করছে। এর প্রধান কারণ হল পাশাপাশি সহাবস্থান। তবে দুঃখের বিষয় হল কুচবিহারে রাজবংশিদের কৃষিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান 'নয়া করা' বা 'নবান্ন উৎসব' তেমনভাবে পালিত হচ্ছে না, প্রায় অবলুপ্তির পথে। কুচবিহারের স্থানীয় লোকভাষায় 'নয়া' কথাটির অর্থ নতুন। কৃষকেরা অগ্রাহায়ণ মাসে নতুন ধান কেটে ঘরে নিয়ে এসে সেই ধানের তৈরী উপকরণ নিজে না খেয়ে প্রথম ভগবানের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। এই উৎসর্গীকৃত অনুষ্ঠানই হল 'নয়া করা উৎসব'। এককথায় নতুন ধানের চিড়ে বা চাল, নতুন গুড় এবং দুধ ও দই সহযোগে তৈরি পরমান্ন ঈশ্বর বা দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। শুধু তাই নয়, নতুন ধানের তৈরি অন্ন রান্না করে নিজেরা খাবার পূর্বে পরম পিতৃপুরুষদের আত্মার

উদ্দেশ্যে বাড়ির বাইরে রাস্তার মোড়ে নিবেদন করা হয়। কথিত আছে পূর্বপুরুষরা বা পিতৃপুরুষরা কাক- শেয়ালের রূপ ধারণ করে এই পরমান্ন গ্রহণ করেন। তারপর অবশিষ্ঠ অন্ন প্রসাদরূপে আত্মীয়সহ পরিবারের সকল সদস্য গ্রহণ করেন। মোট কথা, আমন ধানের নয়া চাল-চিড়েই ছিল নয়া করার প্রধান উপকরন। সেইসঙ্গে গুড়, চিনি, কলা, দুধ, দই, নয়া ধানের আতপ চাল প্রভৃতি। তবে এই আনুষ্ঠান অঞ্চলভেদে আলাদা আলাদা নামে পরিচিত যেমন- আমাদের দেশের দক্ষিণে রয়েছে 'পোঙ্গল উৎসব', উত্তর-পূর্বের আসামে 'বিহু উৎসব' এবং পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সেটাই 'নবান্ন উৎসব'।[20] কুচবিহারসহ পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জনগোষ্ঠীর এই উৎসব 'নয়া করা উৎসব' নামে খ্যাত। বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি, ফসলের জাত প্রভৃতির উপর নির্ভর করে কৃষিকেন্দিক এই লোকাচারটির সময় একটু হেরফের হয়। সাধারণত 'নয়া করা'- র দিন হিসেবে প্রতি বছর অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিনটিকে বেছে নেওয়া হয়। এই উৎসবটি কুচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবাংলার বৃহত্তম রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান কৃষিকেন্দ্রিক উৎসব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কুচবিহারে রাজবংশীদের বহুল প্রচলিত এই 'নয়া করা উৎসব' বা 'নাবান্ন উৎসব' সেই সঙ্গে 'বাস্ত শান্তি স্বস্ত্যয়নি' লোকাচার কয়েক দশক ধরে আর তেমনভাবে পালিত হচ্ছে না। এখনকার নতুন প্রজন্ম বা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা এই নয়া করা উৎসবটির কথা জানে না বললেই চলে। শুধু 'মামী অন্ন' ও 'নয়া করা'' উৎসবই নয় কুচবিহারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের আদি জনজাতিদের কৃষিকেন্দ্রিক লোকাচার যেমন-' হালযাত্রা', ষাইট পূজা, গছিবুনা, ধানে আগ নেওয়া, ইতুপূজা, হুদুম দ্যাও পূজা, ব্যাঙের বিয়াও, পুষুণা, মকচাষ, ভাণ্ডানী পূজা ইত্যাদি লোকাচার সেরকমভাবে পালিত হচ্ছে না বললেই চলে। দেশভাগের পর কুচবিহারে আগত অভিবাসীদের সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব স্থানীয় রাজবংশী হিন্দু ও মুসলমান সমাজের উপর চরমভাবে প্রতিফলিত হয়- যা উপরিউক্ত বক্তব্য থেকেই সহজেই অনুমেয়। এখন দক্ষিণবঙ্গীয় ও পূর্ববঙ্গীয়দের প্রভাবে গ্রাম থেকে শহর সবত্র রাজবংশী, রাভা, ভূটিয়া, ভাটিয়া, নমশূদ্র, মুসলমান, বর্ণহিন্দু, ব্রাহ্মণ সকলেই ইংরেজি নববর্ষ, বর্ষবিদায় দিবস, বড়দিন পালন, জন্মদিন পালন ইত্যাদি উৎসব অতি আগ্রহের সঙ্গে পালন করছে। এখন তো জন্মদিন পালনে ইংরেজি গানের সঙ্গে কেক কাটানো হচ্ছে।[21] তাছাড়া, উপরের এই প্রতিটি অনুষ্ঠানের পালনের দিনে আত্মীয় নেমন্তন্ন থেকে শুরু করে ব্যাপক ভোজেরও আয়জন করা হচ্ছে। স্কুল-

কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এখন রাখিবন্ধন উৎসব, দোল উৎসব, সরস্বতী পূজা ইত্যাদি উৎসব রুটিনমাফিক অতি আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দেশভাগের পরোক্ষ প্রভাবে কুচবিহারর সাংস্কৃতিক পটচিত্র যে বদলাচ্ছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সাম্প্রতিককালে কুচবিহারে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান যেমন- বিবাহ, অন্নপ্রাশন, শ্রাদ্ধানুষ্ঠান ইত্যাদির মধ্যেও সংস্কৃতির গ্রহণ-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। স্বাধীনতা পরবর্তী কুচবিহারে রাজবংশী সমাজের বিয়েতে ছেলে- মেয়ের বয়সের ক্ষেত্রে কনের বেলায় ষোল এবং বরের বয়স একুশ বা বাইশ ছিল। পরে এই বয়স কমে দাঁড়ায় কনের ক্ষেত্র দশ- এগারো এবং বরের ক্ষেত্রে সামান্য বেশি। পরে ১৯৩০ সালে কনের বয়স বেড়ে দাঁড়ায় চোদ্দ থেকে সতেরো এবং বরের বয়স কুড়ি থেকে ত্রিরিশ যা সারদা আইন এ স্বীকৃত।[22] কিন্তু কুচবিহারের রাজবংশী সমাজে কনের বয়স দশ-বারো বছর হলেই বিয়ে দেওয়ার তোরজোড় শুরু হয়ে যায়। কন্যাপণ কুচবিহারের রাজবংশী সমাজের বিবাহে দীর্ঘদিন থেকেই চালু ছিল। একে বলা হত 'ব্যেচে খাওয়া'। W. W. Hunter তাঁর 'Statistical Account of Bengal', vol. 10 এ রাজবংশী সম্প্রদায়ের তিন ধরনের বিবাহের বিবরণ দিয়েছেন[23] যথা-১. গান্ধর্ব বিবাহ- পুরনো হিন্দু রীতির বিবাহ যেখানে কনে নিজে তার স্বামী পছন্দ করেন। কিন্তু রাজবংশী সমাজে পিতা বা অভিভাবক নিজে মেয়ে বা ছেলে পছন্দ করেন। ২. ব্রাহ্ম বিবাহ (ফুল বিয়াও)- এটি হচ্ছে প্রথাগত বিবাহ, বর্ণহিন্দুর রীতি-নীতি মেনেই এই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়। ৩. বিধবার পুনর্বিবাহ- এতে কোন অনুষ্ঠান হয় না, তথাবি এই বিবাহজাত সন্তান পিতার সম্পত্তির অধিকারী হন। কুচবিহারের রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিবাহ থাকলেও 'ফুল বিবাহ'-ই হল শ্রেষ্ঠ বিবাহ। এক্ষেত্রে কথা পাকা হলে কনের ও বরের মাথায় ফুল বেঁধে আশীর্বাদ করা হয়। রাজবংশী সমাজের বিয়ের কয়েকটি দিক হল- ছেলে- মেয়ের বিবাহযোগ্য বয়স হলে ঘটক বা করেয়া উভয় পরিবারের মধ্যে আলোচনা শুরু করেন। এজন্য ঘটককে এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে ঘুরে বেড়াতে হয়। রাজবংশী সমাজের বিয়েতে একটি বিশেষ প্রথা ছিল 'মিতর ধরা'। বিয়ের মিতর (মিত্র) না হলে বিয়ের ব্যাপারটাই অঙ্গহানি ঘটে। তাছাড়া, বিবাহে 'ছেলের বা মেয়ের মাথায় জল দেওয়া' যা 'জল ছিটা' নামে খ্যাত। সেইসঙ্গে দেশীয়

পুরোহিত 'অধিকারী' এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আসামের ব্রাহ্মনেরা বিবাহকার্য সুসম্পূর্ণ করেন। একথা ঠিক যে, কুচবিহারে রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলন, উপবীত গ্রহণের অধিকার, শিক্ষার প্রসার এবং ক্ষত্রিয় সমাজের ব্রাত্যত্ব মোচনের ফলশ্রুতি হিসেবে রাজবংশী সমাজের বিয়েতে আমূল পরিবর্তন বলে মনে করা হচ্ছে। তবে সম্প্রতি কুচবিহারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের বিবাহ অনুষ্ঠানে পূর্ব ও দক্ষিনবঙ্গীয় অভিবাসী সমাজের প্রভাব পড়েছে। তাই, 'মিতর ধরা' 'জলছিটা' ইত্যাদি রাজবাংশীদের চিরাচরিত প্রথা এখন প্রায় উঠে গেছে। ভাটিয়াদের (পূর্ববঙ্গীয়দেরকে স্থানীয়রা ভাটীয়া বলে) প্রথাসিদ্ধ 'বাসিবিবাহ' অনুষ্ঠানটি রাজবংশি সমাজে সেভাবে চল নেই। রাজবংশী বিবাহ কার্য যথা- হোম-যঞ্জাদি, মন্ত্রাদি, সপ্তপদী বর্তমানে বর্ণহিন্দুদের ব্যাকরণ কৌমুদী, পুরোহিত দর্পণ ধরেই সুসম্পূর্ণ হচ্ছে।[24] তবে শহরে এবং কিছু কিছু শিক্ষিত রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের বিবাহে এখন ভাটিয়াদের রীতি মতো বিবাহের পরদিন 'বৌভাত অনুষ্ঠান' (বর্তমানে ইংরেজি- Reception বা wedding party) না করে এক বা দু দিন বাদে এই অনুষ্ঠানটি করছে। সাম্প্রতিক কুচবিহারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় রাজবংশী ও ভাটিয়াদের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক বা বিবাহ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এর কারণ হিসেবে উচ্চশিক্ষিত, পেশা সূত্র এবং 'love marriage' (ছেলে- মেয়ের উভয়ের পছন্দের বিবাহ)- কেই মেনে নেওয়া হয়েছে।

শুধু বিবাহ নয়, রাজবংশী সমাজে বন্ধুতে বন্ধুতে 'সখা' পাতানো এক চিরাচরিত প্রথা এখন আর কুচবিহারে দেখা যায় না। সেইসঙ্গে রাজবংশী সমাজের কেউ মারা যাবার পর অনুষ্ঠিত 'শ্রাদ্ধানুষ্ঠান' এবং মুখান্নপ্রাসন অনুষ্ঠানেও ব্যাপক অভিবাসীদের প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কেউ মারা গেলে রাজংশী সম্প্রদায়ের তেরো দিনে মৃতের বাড়িতে বৈতরণী প্রথা ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়। আগে এই অনুষ্ঠানে দই চিড়া ভোজের ব্যবস্থা ছিল এবং কলা গাছের পাতা ও ডোংওল(কলা গাছের কান্ড থেকে তৈরি)-এ খাবার ব্যবস্থা ছিল। এখন এই অনুষ্ঠানে লুচি-পুরি, ভাত, ডাল সহ মৎসমুখী এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর থেকে বোঝা যায় যে, কুচবিহারে গ্রহণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া দারুণভাবে কাজ করছে। তাই এইসব বিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

লোকগান, সঙ্গীতকলা ও শিল্পকলা

এবার আসছি লোকগান ও সঙ্গীতকলা বিষয়ে। কুচবিহার জেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হল ভাওয়াইয়া। এই ভাওয়াইয়া গান কুচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানসিক দর্পণ। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, প্রেম ও প্রতিবাদ, সততা ও বিকৃতি-সবকিছুই দর্পণের মতো ধরা পরেছে এই গানে।[25] এই জেলার আনাচে-কানাচে, গ্রামে-গঞ্জে, খেতে-খামারে, বাঁশ-বাগান ও সুপারিবাগানের মাঝখান দিয়ে যাওয়া নুড়িপথ অথবা তিস্তা-তোর্সা-কালজানি-ধরলা-মানসাই এর বিস্তীর্ণ চর এ কান পাতলেই মন মাতানো যে সহজসরল সুরটি ভেসে আসে তা হল ভাওয়াইয়া। ভাওয়াইয়ার সুরকার-গীতিকার হলেন গ্রামের অতি সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ। আজ ভাওয়াইয়া শুধু কুচবিহার নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গ, নিম্ন আসেমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল-ধুবড়ি, গোয়ালপাড়া ও কোকড়াঝাড় ইত্যাদি জেলা এবং সেই সঙ্গে বাংলাদেশের রংপুর, রাজশাহী প্রভৃতি জেলাতেও এর জনপ্রিয়তা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ভাওয়াইয়া রাজবংশী জাতির কৃষ্টি-সংস্কৃতির বাহক ও পরিচায়ক। এই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার প্রতি বছর আয়োজন করে চলেছে 'রাজ্য ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতা'।

সুর ও ভাবের দিক থেকে ভাওয়াইয়াকে গিদালরা 'দরিয়া' ও 'চটকা' এই দুই শ্রেণিতে ভাগ করেন। ভাওয়াইয়া গানের বিষয় বস্তুর মধ্যে বিভিন্ন ভাবধারা বহমান। যেমন— কৃষকের গান, খেতমজুরের গান, প্রেমের গান, গাড়িয়ালের গান, মইশালের গান, মাহুতের গান, দেহতত্ত্বমূলক গান, বিয়েবাড়ির গান, মেয়েলি গান, পূজা-পার্বণের গান (মনসাপূজা, ষাইটোল পূজা, বিষহরি গান ইত্যাদি) এবং পালাগানের মধ্যে বিষহরা, কুশান ইত্যাদি। আব্বাসউদ্দিন আহমেদের গাওয়া একটি প্রচলিত ভাওয়াইয়া গান— 'আজি ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে-- 'ভাওয়াইয়া জগতের একটি অসামান্য গান, যা এপার বাংলা-ওপার বাংলায় একটি অন্যতম জনপ্রিয় গানে পরিণত হয়েছে। তবে এই ভাওয়াইয়া গান শুধু রাজবাংশীরাই নয়, বর্তমানে শহরের ভাটিয়া ও দক্ষিণবঙ্গীয় উদ্বাস্তু ছেলে-মেয়েরাও এই গান শিখছেন। কুচবিহারের ভাওয়াইয়া সঙ্গীত চর্চায় আব্বাসউদ্দিন আহমেদ, সুরেন্দ্রনাথ রায়

বসুনিয়া, কেশবচন্দ্র বর্মন, নায়ের আলি টেপু, সুনীল দাস, শ্যামাপ্রদ বর্মন প্রমুখ শিল্পী ভাওয়াইয়া সঙ্গীতকে মর্যাদার আসনে স্থাপন করে গিয়েছেন। বর্তমানে সুশিলচন্দ্র রায়, নীহার বড়ুয়া, নারায়ণ রয়, আয়েশা সরকার, দয়মন্তী রায়, আল্পনা গুপ্ত, সুনীতি রয়, গঙ্গাধর দাস, জ্যোৎস্না বর্মন প্রমুখ ভাওয়াইয়া লোকসঙ্গীতকে প্রতিভার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। শুধু ভাওয়াইয়া নয়, সেইসঙ্গে, বিভিন্ন পালাগান- বিষহরী পালা, কুশান পালা, মুসলমান সমাজের বিয়ের গান বা পালা, 'দোতরার ডাং পালা' ইত্যাদি কুচবিহারের রাজবংশী সমাজে গুরুত্বপূর্ন পালাগান হিসেবে খ্যাত। বিষহরী পালা আগে গৃহস্থ বাড়ীতে সাতদিন ধরে হত, কিন্তু এখন একদিনের বিষহরী পালাই বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কুচবিহারে সুন্দুরা গিদাল বা রাজকুমার গিদাল এর বিষহরী পালা খুব জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কোন পৌরাণিক কাহিনী বা বর্তমান সমাজের বাস্তব চিত্রকে অবলম্বন করে রচিত হয় কুশান পালাগান যা কুচবিহারের গ্রামাঞ্চলে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কুচবিহারে ললিত বর্মনের 'ললিত কুশানী' দল কুশান গানের ক্ষেত্রে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাছাড়া, কালিদাস বর্মন, ধরণী রয়, ধরণী বর্মন, উপেন বর্মন, কাশীরাম বর্মন, বাঁশী গিদাল, শ্রীকান্ত অধিকারী, কার্তিক গিদাল প্রমুখ কুচবিহারে কুশান গানকে এক অনবদ্ধ রূপ দান করেছেন। পাশাপাশি রূপকথা, উপকথা, কিংবদন্তি বা কোন সামাজিক কাহিনীকে আশ্রয় করে রচিত হয়েছে 'দোতরার ডাং পালা'। 'মধুমালা- মদনকুমার', ময়নামতি, পঞ্চকন্যা ভাগ্যধর, মৈষাল বন্ধু প্রভৃতি খুব জনপ্রিয় দোতরার ডাং পালা। ধনবর দাস, ফারাস মিঞা, ডোমা মুচি, খোকা রয়, কাশী রয়, সুশীল রয় প্রমুখ 'দোতরার ডাং পালা'র উল্লেখযোগ্য গিদাল।

তবে আশার আলো বর্তমানে শহুরের ভাটিয়া পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু ছেলে মেয়েরাও এই ভাওয়াইয়া গান শিখছেন ও গাইছেন। এ বিষয়ে অনেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রীও পাচ্ছেন। উত্তরবঙ্গ উৎসব ও ডুয়ার্স উৎসবের একই মঞ্চে ভাওয়াইয়া, রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, বিহু, সাঁওতালি, রাভা, গারো প্রভৃতি নৃত্যানুষ্ঠান হচ্ছে। তবে কুচবিহারে ভাটিয়ালি গানে তেমন সাড়া পড়েনি। তা সত্বেও একথা বলতেই হয় যে, কুচবিহারের লোকসংস্কৃতি বা বিভিন্ন লোকগানগুলি আজ বিপন্ন। এর কারণ বহুমুখী, যথা— কৃষির ক্রমহ্রাসমান অবস্থা, আধুনিক শিক্ষা, শহুরে সংস্কৃতি, রাজনৈতিক অনীহা, অন্য সংকৃতির আগ্রাসন, অর্থনৈতিক

পশ্চাদপদতা, মানুষের আড়ম্বর ও সুসংহত জীবন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিরোধ, যতোচিত শিক্ষার অভাব, আপন সংস্কৃতির প্রতি উদাসীনতা, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে ভাওয়াইয়ার মতো জনপ্রিয় লোক সংকৃতি ও লোকগানগুলি আজ তাদের স্বকীয় মর্যাদা হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানে বিশ্বায়নের যুগে শুধু কুচবিহারের লোকগান, লোকনাটক, লোক সংকৃতিতে বহুজাতিক উন্নতমানের সংকৃতির প্রভাব পরেছে তা নয়, এমনকি রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নজরুলগীতিতেও ব্যাপক প্রভাব পরেছে। হিন্দি ও ভোজপুরি ফিল্মী চুটুল নাচের দিকে বর্তমানে শিক্ষিতদের একটা বড় অংশ এবং যুব সম্প্রদায় দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। তাই স্থানীয় লোকগানগুলির অবস্থা আজ বিপন্ন।

খাদ্যাভাস ও পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে

দেশভাগের পর কুচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের স্থানীয় রাজবংশী নৃগোষ্ঠীর খাদ্যাভাসের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন হয়েছে। রাজবংশীরা সাধারণতঃ আমিষ ভোজী। খাদ্য হিসেবে এঁরা ছবা ও ভত্তা খাবার(পোড়ানো খাবার), সিজা(যেকোনো সবজি সেদ্ধ করানো), ভাজি খাবার(দানাশস্য থেকে সবজি সবকিছু ভাজা করে খাওয়া), ছ্যাকা(কলাগাছের গোড়ার অংশ পুঁড়ে তৈরী ছাই থেকে নিঃসৃত জল) দিয়ে তৈরী খাবার, প্যালকা(ছেঁকার মতো একই পদ্ধতিতে তৈরী তবে এক্ষেত্রে সবুজ শাক-সবজি, কচি পাতা, বিশেষ করে নাপা শাক এর মধ্যে কলাগাছের তৈরী সেই নির্যাস নিঃসৃত রস-এর সঙ্গে শকনো মাছের গুড়া মিশিয়ে তৈরী করা হয়), সিদোল(শুকনো মাছের গুঁড়োর সঙ্গে কালা কচু ও ওসুন-পেয়াজের মিশ্রিত দলা হল সিদোল), ফোক দই, মসম(মাংসের তরকারি), শুকাতি(পাটের পাতা শুকিয়ে তৈরি হয়), মাছের তরকারি, মাছের শাক, শুকটা শাক, নাউ ডাল, কচু ডাল, কুমড়ার ডাল, পান্তাভাত, দই-চিঁড়া, বিভিন্ন ধরনের শাকসবজি, বিভিন্ন ধরনের কচু শাক ও শোলা কচু ও বই কচু প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খাদ্য খেয়ে থাকেন।[26] কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রভাবে এবং দেশ বিভাগের পরে অভিবাসীদের এতদঞ্চলে আগমনের ফলে স্থানীয় রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে গ্রহণ ও সংশ্লেষণ ঘটেছে। বিশেষ করে খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে। ফলে দেশীয়দের চিরাচরিত খাদ্য ছ্যাকা, প্যাল্কা, সিদল, দই-চিড়া ইত্যাদির প্রচলন কমছে। বর্তমানে শহুরে শিক্ষিত প্রজন্ম চা, বিস্কুটে অভ্যস্ত। সেই ধারা গ্রামেও এখন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পোশাকের ক্ষেত্রেও

আধুনিকতার ছাপ পড়ছে। রাজবংশীরা চিরাচরিত পোশাক পছন্দ করত। বিশেষ করে অনুষ্ঠানাদিতে ধুতি ও শাড়ি ব্যবহার করত। তবে মাঠে কাজের সময় পুরুষরা ‘নেংটি’ এবং মহিলারা ‘বকুনি’ ও ‘ফোতা’ পড়ত।[27] তবে কুচবিহারে ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয় আন্দোলনের ফলে ‘নেংটি’ ও ‘বকুনির’ ব্যবহার হ্রাস পায়। সময়ের সঙ্গে তাল রেখে রাজবংশীরাও এখন আধুনিক মার্জিতপূর্ণ সুন্দর ও মসৃণ পোশাক ব্যবহার করছেন। সেইসঙ্গে ক্রমশ পূর্ববঙ্গীয় ও দক্ষিণবঙ্গীয়দের মতো রাজবংশীরাও আধুনিক পোশাকে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছেন।[28] বর্তমানে কুচবিহারে রাজবংশী, অ-রাজবংশী সকলেই শার্ট, প্যান্ট, পাঞ্জাবি, কোট, শু, পাজামা, চুড়িদার, কুর্তি, সালোয়ার, শাড়ী, টুপি, চশমা ব্যবহার করছেন। এক্ষেত্রেও গ্রহণ-সমন্বয় প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সুতরাং, ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা ও যুগপৎ দেশভাগের ফলে কুচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের উত্তরাংশে উদ্বাস্তু অভিবাসীদের আগমনের ফলে এতোদ্ঞ্চলে সমাজ, অর্থনীতি ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে—একথা অস্বীকার করা যায় না। তবে একথাও ঠিক যে দেশীয় ও ভাটিয়ারা দীর্ঘদিন পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে বিভিন্ন বিষয়ে গ্রহণ ও সংশ্লেষণ ধারাটি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। এককথায় বলতে গেলে কুচবিহারসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গের গ্রাম ও শহরাঞ্চলে আগত অভিবাসীরা যেভাবে পূর্ববঙ্গীয় বা ভাটির সংস্কৃতিকে এখানে প্রসারিত করেছেন, তেমনি এখানকার স্থানীয় রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতিকেও অতি সহজেই আত্তীকরণ করেছেন। আর এখানকার স্থানীয় মানুষরাও বিশেষতঃ রাজবংশীরাও তাদেরকে গ্রহণ করেছেন মন থেকেই। তাই কুচবিহার এখন এপার-ওপার বাংলার সংস্কৃতির মহামিলনের ক্ষেত্রভূমিতে পরিণত হয়েছে।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

1. খান চৌধুরী, আমানতুল্লাহ, ‘কোচবিহারের ইতিহাস’, (কোচবিহার স্ট্রেট প্রেস, ১৯৩৬), পৃ. ৭.

2. Gait, E. A. ‘History of Assam’, 1933, p. 48.

3. স্যানাল, চারুচন্দ্র, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, (আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৭) পৃ. ১০২-১১১.

4. দেবনাথ, মহেন্দ্র, 'কোচবিহারের সম্পূর্ণ ইতিহাস', (মিত্রম, কোলকাতা, ২০১৮) পৃ. ১৮৫-১৮৯

5. সাহা, প্রদোষ রঞ্জন, 'এখন ডুয়াস কোচবিহার' (জলপাইগুড়ি, ২০১৭) পৃ. ১০৪-১১১.

6. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ৩৮৩.

7. Majumdar, Durgadas, West Bengal District Gazetteers: Koch Bihar (Calcutta, 1977), p. 46.

8. Ibid, p. 47.

9. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ৩৮৩

10. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৫৪

11. স্যানাল, চারুচন্দ্র, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, (আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৭), পৃ. ২৬৩.

12. দাস, বিশ্বনাথ, কোচবিহারের সমাজ ও সংস্কৃতি (অনিমা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০১৪) পৃ. ১৫৭-১৫৮.

13. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০) পৃ-১৩৫-১৩৬.

14. ঘোষ, আনন্দগোপাল, 'দেশবিভাজনঃ ধর্ম-সমাজ-সংস্কৃতির নতুন বাতাবরণ' শারদীয়া বার্তা, কোচবিহার, ১৪২৫.

15. সাক্ষাৎকার, সুনীলচন্দ্র প্রামাণিক, গোসাইরহাট সৎসঙ্গ কেন্দ্র, তারিখ- ১২-০৪-২০২৩.

16. সাক্ষাৎকার, সুনীলচন্দ্র প্রামাণিক, গোসাইরহাট সৎসঙ্গ কেন্দ্র, তারিখ- ১২-০৪-২০২৩.

17. সাক্ষাৎকার, ফনিন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত, তারিখ-২৭-০৩-২০২৩.

18. সাক্ষাৎকার, ফনিন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য, ভাঐরথানা গ্রাম পঞ্চায়েত, তারিখ-২৭-০৩-২০২৩.

19. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ১৩৬-১৩৭.

20. লস্কর, নৃপেন্দ্র, উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবন, (দি সী বুক এজেন্সি, কলকাতা, ২০১৮) পৃ. ১৮০-১৮৩.

21. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০), পৃ. ১৩৭.

22. নাগ, হিতেন,'কামতাপুর থেকে কোচবিহার', (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কোলকাতা) পৃ. ৬৩.

23. স্যানাল, চারুচন্দ্র, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, (আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৭) পৃ. ১৭৬-২৩১.

24. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল', (গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ১৩৯.

25. সাহা, প্রদোষ রঞ্জন, 'এখন ডুয়াস কোচবিহার' (জলপাইগুড়ি, ২০১৭), পৃ. ২১-২২.

26. স্যানাল, চারুচন্দ্র, 'উত্তরবঙ্গের রাজবংশী, (আনন্দ পাবলিশার্স, কোলকাতা, ২০১৭) পৃ. ৯৭-১০২.

27. বিশ্বাস, রাজর্ষি, 'দেশভাগের লাভ-ক্ষতি- বাংলার উত্তরাঞ্চল',(গাঙচিল, ২০২০) পৃ. ১৩৮-১৩৯.

28. অধিকারী, মাধবচন্দ্র, 'রাজবংশী সমাজ ও মনীষী পঞ্চানন বর্মা', কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ২৯-৩৪.

বিশ শতকের উপন্যাসে সমাজ-মানসের রূপ ও রূপান্তর

ড. জয়ন্ত কুমার রায়
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
ময়নাগুড়ি কলেজ, জলপাইগুড়ি

সংক্ষিপ্তসার

সমাজ নদীর স্রোতের মতো প্রবহমান। নদী চলতে যেমন বাঁক নেয়, তেমনি মহাকালের অভিঘাতে সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতির চেনামহলে নানা রকমের অচেনা রূপ ফুটে উঠে। দেশকালের ঘাত-প্রতিঘাতেই সজীব থাকে সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা। জাতীয় জীবনে যদি কোন সংকট উপস্থিত হয়, জীবন ধারণের সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হয়, মহামারী বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রাণ সংশয় অবস্থা তৈরী হয়, তখন সাহিত্যের বাঁক পরিবর্তন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। পরিবর্তিত হয় মূল্যবোধ। অর্থসংকট, খাদ্য সংকট থেকে অস্তিত্বের সংকট—প্রতিটি স্তরে উন্মেচিত হয় রকমারি সমস্যা ও বিপদ থেকে ইতিবাচক পথ খোঁজার জেদ ও সাহস। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রকে 'রূপ' এবং মহাকালের নিয়মে নানা ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্ব, চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়ে সেই বাস্তব রূপের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনকে বলা যায় 'রূপান্তর'। ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর উপন্যাসে বাঙালী মধ্যবিত্ত মেয়ের স্ব-নির্ভর হওয়ার প্রয়াস, হিন্দু বিধবার অসহায়তা, নির্যাতিতার বেদনা ইত্যদি নারী কথা স্থান পেয়েছে। তারা শুধু প্রকৃতিগত পরিচয়ে 'নারী' হয়ে থাকতে চায় না; সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতির প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'মানুষ' এর অভিধায় নিজেদের দেখতে চায়। বিশ শতকের সমাজমানসের এই 'রূপ' এবং 'রূপান্তর' এর চিহ্ন তাঁর 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' এবং 'এপার গঙ্গা অপার গঙ্গা' উপন্যাসে কাহিনী-চরিত্র-ঘটনা-সংলাপ-পরিবেশ-মনস্তত্বের আধারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালের উপন্যাসে গুরুত্ব পেয়েছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নারীর আত্মজাগরণের রূপ রীতির মেজাজ। তাঁর আখ্যানে ফুটে উঠেছে শিক্ষা-রুচি ও আর্থ-সামাজিক স্তরভেদে নারীর বিচিত্র মনোবৃত্তি ও অহংবোধের ভঙ্গিমা। সুলেখা সান্যালের 'নবাঙ্কুর' এবং 'দেওয়াল পদ্ম'

হয়ে উঠেছে একদিকে নারীর আত্মজিজ্ঞাসার দলিল, অন্য দিকে রূপান্তরিত বিশ শতকের বাঙালী সমাজমানসের প্রবাহমান চিন্তা-চেতনার বাস্তব ইতিহাস।

সূচক শব্দ : মূল্যবোধ, নারীর চেতনা, অধিকার, রূপান্তর, বিশ শতক, সংকট।

বিশ্লেষণ-অন্বেষণ : মহাকালের অভিঘাতে সমাজে রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতির চেনা মহলে নানা রকমের অ-চেনা রূপ ফুটে ওঠে। সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিমানস ও আচারের বিবর্তন ঘটে। ফলে প্রচলিত চিন্তা, চেতনা, জীবনাদর্শ ও রীতি-নীতি, সামাজিক বিধির স্থিতাবস্থা বাঁক বদলের সংকেতে আন্দোলিত হয়। বিশ শতকের গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত পরাধীন ও স্বাধীন ভারত তথা বাংলার বুকে বিচিত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। পরাধীনতা থেকে মুক্তির জন্য নানা ছকে স্বদেশী রাজনীতি, শাসক ব্রিটিশের দেশ-ভাগের ষড়যন্ত্র এবং সেই ধূর্ত প্রচেষ্টা প্রতিরোধে স্বদেশী-বয়কটের মতো বিদেশী প্রশাসন বিরোধী উগ্র আন্দোলন, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও বিশ্বব্যাপী অস্থিরতা, খাদ্য-সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের সংকট ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বলশেভিক বিপ্লবের জয়ে শ্রমজীবী জনতার মধ্যে আত্মমুক্তির উত্তেজনা ও সম্ভাবনা, গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ, আইন অমান্য, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবী জুড়ে স্বাধীনতা, ন্যায়, সাম্য, শান্তিকামী সাধারণ মানুষের গণআন্দোলন, বাংলা দেশে প্রাকৃতিক বিপর্যয়, তীব্র মুদ্রাস্ফীতি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে কালোবাজারি, দাঙ্গা, কৃষক-শ্রমিকের নেতৃত্বে তে-ভাগা, ধর্মঘটের মতো শ্রমজীবী জনতার আন্দোলন, দেশ-ভাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা, উদ্বাস্তু সমস্যা, দেশজ শাসকের পরিচালনায় স্বাধীন ভারতবাসীর ক্রমাগত স্বপ্নভঙ্গ, সামাজিক-অর্থনৈতিক-বাজার ব্যবস্থায় অস্থিরতা, কৃষকের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তথা জমিদার-জোতদারের দ্বারা ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষক-বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের ফুঁসে ওঠা তথা নকশাল আন্দোলন, শিক্ষিত নারীর স্বাবলম্বী হওয়ার বাসনা ও কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তা, বাম সরকারের নেতৃত্বে আইনসভায় তফশিল জাতি, উপজাতির প্রতিনিধিত্বের বিধি প্রণয়ন, অভিবাসী সমস্যা প্রভৃতি বহু ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বিশ শতক জুড়ে সমাজমানসে ব্যাপক পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সংঘটিত হয়েছে। বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে বেঁচে থাকার

সঙ্গে সেই জলজ্যান্ত সমাজ অভিজ্ঞতাকে নিবিড় সহানুভূতির সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করেছেন নারী-ঔপন্যাসিকেরা, পরিণামে তাঁরা রচনা করেছেন ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজস্ব বীক্ষা জারিত সময়-সত্য ও ইতিহাস-চিহ্নিত অস্তিত্বের সংকট, পাত্র-পাত্রী-ঘটনা-প্রসঙ্গ চিহ্নিত বাস্তবের কত 'কথা', ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্তিত জীবনের নাছোড় আখ্যান। ফলত তাঁদের উপন্যাসে সমাজমানসের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে দেশ-কাল-পাত্রের প্রামাণ্য দলিল। যুগান্তরিত সমাজ-সভ্যতা-সংস্কৃতির সাহিত্যিক নিদর্শন। বিশ শতকের মহিলা ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবী, সুলেখা সান্যালের কলমে সমাজমানসের এই পরিবর্তনশীল রূপ ও রূপান্তর, গভীর সংবেদনশীলতা ও সহানুভূতির সঙ্গে উপস্থাপিত হয়েছে উপন্যাসে।

বিশ শতকের নারী'রা, পূর্ববর্তী শতকের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার ভিত্তিতে, দ্রুত জীবন ও জগতের বাস্তবতা, পরিবেশ ও পরিস্থিতির পুনর্মূল্যায়নের নতুন নতুন পথ আবিষ্কারের সচেষ্টা হলেন। কী ইউরোপে, কী ভারতীয় উপমহাদেশে নারীরা সাহিত্য ও সংস্কৃতির দর্পণে নিজেদের প্রকৃত অবস্থা ও অবস্থানের নিরপেক্ষ প্রতিবিম্ব দেখতে চাইলেন। নারী জীবনের নতুন সংজ্ঞা, পথচলা, বেঁচে থাকার শর্ত... ইত্যাদি বিষয়ে 'রোড ম্যাপ', নিজেরাই তৈরী করতে উৎসাহী হয়ে উঠলেন। পিতৃতন্ত্রের ছায়া থেকে নিষ্ক্রমণই শেষ কথা নয়; প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে যে সমস্ত বিষয়কে, তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য, পালনীয় বলে জেনেছেন এসেছে নারীরা, সেই সব স্থবির অলীক মায়াবী জগত-বিধি-পরিস্থিতিকে ফিরে দেখার এবং মোকাবিলা করার জন্য নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও কৌশল অনুশীলনে তৎপর হলেন একালে মুক্তচেতনা, স্বাধীনতা, সাম্য, সহযোগিতা এবং জগতের রকমারি কর্মযজ্ঞে অংশগ্রহণকারী বাঙালি মেয়ে-বৌ-মায়েরা। তাঁদের মননে-চিন্তনে এমন বিশ্বাস জন্মাল, নিজেদের সমস্যা, দাবি, বেঁচে থাকার পরিবেশের জন্য চাই বিকল্প ধারণা। অম্ল-মধুর আত্মকথাকে প্রকাশের উপযোগী নিজেদের বয়ান, চিন্তাপ্রণালীর স্বাধীনতা, মতামত প্রকাশের পরিস্থিতি। এই 'অপর' ভাববিশ্বকে দুর্বলতা ও পশ্চাদ্‌পরতার অভিব্যক্তি না ভেবে, প্রকৃতি-পরিবেশ-সমাজ কেন্দ্রিক স্বতন্ত্র ও বিকল্প অবস্থানের উৎস বলে ভাবতে শুরু করলেন নতুন যুগের শিক্ষা-চিন্তা-চেতনায় সঞ্জীবিত বিশ শতকের নারী। তাই, বিশ শতকের ঘটে যাওয়া নানা রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-দার্শনিক ঘটনা, ঘাত-প্রতিঘাত সচেতন নারীমন আলোড়ন

সৃষ্টি করল। সমাজমানসের রূপান্তর শুধু নারীদের মনোজগতকে আন্দোলিত করল না, তার প্রতিক্রিয়া হিসাবে তাঁদের লেখনীতে ফুটে উঠল পরিবর্তিত দেশ-কালের প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সঙ্গে অন্তর্বাস্তবতার নিরাসক্ত সত্য-স্বরূপ। পুরুষশাসিত সমাজের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজ স্বর্ণকুমারী দেবী যেন মজা পুকুরে ঢিল ছুঁড়লেন। তাঁর সাহসী লেখনিতে প্রথম, নারীর নিজস্ব দেশ-কাল-সমাজের নৈর্ব্যক্তিক বীক্ষা উপন্যাসের আধারে গ্রথিত হল। আধুনিক বাঙালি, এই প্রথম বুঝতে পারল, নারীর উপলব্ধিতে নারীর অন্দরমহলের অন্তর্নিহিত ভাষা ও ভাবনা, নারীর লাবণ্য ও লবণাক্ত চোখের জলের ইতিহাস। যুগ যুগ ধরে পুরুষশাসিত সমাজের অনুগ্রহ ও দৈবানুকূল্যের আশায় কিংবা প্রত্যাশায় শান্ত বঙ্গনারীকে মরে বাঁচতে হয়েছিল। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে সেই অবসিত রাত্রি পার করে ঊষালগ্নের সূচনা করেছিলেন ঔপন্যাসিক স্বর্ণকুমারী দেবী। তিনি লিখেছিলেন জীবনলগ্ন গার্হস্থ্য নারীর এবড়ো-খেবড়ো কর্কশ আখ্যান।

ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর সমসাময়িক দেশ-কালকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেছেন, চারপাশের সমাজ ব্যবস্থাকে ধারণ করেছে তাঁর গ্রহিষ্ণু মন। স্বাধীনতা-পূর্ব এবং স্বাধীনত্তোর ভারতবর্ষে দাঙ্গা লাঞ্ছিত নিরীহ নর-নারী জানে এক শ্রেণির অত্যাচারী ধর্মোন্মাদ মানুষের বর্বরোচিত আচরণ। এই বর্বরতা আরো বেশি নৃশংস আকার ধারণ করে ছিল অসহায় নারীর ওপরে পীড়নে, লাঞ্ছনায়। সমগ্র জাতির ভুলের মাশুল গুনেছে নারী। তারা শুধু প্রকৃতিগত পরিচয়ে 'নারী' হয়ে থাকতে চায় না; সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 'মানুষ'-এর অভিধায় নিজেদের দেখতে চায়। কিন্তু পুরুষ সমাজ নারীকে 'মানুষ' অভিধানে রাখলেও প্রাপ্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে প্রতিদিন, প্রতি পদক্ষেপে। বিশ শতকে সমাজমানসের এই রূপ ও রূপান্তরের চিহ্ন, ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসে সুচিন্তিত ভাবে কাহিনি-চরিত্র-ঘটনা-সংলাপ-পরিবেশ-মনস্তত্ত্বের আধারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মূল্য গৃহের মধ্যেই সীমায়িত। গৃহকাজ, পুরুষের মনোরঞ্জন, সন্তানধারণ, বংশ রক্ষা, সন্তান প্রতিপালনেই নারীর যাবতীয় শারীরিক ও মানসিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। তাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায়, নারীর মূল্য নির্ধারিত হয় নারীর রূপ-যৌবনে ও তার পিতা অর্থ কিংবা বংশ

কৌলিন্যে। তাই 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ' উপন্যাসে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, আর এক ধাপ এগিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়াই চলে, গান্ধীজীর নেতৃত্বে ডাণ্ডি অভিযান সফল হয়, আধুনিক ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙে যায় ইত্যাদি সমাজ জীবনে ও মানসে হাজারও পরিবর্তন ঘটে কিন্তু কুৎসিত-কালো, অর্থহীন বাবার মেয়ের বিয়ে হয় না। শিক্ষিত, মহিলা কলেজের অধ্যাপিকা বাণী কালো হওয়ায় তার জীবনে ফোটে না বিয়ের ফুল। অসহায় ও অবমাননা নিয়েই বাণী ধীরে ধীরে রাজনীতির অঙ্গনে পা রাখে। নিজের অবস্থার সঙ্গে নারীরা দেশ ও দশকে উপলব্ধি করতে শেখে। বাণী গান্ধীজীর ডাণ্ডি অভিযানে যোগ দিয়ে উপলব্ধি করেছে 'মনে হয় এ-তো শুধু নুনের কথা নয়, আহার্যে একান্ত দরকারি নুনের মতোই জীবনে স্বাধীনতার কথা। আসলে মনে হয় মহাত্মাজী যেন নুনের রূপকে জানাচ্ছেন আমাদের প্রতি গ্রাসের আহার্যের নুনের মতোই স্বাধীনতাও জীবনে অপরিহার্য।'[1] পুরুষরাও রাজনীতিতে নারীদের নেতৃত্বকে মেনে নেয়। সমাজ মানসের এই রূপান্তরের দলিল হয়ে উঠেছে 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ'।

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' উপন্যাসটিও সমাজ মানসের এক জীবন্ত দলিল। ছেচল্লিশের দাঙ্গায় এক রাতে সুতারা নামে মেয়েটি মা-বাবা-দিদি সবাইকে হারিয়ে অনাথ হয়ে পড়ে। জীবন বাঁচাতে মুসলমান ঘরে আশ্রয় নেয়। সেদিন রাজনৈতিক স্বার্থে সংঘটিত দাঙ্গা হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতির বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলেও আপামর সাধারণ মানুষ ছিল একে অপরের দোসর। 'ওর কেউ নেই। সবাই মরে গেল। কোথায় যাবে। ভাইগুলো বিদেশে, এখনও আসতে পারে নি, চিঠিও দিয়েছি। গোপালবাবু আমার ইস্কুলের মাস্টার। তাঁর মেয়ে ভয়ের চোটে অসুখে পড়ে গিয়েছিলো, তাই এনে রেখেছি আমার কাছে।ভাইরা এলে নিয়ে যাবে, এতে দোষটা কি সাহেব?'[2] তাই মুসলমানরা সুতারাকে আশ্রয় দিয়েছে এবং সুতারাও আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু দাঙ্গা মানুষের মনে যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে তাতে হিন্দু ও মুসলমান হয়েছে একে অপরের শত্রু। সমাজমানসে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, অবিশ্বাস ও সন্দেহ তীব্র আকার নিয়েছে। সুতারা মুসলমান ঘরে আশ্রয় নেওয়ার অপরাধে সমাজের কাছে, পাড়া প্রতিবেশী কাছে হয়ে উঠেছে 'ব্রাত্য'। অর্থাৎ দাঙ্গা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী

সমাজমানসের পরিবর্তিত স্বভাব-লক্ষণগুলি নিরাসক্তভাবে ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী এই আখ্যানের পরতে পরতে শৈল্পিক দক্ষতায় গেঁথেছেন।

দাঙ্গার সঙ্গে চওড়া হয়েছে দেশভাগের ফাটল। দেশভাগের ফলে অসংখ্য মানুষ উদ্বাস্তু হয়ে ছিল। পাঞ্জাব থেকে বাংলায় সেদিনের ভুক্তভুগী নারীদের লাঞ্ছনার ইতিহাস কম দীর্ঘ ছিল না। শুধু সুতারা নয়, অসংখ্য নারী মাতৃভূমি, পরিবারকে হারিয়ে ছিন্নমূল হয়ে পড়েছিল। সুদূর দিল্লীতেও ছিন্নমূল নারীদের ভিড়। অধ্যাপিকা সুতারার সহকর্মী কৌশল্যাবতী পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়ানী ও উদ্বাস্তু। শুধুমাত্র রাজনৈতিক কারণে নারী যে ছিন্নমূল তা কিন্তু নয়; এর পিছনে পারিবারিক কারণও দায়ী। কৌশল্যাবতীর জীবনেও রয়েছে অত্যাচারের ছাপ। আসলে সুতারার জীবনে যেন দীর্ঘ শিকড় ছড়িয়েছে তার মতো লক্ষ লক্ষ অসহায় উদ্বাস্তু ক্ষত-বিক্ষত নারীর জীবন-কথা। সুতারার মধ্য দিয়ে ঔপন্যাসিক ধারণ করতে চেয়েছেন বিশ শতকীয় যুগসঞ্জাত যন্ত্রণা, মানুষের সংজ্ঞাকে বিকৃত করা পাশবিক বোধ, বিপন্ন মানবিকতার বিষণ্ন উপলব্ধি। নায়িকা সুতারা দত্তের জীবন কাহিনী-ই উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু। তার জীবনের মধ্য দিয়েই অমূল্যবাবুর চোখের সামনে ভেসে ওঠে আসন্ন স্বাধীনতার এক বিভ্রান্ত বেদনাতুর চিত্র। তার মনে হয়—'সুতারাই যেন দেশ জননীর সেই বেদনার একটি রক্তাক্ত প্রতীক।'[৩] ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' এমনই এক শিল্পরূপ, যেখানে দেশভাগের ক্ষতচিহ্ন আকর হলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠেছে সমকালীন অস্থির অসহিষ্ণু সমাজের জীবন্ত দলিল।

দেশবিভাগের ট্র্যাজেডির ধার-ভার, বিপর্যয়ের হতাশা পুরুষ-নারী, প্রত্যেক সচেতন নাগরিককে আহত করেছে। কিন্তু জ্যোতির্ময়ী, নারীদের শরীর ও সম্মানের উপর তার আঘাত, বেদনা, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের স্পন্দন পরিস্ফুট করলেন দেশ-কাল-সমাজ সচেতন নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে। বস্তুত সময়ের স্রোতে দেশকাল, সমাজ পরিবেশের যে বাঁক পরিবর্তন তাকেই জ্যোতির্ময়ী দেবী ধরার চেষ্টা করেছেন উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। সেই সূত্রে, তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা সেই বিপন্ন সময়ের প্রতীক হয়ে উঠেছে। জ্যোতির্ময়ীর সুতারা যেন রামায়ণের সীতারই নব রূপায়ণ। দেশভাগ, দাঙ্গা বাংলার সমাজ ইতিহাসে শত শত সীতার জন্ম হয়; কিন্তু এই আখ্যানের সীতারূপী সুতারা নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরী করে নেয় শিক্ষার আলোয়। প্রমোদের

কথায় জানা যায় উদ্বাস্তু মেয়েদের নির্বাসনের কথা, পাতাল প্রবেশের কথা। তার উক্তি— 'সীতাহরণ হলো। রাম-রাবণের যুদ্ধ হলো। বিভীষণ আর রাম রাজা হলেন। লঙ্কা ও অযোধ্যার সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু সীতাদের দলে দলে বনবাস আর পাতাল প্রবেশ কেউ ঘোচাতে পারলো না।' ঔপন্যাসিক জ্যোতির্ময়ী দেবীর 'এপার গঙ্গা অপার গঙ্গা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য হল এক দাঙ্গা লাঞ্ছিত নারীর জীবন কাহিনি। ৪৬-এর দাঙ্গার এক রাত্রে সুতারা দত্ত তার মা, বাবা, দিদিদের হারিয়ে অনাথ হয়ে যায়। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মধ্য দিয়ে কলকাতা শহরে আপনজনদের কাছে ফিরে এলেও তারা তাকে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করে নি। তাই সে বোঝার মতো হয়ে ওঠে আত্মীয়ের পরিবারে। নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও সুতারার জীবন যুদ্ধে টিকে থাকার নাছোড় মনোভাব শেষ পর্যন্ত তার জীবনে সাফল্য এনে দেয়। সে দিল্লীর যাজ্ঞসেনি কলেজে অধ্যাপিকার চাকুরি পায়। এই কলেজে সুতারা পাঞ্জাবী ক্ষত্রিয়ানি, বেনিয়া-ব্রাহ্মণ, রাজস্থানি বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের ছাত্রীদের সাঙ্গ লাভ করে। সুতারার ঘরে অধ্যাপিকা কৌশল্যাবতীর দেশবিভাগের গল্প শোনে। আসলে স্বাধীনতার পূর্ব-মুহূর্ত এবং স্বাধীনতার পরবর্তী ভারতবর্ষে দাঙ্গা লাঞ্ছিত নিরীহ মানুষদের ওপর বর্বরোচিত আচরণ; এই বর্বরোচিত আচরণ আরও বেশি নৃশংস হয়ে উঠেছিল নারী জাতির উপর—সেই ঘটনার অনবদ্য কথা রূপ হল 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা'। সুতারার পাণিপ্রার্থী প্রমোদ যেন তার-ই পথের পথিক। আখ্যানের প্রধান পুরুষ চরিত্র প্রমোদের মানসিকতা হল, প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় নারী যেন কখনই পরিবার, সমাজের চোখে বোঝা হয়ে না ওঠে; নিজস্ব বুদ্ধি, প্রতিভা, কর্মতৎপরতা, শিক্ষা, চেতনার যথাযথ প্রয়োগে নারী যেন পুরুষের যোগ্য সহকর্মী, সহমর্মী হয়ে উঠতে পারে। হিন্দু মেয়ে সুতারা কিছু দিন প্রতিবেশী 'মুসলমান' তামিজ সাহেবের বাড়িতে থাকার জন্য তার আত্মীয়-স্বজনেরা বিরূপ চোখে দেখতে শুরু করে। 'জাত গেছে' এমন ভাবনায় তাড়িত হয়ে সুতারাকে আপন করে কাছে টেনে নিতে না পারলেও প্রমোদ নিজের গুণে জীবন সঙ্গী করতে এগিয়ে আসে। সুতারার মনে এই বিষয়ে সংশয় দেখা দিলে প্রমোদ, তার হাত ধরে বলে ওঠে, 'হ্যাঁ, তুমি তোমার কাকা সাহেবের ঘরে ছিলে। আমি জানি। তাঁর চেয়ে মহৎ লোক আর কেউ তখন সেখানে ছিল না তোমার কাছে, তাও জানি।'[৪]

বিশ শতকের জটিল সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে একদা ব্রাত্য নারী, ক্রমশ অভিজ্ঞতা, শিক্ষা, পরিস্থিতির কারণে আত্মবিশ্লেষণের মাধ্যমে আত্মমুক্তির পথ খুঁজেছে। ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালের উপন্যাসের নারী চরিত্ররা পুরুষতান্ত্রিক সমাজের তৈরী করা ভ্রান্ত নিয়ম-নীতি-আদর্শ-সংস্কার-আচার-বিশ্বাসের প্রতিবাদ করেছে, অন্বেষণ করেছে নিজস্ব ভুবন। তাঁর 'নবাঙ্কুর' উপন্যাসে সমাজজীবনে নারীর এই আত্মসচেতন রূপ এবং রূপান্তর অনেকাংশে প্রতিফলিত হয়েছে। নায়িকা ছবির মধ্য দিয়ে লেখিকা সুলেখা সান্যাল অন্তঃপুরবাসিনী নারীর অন্তর সত্তাকে জাগিয়ে তুলেছেন। অবরোধবাসিনী নারী হয়ে ছবি জীবন অতিবাহিত করে নি। স্বশিক্ষার আলোয় পুরুষ শাসিত সমাজে সে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করে সমাজ প্রগতির পথ অন্বেষণ করেছে। ঘর-সংসার-পরিবার, সন্তান প্রতিপালনের চিরাচরিত ধারণাকে ছবি নারী জীবনের পরম, চরম সত্য বলে স্বীকার করে না। তার কাছে আত্মবোধের বিকাশ, মুক্ত চিন্তার বিস্তার, সামাজিক চেতনার উন্মেষ...ইত্যাদি ধারণাগুলি অগ্রাধিকার লাভ করেছে। এভাবেই সমাজ-মানসের রূপান্তরকে কালের গতি-প্রকৃতির সঙ্গে মিলিয়ে আখ্যানে বুনে দিয়েছে কাল-সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যাল। জীবন অভিজ্ঞতার নিরিখে লেখিকা ছবি চরিত্রে দেখেছেন, সমাজে নারীর স্ব-নির্ভরতার অবস্থা ও অবস্থানের গতি-প্রকৃতি। পরিবারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নারী জীবনের তাৎপর্য সন্ধান করেছে ছবি রাজনৈতিক পরিসরের বৃহত্তর পটভূমিতে। ছবি প্রসঙ্গে অধীর কাকা বলেছে— 'ওকে জোর করে কিছু করানো যাবে না বৌদি। নিজেরা তো মনের টুঁটি টিপে মেরেছেন, ছবিকে দিয়ে ওটা আর নাই বা করালেন। আর তাছাড়া... ওর যদি মনের জোর থাকে ওর পথ ও নিজেই বেছে নেবে...।'[৫] পুরুষের এই আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে নারীর অবরোধবাসিনী রূপের বাঁধনহারা অবস্থানের সঙ্গে স্ব-নির্ভরতার কালান্তরিত ইশারা স্পষ্ট হয়েছে। নারীর এই প্রগতিশীল জীবনচেতনা একই সঙ্গে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্নবাহী দেশ-কালের গোত্রান্তরের স্বরূপকে উন্মোচিত করেছে।

ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে শিক্ষা-সভ্যতা-রুচি ও আর্থ-সামাজিক স্তরভেদে নারীর বিচিত্র মনোবৃত্তি ও অহংবোধের ভঙ্গিমা। যা

স্বাধীনতা-উত্তর দেশকালের প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর নারীর স্বভাব ও মেজাজের জীবন্ত ভাষ্য হয়ে উঠেছে। তাঁর 'দেওয়াল পদ্ম' উপন্যাসে প্রতিভাত হয়েছে নারী-সমাজের আত্মবিশ্লেষণী প্রকৃতি ও আত্ম-রূপান্তরের চিত্র। উপন্যাসে দেখা যায় অভিজাত শিক্ষিতা, শহুরে, ডাক্তার অসীমা যে মানসিক অবস্থার মধ্য দিয়ে কুমারপুর গ্রামে বোনের বাড়িতে পা দিয়েছিল, নানা ঘটনার মাধ্যমে মাত্র দেড় দিনের কম সময়ে তার মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। অসীমা-সহ তাদের পরিবারের ধারণা, তার বিবাহিতা বোন অনিমাকে মেরে ফেলেছে তার শ্বশুর বাড়ির লোকজন, সেই নিষ্ঠুর ইতিহাস গ্রামের মাটিতেই চাপা পড়ে আছে। অনিমার জীবনের সেই চাপা ইতিহাস খুঁড়তে, তার সন্তান সোনা ও টুকুকে নিয়ে যেতে শহর থেকে গ্রামে আসে অনিমার বড়ো বোন তথা ডাক্তার অসীমা। কিন্তু আখ্যানে নাটকীয় মোড় পরিবর্তন দেখা যায়, বোনের স্বামী সঞ্জয়ের মুখে অনিমার চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতার কথা কাহিনি শুনে। এতদিন ধরে পরিবারের সকলের সঙ্গে অসীমা যাকে মৃত বলে জেনে এসেছে, যার ইতিহাস চাপা দেওয়া হয়েছে গ্রাম্য পরিবেশে, সেই বোন অনিমা স্বামী, সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি তথা সংসার ছেড়ে নিজের জৈব সুখের সন্ধানে একদিন বেরিয়ে গেছে অন্য পুরুষের হাত ধরে। এই ঘটনা অসীমার চেতন-অবচেতন মনে তথা শিক্ষিত সত্তার সমস্ত অহংকারকে ভেঙে চুরমার করে দেয়। অসীমা নিজের কাছে নিজে ভেঙে অনুশোচনায়— 'আমার সমস্ত ব্যবহারের জন্যে আমাকে ক্ষমা করবেন, সঞ্জয়বাবু। একবার হাসপাতালে এক মায়ের সঙ্গে আমি এমনি ব্যবহার করেছিলাম। পরে আমার সেই ব্যবহারই আমাকে এমন করে ফিরে মেরেছে যা আমি কখনও ভুলবো না।'[৬]

দেশভাগ বাংলা ইতিহাসে ঘোর অন্ধকার, কালো সময়। এই সময়ের রূপ পরিস্ফুট হয়েছে ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালের 'দেওয়াল-পদ্ম' উপন্যাসে। কাহিনিতে আছে, পূর্ববঙ্গের যে মফঃস্বল শহরে সঞ্জয়ের বাড়ি ছিল তার পাশেই ছিল সঞ্জিদার(মিন্টি) বাড়ি। মুসলিম হলেও অবাধ যাতায়াত ছিল দুটি পরিবারের মধ্যে। এমন কি সঞ্জয়ের মা হিন্দু প্রতিবেশীর চেয়ে বেশি বিশ্বাস করত সঞ্জিদা ও তার পরিবারকে। কিন্তু দেশভাগ আলাদা করে দিল হিন্দু-মুসলমান বলে দুটি পরিবারকে। এ প্রসঙ্গে ঔপন্যাসিকের প্রতিক্রিয়া—'তারপর সেই লাল রঙের ঢেউটা উঠল। প্রচণ্ড একটা ধাক্কা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল আমার আর মিন্টির মাঝখানে। আমাদের

দুজনের ধরা হাত দুখানাকে কে যেন প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে আলাদা করে দিল। আমি কেমন হতভম্ব বিমূঢ়। মিন্টির বুকভাঙা কান্না। চারিদিকে রব উঠেছে! চারিদিকে রব উঠেছে, পালাও। পালাও। চল, যাই-বাঁচি! কে যেন হুড়মুড় করে আমার হাত ধরে টানতে টানতে এনে ফেলল এ পারে। ওপারে মিন্টির কান্নাটা চাপা পড়ে গেল।'[৭] 'দেওয়াল-পদ্ম' উপন্যাসের পরতে পরতে প্রতিফলিত হয়েছে শিক্ষিত আত্মনির্ভর নারীর আত্মসংস্কারের স্পৃহা, আত্মবোধের উন্নতি এবং সমাজ-সত্যের ধারও ধারাবাহিকতাকে অন্বেষণের প্রবণতা। মাত্র দেড় দিনেও কম সময়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিত ডাক্তার অসীমার মন, মানসিকতার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে যায়। গ্রাম সমাজে বিয়ে হওয়ার কারণে অনিমার স্বামী ও পরিবার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করে অসীমা-সহ তার পরিবার। অসীমাও তার পরিবার জানে অসীমা আত্মহত্যা করেছিল শ্বশুর বাড়ির অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে। তাইতো অসীমার পরিবার ভাবে - 'অনিমার শ্বশুর আর স্বামীর পরিচয়টা এখন শহুরের মনের বিস্ময় আর মুগ্ধতা ছাড়িয়ে অবজ্ঞা আর বিতৃষ্ণার মাখামাখি।'[৮] কিন্তু কুমারপুর গ্রামে পৌঁছে অসীমার যাবতীয় ক্ষোভ, অবজ্ঞা, দূরে চলে যায় যখন বোনের স্বামী সঞ্জয়ের কাছ থেকে আসল সত্য জানতে পেরে। অনিমা আত্মহত্যা না করে স্বামী, ছেলে-মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ি অর্থাৎ সংসার ফেলে বেড়িয়ে যায় পরপুরুষের হাত ধরে— এটা শোনার পর অসীমার মন, প্রাণ, শরীর যেন অবশ হয়ে ওঠে। 'দেওয়াল-পদ্ম' উপন্যাসে আছে আরো কত আধুনিক সময়ের চিহ্ন। অনেক কষ্ট করে অসীমার প্রেমিক পুরুষ লন্ডনে পৌঁছায় ডাক্তারি পড়ার জন্য। সেখানে লরা নামে বিদেশিনীর মোহে ভুলে যায় অসীমাকে। অসীমার ভালোবাসা যেন পরাজিত হল লরার মতো বিদেশিনীর কাছে। এভাবে ঔপন্যাসিক সুলেখা সান্যালের উপন্যাস বিশ্ব হয়ে উঠেছে একদিকে নারীর আত্ম-জিজ্ঞাসার দলিল, অন্যদিকে রূপান্তরিত বিশ শতকের বাঙালি সমাজমানসের প্রবহমান চিন্তা-চেতনার আকাড়া বাস্তব ইতিহাস।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১) দেবী জ্যোতির্ময়ী, 'বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৮২

২) দেবী জ্যোতির্ময়ী, 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা',দে'জ পাব.,কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১১৮

৩) তদেব, পৃ. ১২১

৪) তদেব, পৃ. ১৮৬

৫) সান্যাল সুলেখা, 'নবাঙ্কুর', মনীষা, কলকাতা, ১৯৯০, পৃ. ২৮৩

৬) সান্যাল সুলেখা, 'দেওয়াল-পদ্ম', সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃ. ৫৭

৭) তদেব, পৃ. ৯৮

৮) তদেব, পৃ. ১৩

গ্রন্থপঞ্জি

আকর গ্রন্থ :

১. দেবী জ্যোতির্ময়ী, রচনা সংগ্রহ ১, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৮

২. সান্যাল সুলেখা, নবাঙ্কুর, মনীষা, কলকাতা, ১৯৯১

৩. সান্যাল সুলেখা, দেওয়াল পদ্ম, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৯৬

সহায়ক গ্রন্থ :

১. আজাদ হুমায়ুন, নারী, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১২

২. ঘোষ সুদক্ষিণা, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৮

৩. পাহাড়ী গোপালকৃষ্ণ, আধুনিক ভারত চর্চা, কল্যাণী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৬

৪. বাগচী যশোধরা, নারী ও নারীর সমস্যা, অনুস্তুপ, কলকাতা, ২০০২

৫. ভট্টাচার্য তপোধীর, নারী চেতনাঃ মননে ও সাহিত্যে, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৭

৬. মাজী উমা, বাংলা সাহিত্যে মহিলা কথাকার [সম্পা.], দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০২

৭. মুর্শিদ গোলাম, নারী প্রগতিঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গ রমণী, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, ২০০১

৮. রায় অলোক, বিশ শতক, প্রমা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৭

নাগরিক জীবন সংকটের জীবন্ত দলিল বাংলা ছোটগল্প

ড. মিনাল আলি মিয়া
সহকারী অধ্যাপক
বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়, আলিপুরদুয়ার

সংক্ষিপ্তসার : ছোটগল্প হল যুগ-যন্ত্রণার ফসল। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে বাংলা ছোটগল্পের পথ চলা থেকে যৌবনে উপনীত হয়েছে। আবির্ভাব কালের সময়কাল থেকে একুশ শতক পর্যন্ত জীবন-সমাজ-অর্থ সমস্যার বহুবিধ বিষয় ছোটগল্পের আখ্যানে প্রতিফলিত হয়েছে। বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে নাগরিক সভ্যতার আগ্রাসন, জীবন-যাপনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অস্তিত্ব সংকট একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একাধিক গল্পকার নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গি দিয়ে নাগরিক সভ্যতার আর্থিক-সাংস্কৃতিক ও মনন-বিবেকের ভঙ্গুর অবস্থাকে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত, উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে একুশ শতকের সময়ের বিবর্তনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতার অপব্যয় ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে মানুষ ক্রমশ হতাশ, নিঃসঙ্গ ও একাকীত্বের দ্বার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। মানুষ কখনও হয়েছে মানুষের সুস্থ-সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার অন্তরায়; কখনও লালসা-বাসনা ও কামনার শিকার।

সূচক শব্দ : নাগরিক, জীবন-যাপন, মানবিক মূল্যবোধ, বন্ধন, বিশ্বায়ন, বাণিজ্যায়ন হতাশা, নিঃসঙ্গ, একাকীত্ব প্রভৃতি।

বিশ্লেষণ-অন্বেষণ : বর্তমান মানুষের প্রধান লক্ষ্যবস্তু ফ্ল্যাটবাড়ি, গাড়ি, প্রযুক্তির কম্পিউটার এবং আনুষাঙ্গিক অন্যান্য উপকরণ সর্বোপরি নাগরিক জীবন যাপন। নাগরিক ও গ্রামীন জীবনের প্রতিযোগিতায় গ্রামের পরিধি থেকে হারিয়ে গেছে এবং যাচ্ছে গরুর গাড়ি, কুঁড়েঘর, পুকুর-বাঁশঝাড়, কুটিশিল্প, সহজ-সরল মানসিকতা। নগরায়নের জয়জয়কার আধুনিক নগর মনস্কতার সূচনা ঘটেছিল ব্রিটিশ শাসনের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়ে। কিন্তু ভারতের নগর সভ্যতার সূচনা বহুপ্রাচীন কালে। হরপ্পা সভ্যতা তার আদি পর্ব। রাজা-বাদশাহদের রাজত্ব কালে নগর ছিল। নগর ছিল রাজা ও আভিজাত শ্রেণির বাসস্থান এবং প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক ও ভোগবিলাস

কেন্দ্র। নগরে সাধারণ মানুষদের বসবাসের সুযোগ ছিল না। এই শ্রেণির নাগরিক জীবনের ঈঙ্গিত মেলে চর্যাপদে– 'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ।/ছোই ছোই জাহ সো বাহ্ম নাড়িআ।।'[১] ১৭৬৪ খ্রিষ্টাব্দে ইষ্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ভারতে উপনিবেশিক শাসন সূচনা। ক্রমে কোম্পানির বাণিজ্যিক স্বার্থে নগর জীবনে নতুন মাত্রা সংযোজিত হয় শাসন কাঠামো। ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও বাণিজ্যিক চক্রে বাবু, কেরানি, দালাল, গোমাস্তা, মৎসুদি প্রভৃতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। এক শ্রেণির মানুষের হাতে চলে আসে প্রচুর অর্থ। ইউরোপের ঢেউয়ে কলকাতায় ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা শিকড় বিস্তার করে। ১৮৮১ সালে নগদ টাকার প্রচলন ঘটে। জিনিস পত্রের দাম বেড়ে যায়। নগদ টাকার লোভ ও নানা আর্থিক সুবিধার স্বার্থে মানুষ শহরমুখী হয়। এমনকি জমিদারও শহরমুখী হতে থাকে। ফলে নগর জীবনে ঘটে ধনী-দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংমিশ্রণ, আর্থিক বৈষম্য। কারও হাতে প্রচুর টাকা, কেউ শ্রমিক, অনাহারি, ফুটপাতের বাসিন্দা। বিল্ডিং বাড়ি, ফ্ল্যাট, রঙিন জীবন যাপনের রকমারি প্রতিযোগিতায় মানুষের লোভ লালসা, জট জটিলতা, আত্মকেন্দ্রিকতা নগর জীবনে জায়গা করে নেয়। নগর জীবনে লক্ষ্য করা যায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ, আত্মসচেতনতা, নিঃসঙ্গ, অর্থনৈতিক সংকট এবং যৌন জটিলতা ও মানসিক ঘাত-প্রতিঘাত ইত্যাদি মাত্রা। এই প্রসঙ্গে বিশিষ্ট সমালোচক সত্যেন্দ্রনাথ রায় বলেছেন– 'আধুনিকতার নামে তারই সঙ্গে এসে মিশেছে অন্ধ পাশ্চাত্যানুকরণ, অর্থহীন বিলেতিয়ানার ফ্যাশান, বিলেতি জীবনচর্যায় নির্বিচার অনুকরণের চেষ্টা, প্রভুর পোশাকে সজ্জিত হবার বাসনা, অনতি-প্রচ্ছন্ন দাস-মনোভাব, আষ্টেপৃষ্টে– জড়ানো হীনমন্যতা।'[২] এই মন্তব্যকে সমর্থন করে বলা যায়– সমাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মাত্রাগুলির তারতম্য ভিত্তিক নাগরিক জীবন-যাপনের বহুবিধ টানাপোড়েন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকট নিয়ে বাংলা ছোটগল্পের ভুবনবিশ্বে বহু ছোটগল্প রচিত হয়েছে। কিছু ছোটগল্প আলোচনা করে নাগরিক জীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংকটের দিকগুলি আলোকপাত করা যাক–

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরেরে 'মধ্যবর্তিনী' গল্পে নগরকেন্দ্রিক কেরানীর জীবনের টানাপোড়েন দেখানো হয়েছে। ম্যাক্‌মোরন কোম্পানির হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র। সন্ন্যাস লাভের উদ্দেশ্যে বুড়ো বয়সে তার দ্বিতীয় বিবাহ। প্রথম দিকে নানা ওজর-আপত্তি থাকলেও শৈলবালার সোহাগে নিবারণ আত্মহারা। প্রেমকে সে নুতুন

ভাবে বুঝতে শিখেছে। কোম্পানির ক্যাশ্ তহবিলের টাকা সরিয়ে প্রথম স্ত্রী হর সুন্দরীকে আড়ালে রেখে শৈলবালা হয়ে ওঠে তার যাপিত জীবনের বিলাসসঙ্গিনী। শৈলবালা রানী, আর হরসুন্দরী দাসী। গহনা-অলংকার শৈলবালার করায়ত্ব। শৈলবালা কাজ-কর্ম দায়িত্ব-কর্তব্য সমস্ত কিছুর উর্ধ্বে উঠে শুধু গ্রহণ করতে শিখে। ক্রমে সে নগরায়নের আগ্রাসে সমস্ত কিছুকে নিজের করে পেতে চায়। তার জন্য দায়ী নিবারণ। একদিন কোম্পানির তরফে জানিয়ে দেওয়া হল দুদিনের মধ্যে টাকা চাই। নিবারণ প্রথমে হরসুন্দরী, পরে শৈলবালার কাছে গহনারগুলির জন্য হাত পাতে। শৈলবালা সিন্দুকের চাবি ফেলে দেয় পুকুরে। তালা ভাঙার প্রস্তাবে শৈলবালা জানায়– 'তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব।'[৩] শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে নিবারণ দু'হাজার টাকায় বসতবাড়ি বিক্রি করে। কিন্তু সময় মতো টাকা পরিশোধ করতে না পারায় তার চাকরি চলে যায়। সন্তান প্রসবকালে মারা যায় শৈলবালা। দীর্ঘদিন নিবারণ হরসুন্দরীর পাশে শোয়। কিন্তু দু'জনের মধ্যে ব্যবধান থেকেই যায়। আসলে মেকি-সর্বস্ব নাগরিক জীবনে বাবুবৃত্তি কীভাবে মানুষকে আগ্রাসী, লোভী, নিঃস্ব করে মানবিক সম্পর্কেগুলিকে ভেঙে দেয় তারই চাল-চিত্রকে তুলে ধরেছেন। গল্পকার বলেছেন–'উহারা পূর্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনো সেইরূপ পাশাপাশি শুইল; মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।'[৪]

রবীন্দ্রনাথ 'মানভঞ্জন' ছোটগল্পেও নাগরিক জীবনে ব্যক্তির মর্যাদা ও স্বাতন্ত্র্যবোধকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। রামনাথ শীলের তিনতলা বাড়িতে গোপীনাথ ও তার স্ত্রী গিরিবালা বসবাস। সংসার জীবনে প্রথম পর্বে স্বামী-স্ত্রীতে গভীর ভালোবাসা থাকলেও ধীরে ধীরে তার অবনতি ঘটে। পিতার মৃত্যুর পর গোপীনাথ হয়ে উঠে বাড়ির কর্তা। বিভিন্ন দলের কর্তা হয়ে সে আপন গৌরব অর্জন করতে ব্যস্ত। থিয়েটার দেখা হয়ে ওঠে তার নেশা। থিয়েটারের অভিনেত্রী লবঙ্গ হয়ে ওঠে তার কামনার বস্তু। কিন্তু নবযৌবনা স্ত্রী গিরিবালার দিকে চোখ দেবার তার সময় নেই। গিরিবালা লবঙ্গের প্রতি স্বামীর আকর্ষণের কারণ অনুসন্ধান করে। দাসী সুবোধকে নিয়ে সেও থিয়েটারে যায়। সাজে-সৌন্দর্যে নিজেকে পরিপাটি রেখে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে। কিন্তু স্বামীকে সে ফেরাতে পারে না। 'মনোরমা' নাটকের নায়িকা লবঙ্গকে নিয়ে গোপীনাথ পালিয়ে যায়। স্বামীর এই অবজ্ঞার

প্রতিশোধ নিতে গিরিবালা ‘মনোরমা’ নাটকের নায়িকা সেজে অভিনয় করে। নতুন নায়িকার খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। গোপীনাথ অভিনয় দেখতে এসে গিরিবালাকে চিনতে পারে। শত শত হাততালির মাঝে গোপীনাথ চিৎকার করে— ‘গিরিবালা’ ‘গিরিবালা’ কিন্তু গিরিবালা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় না। বরং স্টেজের লোকেরা বাংলা-ইংরেজিতে বলেছে—“দূর করে দাও’, ‘বের করে দাও”[৫] একদিন গিরিবালা স্বামীকে পাওয়ার জন্য জ্বালা-যন্ত্রণায় দিন কাটিয়েছে আজ সে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য অধিকার বোধ থেকে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে শত শত দর্শকের কাছে। তাই দর্শকদের সে উপেক্ষা করতে পারেনি। গল্পকার লিখেছেন—‘সমস্ত কলিকাতা শহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল, কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।’[৬] নগরজীবন কৃত্রিম-জৌলস ব্যক্তিকে করে তোলে কামনা-বাসনাময়। ফলে মানুষ ভালোবাসার মানুষকে ভুলে ক্রমে হয়ে ওঠে হন্তারক, বিবেকহীন ও নিষ্ঠুর।

বুদ্ধদেব বসুর ‘জ্বর’ নগরায়ন জীবনের মানসিক টানাপোড়েন কেন্দ্রিক গল্প। অধ্যাপক রমাকান্ত বসু দু’বছর প্রেম করার পর সুধাকে বিয়ে করে। দু’জনেরই ভালোবাসা গভীর। তবুও অস্বস্তিকর উদ্বেগে রমাকান্ত বসুর রাত্রে ঘুম হয় না। শরীরে জ্বর জ্বর ভাব। জ্বর ও মানসিক উদ্বেগ কমাতে সে বঙ্কিবাজারে বন্ধুদের আড্ডায় যায়। সেখানে সতীশ রায়ের কর্কশ চিৎকার। বিজন হালদারের সাহিত্য চর্চা, হেমন্ত ও বিজনের ‘Cross-word Puzzle’ খেলা এই চার অধ্যাপক বন্ধুর চারিত্রিক নেশা রমাকান্তের জ্বরকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে আসে অথচ তার জ্বরে সুধার যেন কোন কাতরতা নেই। সুধা স্নান করে, খেয়ে দেয়ে পান চিবাতে চিবাতে লাল টুকটুকে ঠোঁট নিয়ে তার কাছে এসে হাজির হয়। সতীশ তাকে খুন করে সে মারা যায়, তবুও সুধার চোখে জল নেই। ‘সে একটু কাঁদিলও না, দরজা পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া হাসি মুখে তাহাকে বিদায় দিল।’[৭] কিন্তু শ্মশানে নয়, মনে হয় দেওঘর। যেখানে সুধার সঙ্গে রমাকান্তের প্রথম প্রেম হয়েছিল। পুরো ঘটনাটা রমাকান্তের জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখে। আসলে জ্বর শরীরে নয়, রমাকান্তের মনে। প্রেমিকা সুধাকে হারানোর ভয়ে তার এই জ্বর। নাগরিক জীবনের জট-জটিলতা ও পোশাকি মানুষের সন্দেহ বাতিক মন থেকেই তৈরি হয়েছে এই মানসিক দ্বন্দ্ব। মনের টানাপড়েন বিপরীতে ব্যক্তি হৃদয়ের আশা-প্রত্যাশার অন্তরায়

হয়ে ওঠে নাগরিক জীবনের আর্থিক সংকট ও অবহেলার কারণে। মানুষ ক্রমশ হয়ে পড়ে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা থেকে দেখা দেয় হতাশা ও মৃত্যুমুখী চেতনা। গল্পকার সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ‘সময়’, ‘জায়গা’ ও ‘ফুটপাত’ ছোটগল্পে তুলে ধরেছেন নাগরিক জীবনের বিভীষিকাময় রূপ। ‘সময়’ গল্পে বিপত্নীক মণিভূষণ বিয়েতে যৌতুক স্বরূপ ঘড়িটিকে স্ত্রীর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে হাতের কাছে রাখে এবং বিয়ে পরবর্তী চল্লিশ বছর ঘড়িতে দম দিতে কোনো দিনে ভোলেনি। কিন্তু বয়সের ভারে কর্মহীন মণিভূষণ হয়ে উঠেছে ছেলে মহিম ও পুত্রবধূ ঊষার বোঝা। বৃদ্ধ পিতার স্নেহ ও ভালোবাসার কোনো মূল্য নেই তাদের কাছে। ঊষা শ্বশুর মণিভূষণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়— ‘ও ঘড়ি মেরামতে দিয়ে কী হবে? চলবে আর? টেবিল-ক্লক তো আছেই এ-ঘরে।’[৮] সন্তানদের এহেন আচরণে ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মণিভূষণ হতাশ। ফলে পরিবারে থেকেও মণিভূষণ নিজ জগতে নিঃসঙ্গ ও একা। নিঃসঙ্গতা থেকে ক্রমে তাকে গ্রাস করে মৃত্যুমুখী চিন্তা-চেতনা। গল্পকার বলেছেন—‘ঘড়ি নেই। ভুল করেছেন। তবু হাতটা বুকের উপর রইল। খানিকটা সময়। তাঁর মনে হল, হৃদপিণ্ডের শব্দটা যেন ঘড়ির কাঁটা দুটোর মতোই কেঁপে কেঁপে থেমে গেল।’[৯] মণিভূষণের সমান্তরালে অম্বিকাবাবু শহুরে জীবন-যাপনের কঠিন লড়াইয়ে এক পারাজিত সৈনিক। নিজের মাথা গোঁজার ছাঁদ টুকে করতে পারেননি। স্ত্রী শোভাময়ী, তিন ছেলে ও এক মেয়েকে নিয়ে বাসাভাড়াতে তার দিন কাটে। বড়ো ছেলে অমিয় চাকরী হারিয়ে মানসিক ভাবসাম্য হারিয়েছে। মেজো ছেলে অশোক দিল্লীতে চাকরী করে। ছোটো ছেলে অনিল বি.এ. পড়ে। একমাত্র মেয়ে শিখার আর্থিক কারণে পড়াশুনা বন্ধ। একমাত্র অশোকেই পরিবারটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। খাই-খরচ চললেও ঘরে জায়গা নেই। ভাড়াবাড়ি ছাড়লে একেবারে ফুটপাত। কলকাতা শহর গরীবদের জন্য নয়, অর্থবান মানুষদের পীঠস্থান। হতাশ অম্বিকাবাবু বলেছে— ‘বাংলার সাড়ে তিন কোটি লোকের অর্ধেকেই তো কলকাতা। ... ট্রাম-ট্রেন-বাস যতো বাড়ছে যাত্রীও বাড়ছে তেমনই, স্কুল-কলেজেও একেই অবস্থা। অধিকাংশ কলেজে দেখেছি ছেলেরা বসার বেঞ্চ পেত না। আর এখনকার অবস্থা তো ভাবাই যায় না। কোথায় আছে জায়গা।’[১০] সারা জীবন ধরে আর্থিক সংকটে থাকা মানুষগুলো ধুঁকে ধুঁকে কাটালেও নিজের অস্তিত্বটুকু খুঁজে পায় না নাগরিক জীবনে। এমন কী মৃত্যুর পরেও অম্বিকাবাবুর মতো মানুষদের নিয়ে চলে টানা-হেঁচড়া। খাটিয়া পর্যন্ত জোটে না। সন্তানরাও হয়ে ওঠে শহরের মতো বাস্তবাদী, হিসেব-

নিকেশের কসাই, স্বার্থপর। অশোক বলে—'খাটিয়ার দরকার নেই ভাই; খুবই ছোট চৌকি বাবার— ওটাই যাবে।'[11] 'ফুটপাত' ছোটগল্পে উঠে এসেছে শহুরে মানুষের অস্তিত্ব সংকটের নির্মম চিত্র।

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'মঙ্গলগ্রহ' নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক বৈষম্য ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় জনিত এক নির্মম ছোটগল্প। একই বাড়ির দুটি ভাড়াটে। এক ভাড়াটে কুলদারঞ্জন পাইন। পার্কার এন্ড পার্কার কোম্পানির সিনিয়ার গ্রেড ক্লার্ক অর্থাৎ কেরানি। তারা এই বাড়িতে সতের বছর ধরে আছে। সস্তা ভাড়াতে ইলেকট্রিক ব্যবস্থা নাই বললেই চলে। মোমবাতি, রেডির তেল ও কেরোসিনে তাদের প্রদীপ জ্বলে। অভাব অনটন সারা বছর। তার সংসারে দুই মেয়ে প্রীতি, বীথি ও এক ছেলে মন্টু এবং স্ত্রী হেমলতা। হেমলতার বাতের ব্যথা। কেরানি কুলদারঞ্জন পঞ্চাশ বছর ধরে শুধু অন্ধকারেই দেখে। অন্ধকারের বাইরে আলোর জগৎ তার কাছে স্বপ্ন। উচ্চবিত্ত শ্রেণির লাবণ্য ও সৌন্দর্য তার মন রাজ্যে কামনার বস্তু। তাই ফাঁক-ফোঁক দিয়ে তাকিয়ে থাকে পাশের দরজায়। পাশের রুমে নতুন ভাড়াটে লীলাময়ী ও তার ইঞ্জিনিয়ার স্বামী। তাদের জীবনের রহস্য ও অর্থের পরিমাণ সাধারণ মানুষের ধরা ছোঁয়া বাইরে। রাতের বারোটা পর্যন্ত ওদের ঘরে আলো জ্বলে। সকাল দশটায় ঘুম ভাঙে—সবটাই যেন রহস্যময়। প্রয়োজনে লীলাময়ী ব্যবহার করে কেরানিকে। কেরানি মাংস এনে দেয়। কেরানি নিশুতি রাতে রেলিং ঘেঁষে দাঁড়ায়, তার দুটি চোখ খোঁজে লীলাময়ীকে। দেখতে পায়—'তবে আমি তো দেখলাম অন্ধকারে চোখ রেখে ও ব্লাউজের হুক্ খুললো।'[12] শিকারী টোপ গেলে। কামনায় কেরানি জীবন পুলকিত হয়। সুযোগটি কাজে লাগায়, ইঞ্জিনিয়ার—'দয়া ক'রে একটা রিক্‌শা ডেকে দিন না।'[13] লীলাময়ীও হাতে ধরিয়ে দেয় ব্যাগ। অফিস থেকে ফেরার পথে ইলিশ আনার ফরমাস। ক্লান্ত, অবসন্ন মানুষটি লজ্জার মাথা খেয়ে পরিবারকে ফাঁকি দিয়ে নিয়ে আসে মাছ। লীলাময়ী মাছ কাটতে বসে। মাছে টকটক রক্তের মতো লীলাময়ী তার জ্বলন্ত যৌবনের যৌনতার টোপ দিয়ে শিকার করতে চায় অসহায় অর্থনৈতিক ভাবে দুর্বল মানুষকে। ফারমাস খাটিয়ে মেটাতে চায় নিজের স্বার্থ। মানবিকতা সেখানে শূন্য। স্বামীকে ঘরে রেখে অন্যকে কাছে লাগায়। বাংলা সামাজিক, গ্রামীণ জীবনে অসম্ভব। নগরায়ন জীবনে সেটা সম্ভব। আর্থিক অনটন নিম্নশ্রেণির মানুষের জীবনের অভিশাপ।

সন্তোষ কুমার ঘোষের 'ভেবেছিলাম' গল্পটি ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দের প্রেক্ষাপটে লেখা। মহানগর কোলকাতা আর্থিক সংকটের নিদারুণ কষাঘাতে জীবনের সুখ শান্তি সম্পর্কের বাঁধন ছিন্ন ভিন্ন করে দেয়। শত যন্ত্রণাতেও কান্না বুকের ভিতরে আটকে যায়। হয় আত্মহত্যা, নয় অন্যায়-ব্যভিচার পথের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোন পথ থাকে না। থাকে না নতুন করে বাঁচার কোন স্বপ্ন। দুঃখ-কষ্ট রেহাইয়ের প্রত্যাশায় গ্রামের মানুষ নগর যায়। গল্পকথকরা ও তার পরিবার তারই প্রতিনিধি। কথকের বাবা কোম্পানিতে চাকরি করে। হঠাৎ একদিন কোম্পানি লক আউট হয়। টানাটানির সংসারে থিয়েটার দেখার শখ-আহ্লাদ, গায়ে তেল-সাবান মাখার সম্ভবনা চিরদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। অথচ পাশের রুমের জিপিও চাকরিরতা পরিবারটি সুন্দর, সচ্ছল অবস্থা। লেখক নাগরিক জীবনে কর্মহীন মানুষের কঠিন অবস্থা দেখিয়েছেন। নিজস্ব অর্থ-কড়ি ছাড়া ব্যবসা—দোকান-পাঠ করার বাসনা সবই অর্থহীন। কেউ কারোর পাশে এসে দাঁড়ায় না। বরং আর্থিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেকে স্বামী কিংবা বাবাহীন স্ত্রী বা মেয়ের ওপর থাবা বসায়। এমন কী নিরুপায় বাবা পাড়ার ছেলেদের হাত থেকে মেয়েকে বাঁচাতে বিয়ের নামে বেঁচে দিতে চায়। নিমাইদা ওরফে দিদির প্রেমিকের থেকে জানা যায়—'পাত্র না ছাই। বিয়ে না হগিরার ডিম। ওদের আমি চিনি। মেয়েছেলের টাউট। তোর বাবা বেঁচে দেবে বলে ওদের ধরে এনেছে।'[14] দিদির বিয়ে হয়নি। কিন্তু সে গর্ভবতী। কলঙ্কের দায় থেকে বাঁচতে ব্লেড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কিন্তু নিয়তি খেলায় সে বেঁচে যায়। বাঁচে আছে ভাবলে তার গলা শুকিয়ে যায়, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। তবুও কিছু করার থাকে না। দারিদ্র নামক অভিশাপের বোঝা নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাক্ষী ডুমুর গাছ' গল্পে নিঃসঙ্গতা ও অমানবিকতার অস্তি-কঙ্কাল হয়ে উঠেছে নাগরিক জীবন। দিল্লি কমিশারিয়েট ক্লার্ক আত্মসচেতন বাঙালীবাবু ফ্ল্যাটে বসবাস করেও যৌবন ও স্বাস্থ্য সচেতন ছিল। তার ধারণা ছিল টাকাই সব। টাকাই একদিন তাদের দেখবে। তাই সে আত্মীয়-পরিজনের আপদে-বিপদে না দাঁড়িয়ে নিজের পরিবার ও ছেলে-মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে। যথারীতি তার দুই ছেলে দেবেশ ও খগেশ পড়াশুনা করে বিলেতে চাকরী করে এবং সেখানে সেটেল্ট করে নয়। লতিকার বিয়ে দেয় হাওড়ায়। রিটায়েটের পর কলকাতায় বাড়ি বানিয়ে বসবাস শুরু করে। ফলে, বাড়িতে তারা বলতে শুধু স্বামী-

স্ত্রী। স্ত্রী বেঁচে থাকা পর্যন্ত সবই ঠিকই ছিল। কিন্তু স্ত্রীর মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে কমিশারিয়েট ক্লার্ক বাঙালীবাবু নিঃসঙ্গ ও একা হয়ে যায়। তাকে দেখার কেউ নেই। ছেলেরা তাকে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পাঠিয়ে দেয় ডবল পাউন্ড। কিন্তু ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তোলার শারীরিক অবস্থাও তার নেই। মশারি খাটানো, দরজা দেবার তার কেউ নেই। খাওয়া-দাওয়া নির্ভর করে অন্যের অনুগ্রহের ওপর— 'করি আর কোথায়! নীচের চা-দোকানে একটা ছেলে এসে ভাত ডাল ফুটিয়ে দেয়। দু-একদিন মাছ রাঁধে—'[১৫] শেষে গল্প কথক লতিকাকে চিঠি লেখে। লতিকা তথা লতুদি ছিল গল্প কথকের প্রথম স্বপ্নের সুগন্ধী রমণী। গল্প কথক সম্পর্কে মাসিতো ভাইয়ের চিঠি পেয়ে লতিকা বাপকে নিজের বাড়ি নিয়ে আসে। কিন্তু কর্তব্য কিংবা পিতাকে সেবা করার জন্য নয়— ব্যাঙ্ক, ব্যালেন্স ও কলকাতার পুরো সম্পত্তি হাতিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে। লতিকা বাবাকে বোঝায়—'তারা তোমার এই তিন পয়সা নিতে এদেশে আসবে না।'[১৬] কিন্তু পিতা হিসাবে সে তিন ছেলে মেয়ের মধ্যে সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চায়। বুড়ো মানুষের কথার কোন মূল্য নেই। নেই ভালো-মন্দের প্রশ্ন। মেয়ের দেওয়া চাপ ও আচার-ব্যবহারে বৃদ্ধ পিতার মনে হয়েছে এই পৃথিবী এক মায়ার খেলামাত্র কেউ কার নয়। 'এইসব ঢেকে দেবার জন্যে শিশু মহান হাসি দিয়ে মায়ার বাঁধে। সেই মায়ার বশে আমরা পৃথিবীতে ঘরবাড়ি বানাই, টাকা জমাই—বুঝলে। নয়তো আমরা কেউ কারো নই। কারোর নই। আমিও আলাদা। তুমিও আলাদা বাবা—'[১৭] জীবনের মায়াকে কবর দিয়ে লতিকা ও তার স্বামী বাবাকে তুলে দেয় কালকা মেলে। অথচ তারাই ভালো মানুষের মুখোশ পড়ে কালকা মেল থেকে বাপের নিরুদ্দেশের বিজ্ঞপ্তি দেয়। নাগরিক জীবনে উচ্চাশয় ও কর্তব্য পালনের দায়বদ্ধতা থেকে মানুষের জীবনে কীভাবে নেমে আসে নিঃসঙ্গতা ও যন্ত্রণা কমিশারিরেট। বৃদ্ধ পিতা মাতা সংসারের বোঝা। সেখানে মানবিকতা প্রশ্নাতীত, বিবেক কালো কাপড়ে মোড়া।

দিব্যেন্দু পালিতের 'মুন্নির সঙ্গে কিছুক্ষণ' কর্মব্যস্ত জীবন হাফ ছেড়ে বাঁচতে একটু ভালোবাসা চায়, চায় রোমান্টিক মুহূর্তের একটু সময়। কিন্তু নাগরিক জট-জটিলতায় সংসারের উদ্যানে তিক্ততার বিষ ছড়ানো। ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ব সেখানে বিপন্ন। আলোচ্য গল্পে লাট্টুদা ব্যাঙ্ক ম্যানেজার। স্ত্রী কৃষ্ণা। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক। 'তুমি' থেকে 'আপনিতে' এসে দাঁড়িয়েছে। দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্কে এসেছে ভাঁটার

টান। জীবনের মূল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সরে যায় লাট্টু। নিজের অস্তিত্বের সন্ধানে লাট্টু চলেছে মদের দোকানে। হঠাৎ ভিরের মধ্যে মুন্নির সঙ্গে দেখা। ম্যাটিনি শোয় দেখতে আসা মুন্নিকে। অনেকক্ষণ আটকে রাখে লাট্টুদা। 'অনেকক্ষণ আটকে রাখব। তোমার কি খারাপ লাগছে।'[১৮] ভুলে থাকতে চায় কৃষ্ণাকে, সংসারকে। সহজ-সরল একটি মেয়েকে পেয়ে তার অন্তরের অনুভূতি, ভালোবাসা, রোমান্টিকতা এবং অস্তিত্বের নার্ভগুলি সতেজ হয়ে উঠে। চেপে ধরে মুন্নির ফর্সা নরম হাত। মুন্নির কানে ফিসফিস করে বলে—'তোমাকে আমার খুব ভালো লাগছে এখন। একটা চুমু খেতে দেবে?'[১৯] ঠোঁট কেঁপে উঠলেও মুন্নি পর্দা সরিয়ে কেবিনের বাইরে উঁকি মেরে দেখে নেন। জানায়—এই দোকানে নয়, ট্যাক্সিতে খেতে পারো। এব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা না থাকলে সে জানে তার বান্ধবি ও তার বয়ফ্রেন্ড ট্যাক্সিতে চুমু খায়। নাগরিক জট-জটিলতায় মুন্নির অন্তরে দেখা দেয় দ্বন্দ্ব। গোপন রাখতে চায় চুমু খাওয়ার কথা। কিন্তু চুমু খেয়ে ভয় দেখানো নয়, মুন্নির সহন-সরল ও নিস্পাপ জগৎকে দুহাত দিয়ে আগলে রাখতে চায় লাট্টুদা। রোজ এমন দেখা হোক, খুশি আনন্দ ও নিজে ভালোবাসাগুলির ভাবনায় ভর করে উড়ে যেতে ইচ্ছে করে সংসারের জটিল দ্বন্দ্ব থেকে— এই কল্পনার কোন বাস্তবতা নেই। দ্বন্দ্বহীন, সহজ-সরল জগৎ থেকে পুনরায় ফিরতে হবে সংসারে। বেঁচে থাকবে সংঘাত, দূরত্ব, শূন্য, মরুভূমি যেখানে নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন।

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাদা অ্যাম্বুলেন্স' গল্পটি সুবিধাবাদী ও মেকি মানবিকতার বিরুদ্ধে নিম্ন শ্রেণির মানুষের জাগরণ। কলকাতার আকাশে চাঁদ উঠে। নিরিবিলি লোকের ধারে কবিতার নাম সুর ভেসে উঠে যুবক-যুবতির কণ্ঠে। ঝলকের মতো প্রতিবিম্ব হয়— জীবন কত মধুর। অন্যদিকে পথচারী মানুষ কেউ খলা ফুটপাতে ঘুমিয়ে পড়ে, কেউ নিরাপদ আশ্রয় খোঁজে। সাম্য অধিকার আইন শাসক শ্রেণির দাপটে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। বিচারক ছোটবাবু বাপের আমল থেকে তাদের বাড়িতে কাজ করে আসা সুবলকে আটকাতে পারে না। ছোটমার দাপটে বসন্ত রোগাক্রান্ত সুবলকে রাস্তায় নিম গাছের নীচে আশ্রয় নিতে হয়। স্ত্রী ও পুত্রকে হারিয়ে বড়ো কর্তা যাবার সময় এই বাড়িতে এক কাপড়ে উঠেছিল সুবল। ছোটবাবুর দুই মেয়ে লিলি ও মিলিকে কোলে পিঠে মানুষ করেছে সে। লিলি দিদিমণি কুকুর পোষে। কুকুরের নাম করে মাঝে মাঝে দরজা খোলা রাখে।

'দিদিমণি দরজা খুলে শোয়, আমার শুতে ভয় করে।'[২০] মিলিও লিলি দিদিমণি সম্পর্কে তারও অশ্লীল চিন্তা মাথায় আসে। বয়স্ক মানুষ সুবল নিজেকে সামলে নেয়। বাড়িতে দুইবেলা মুরগির মাংস চাই-সুবল জোগান দেয়। অথচ সুবল বসন্ত আক্রান্ত হতেই সমস্ত সম্পর্ক চুকে যায়। 'সুবল বুঝতে পারল, ছোটমা সাহস পাচ্ছেন না। সে বলল, ঠিক আছে মা। আমি রাস্তায় গিয়ে নিমগাছটার নীচে গিয়ে শুয়ে থাকব। — সেই ভালো।'[২১] সুবল নিমগাছের নীচে ছায়ায় মাদুর বিছায়। যমের মতো রাস্তার দুই বালক ওর মাথার পাশে দাঁড়ায়। ফুটপাতের এই ছেলেরা সুবলকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। যাদের খাওয়া জোটে তিনতলা থেকে ফেলে দেওয়া বাসি ভাত নয়তো রুটি থেকে। সাদা অ্যাম্বুলেন্সটা সুবলকে তুলে নিয়ে যায়। কিন্তু রাত দশটা না বাজতেই রেখ যায় নিমতলায়। পোস্টার পড়া পড়া খেলার সূত্রে ধরে একটি পোস্ট মাস্টারের মানে খুঁজে পায় না ছেলে দুটো। পোস্টমাস্টারের অর্থ উদ্ধারে তারা সুবলকে নিয়ে যায়। রাতে তারা তিনজন পোস্টার লিখে বেড়ায়। 'বড় মাঠে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। যে যার মতো চাষবাস করতে লেগে যাও। সবুজ চারায় ছেয়ে যাবে। ফুল ফুটবে, ফল হবে। দিনমানে পৃথিবীর জায়গা বদল করে নাও।'[২২] সাময়িক ভাবে একটা বিপ্লব দেখা যায়। নিম্নশ্রেণি মানুষ গর্জে উঠে। স্বার্থপর মানুষ হরিণের মতো পালায় বাঘের থাবা থেকে। কিন্তু নিয়ম মাফিক লঙ্কায় যে যায় সেই রাবণ হয়। সূর্য পূর্ব দিকে উঠে পশ্চিমে অস্ত যায়। নিম্নশ্রেণি উচ্চশ্রেণী মানুষের করুণার পাত্র হয়ে যায়।

অভিজিৎ সেনের 'আমার জন্য কেউ কাঁদুক' গল্পে দেখানো হয়েছে নাগরিক জীবনে মানুষের জীবিকার একটি অন্যতম হল চাকরী। উচ্চাশা ও চাকরী সূত্রে বিদেশ যাত্রা করে। ফলে, পিতা-মাতা থেকে সন্তানের বিচ্ছেদ ঘটে। সন্তান বিচ্ছেদে বৃদ্ধ বাবা-মা-এর জীবনে নেমে আসে নিঃসঙ্গতা। বিচ্ছেদ বেদনায় অনেক বাবা-মা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। হারিয়ে ফেলে ভালোলাগার ও বেঁচে থাকার ইচ্ছাগুলিকে। কলকাতা সংলগ্ন শহরতলিতে বসবাসকারী যতীন ও প্রিয়বালা এমনই এক বাবা-মা। যারা এক সময় আত্মীয়-স্বজনের বিপদ-আপদে পাশে না থেকে পরিবারের উন্নতি এবং ছেলে মেয়ে ক্যারিয়ার নিয়ে ব্যস্ত ছিল। কিন্তু নিয়তির পরিহাস দুটি সন্তানের মধ্যে প্রথম জয়ন্ত বিমান বাহিনীর চাকরী নিয়ে পাকিস্তান যুদ্ধে মারা যায়। দ্বিতীয় মীরা ও তার ডাক্তার স্বামী আরবের কোন ধনী দেশে চাকরী

করে। তাদের দুই ছেলে বিলেতে পড়ে। যতীন ও প্রিয়বালাকে দেখার কেউ নেই। মীরা মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবারে ফোন করে। বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য শিথিল হয়ে গেছে। বেশি ফোন করলে মীরা বিরক্ত বোধ করে। অথচ টেলিফোন যন্ত্রটা যতীনের হৃৎপিণ্ড। মা প্রিয়বালা ছেলের মৃত্যুর পর থেকে পাগল। টেলিফোন যন্ত্রটা যতীনের অস্তিত্ব। মীরা সঙ্গে সংযোগ সূত্র। যন্ত্রের রিং, দূরত্ব-ব্যবধান ঘুচিয়ে সন্তানের সান্নিধ্য পেতে চায় পিতা যতীন। তাই দীর্ঘ ত্রিশ বাছর পর ভাগ্নী বেলার কান্নায় যতীন নিজের অস্তিত্ব খুঁজে পায়। উপলব্ধি করে—'বেলা আবার ফুঁপিয়ে উঠল। যতীন রায় মীরার টেলিফোনের জন্য আর আগ্রহ বোধ করছিলেন না। বরং চাচ্ছিলেন, আজ যেন সে ফোন না করে।'[২৩]

কিন্নর রায়ের 'প্রহেলিকা সিরিজ' গল্পে মালিক ও শ্রমিক সম্পর্কের কীভাবে ঘুণ ধরেছে তা তুলে ধরেছেন গল্পকার। কর্মচারীকে হেনস্তা করতে মালিক নানা ফন্দি-ফোকর করে বসে। অথচ কর্মচারীদের কম বেতন। বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কেনার সামর্থ তাদের নেই। 'তারা মাল অনেকক্ষণ দেখে। ঘোরে। দর করে। দশ পয়সা, কুড়ি পয়সা, এক টাকা, দু'টাকা নিয়ে মাথা ঘামায়।'[২৪] এমন একজন মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধি সাহা বুক ডিপোর প্রোডাকশন ম্যানেজার দিবাকর বাগচি। মাস মাইনে ষোলশ টাকা। ইনকাম কম হওয়ায় তার বিয়ে করা হয় না। অজিত মান্নার কাছ থেকে চারশো টাকা ধার নিয়ে পনের দিন পার হয়ে গেলেও শোধ দিতে পারে না। তবুও মালিক সাগর সাহা নিজ লাভ-ক্ষতির হিসাবে ব্যস্ত। সাগর সাহার পিতা যোগেশ বাবুর সময় কোম্পানির কর্মচারীদের জন্য দ'বেলা চায়ের বন্দোবস্ত ছিল। সাগর এক বেলা বন্ধ করে দিয়েছে। সে কোম্পানির শ্রমিকদের খালি করতে ব্যস্ত। সাগরবাবু মহামায়া বাইন্ডার্স এর হিসাবে বিল চুরি করে দিবাকরকে অপদাস্ত করতে দ্বিধাবোধ করে না। সর্বোপরি বিশ্বায়ন ও বাণিজ্যায়নের ফলে সাগর সাহা কর্মচারী বিদায় করে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। শ্রমিকদের কী হবে সেটা ভাবার সময় নেই সাগর বাবুর মতো বুর্জোয়া মালিকদের। তাদের কাছে মানবিকতা একটা শব্দমাত্র; নিজেদের স্বার্থ ছাড়া তারা অন্য কিছু বোঝে না।

আধুনিক নাগরিক সভ্যতা দ্রুতগতিতে যেমন গ্রামকে গ্রাস করেছে তেমনই জীবন-যাপন, চলন-বলন, মনন-মানসিকতায়, সংস্কার ও রুচিবোধে বিস্তর পরিবর্তন ও অনুকরণ ঘটেছে। ন্যায়-নীতি, সাম্য-কল্যাণ, বিবেক ও মানবিকতাকে ভুলে মানুষ আপন স্বার্থসিদ্ধিতে হস্তসিদ্ধ হয়ে উঠেছে। ফলে, নাগরিক জীবনে মানুষের আত্মীয়-বন্ধনের সম্পর্কগুলি শিথিল হয়েছে। মানুষ ক্রমশ বিচ্ছিন্ন, হতাশ ও একাকী হয়ে পড়েছে। কার কাছে অর্থ থাকলেও মানুষ নেই; আবার কারও অর্থ সংকটে বেঁচে থাকার রঙিন স্বপ্ন ধূসর হয়েছে। সুখ-সুবিধার প্রত্যাশায় গ্রাম ছেড়ে অসংখ্য মানুষ নগরমুখী হলেও প্রকৃত প্রত্যাশা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। বিশ্বায়ন, বাণিজ্যায়ন, প্রযুক্তি ও মানুষের অত্যাধিক চাপে-তাপে মহানগর কলকাতার মতো শহর ও শহরতলী হয়ে উঠেছে প্রতিযোগিতার ম্যারাথন দৌড়। আর সেই প্রতিযোগিতার যাঁতা-কলে মানুষের জীবন জর্জরিত।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১. ড. নির্মল দাশ, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ১৩৭

২. সত্যেন্দ্রনাথ রায়, 'বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা', দে'জ, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৫

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'গল্পগুচ্ছ', বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪১৫, পৃ. ১৪৬

৪. তদেব, পৃ. ১৪৭

৫. তদেব, পৃ. ২৫৩

৬. তদেব, পৃ. ২৫৩

৭. বুদ্ধদেব বসু, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ১৫

৮. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'সময়', দেশ, ১৯৬৩, পৃ. ৮৩৭

৯. তদেব, পৃ. ৮৩৯

১০. সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'জায়গা', রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, কার্তিক, ১৯৬৩, পৃ. ১০

১১. তদেব, পৃ. ১১

১২. ড. নিতাই বসু(সম্পা.) 'জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প', দে'জ, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ১৭৯

১৩. তদেব,

১৪. সন্তোষ কুমার ঘোষ, 'গল্পসমগ্র-১', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪, পৃ. ৪৭০

১৫. শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৫৬

১৬. তদেব, পৃ. ৫৮

১৭. তদেব, পৃ. ৫৯

১৮. দিব্যেন্দু পালিত, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ৩৭

১৯. তদেব, পৃ. ৪০

২০. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃ. ৪৪

২১. তদেব, পৃ. ৫০

২২. তদেব, পৃ. ৫৬

২৩. অভিজিৎ সেন, 'শ্রেষ্ঠ গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৫, পৃ. ২০৬

২৪. কিন্নর রায়, 'সেরা ৫০টি গল্প', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১২০

চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবীর পালাগান

মানিক পাল
সহকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
শীতলকুচি কলেজ, কোচবিহার

সংক্ষিপ্তসার

পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলাটি ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে অন্য অঞ্চলের থেকে স্বতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেছে যার মধ্যে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে। বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতির মিশ্রণের ফলে লোকায়ত পালা গানের উদ্ভব ও বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় ক্ষেত্র হল চব্বিশ পরগনা। এই অঞ্চলের জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ও তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, কৃষক, কৃষক মজুর এছাড়াও আরো অন্যান্য সম্প্রদায়গত লোক রয়েছে। লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভাবধারা, মূল্য বোধ, আচার আচরণ, জীবন যাত্রা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। লোকসাহিত্য, লোক শিল্প, লোকচিত্রকলা, লোকবিশ্বাস, লোকপ্রযুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে এইসবের বাহন। এখানকার বিস্তৃত অঞ্চলে লোকসমাজে ছড়িয়ে আছে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গাঁথা , গীতিকা, লোককথা, লৌকিক দেব-দেবী প্রভৃতির বিচিত্র সম্ভার । লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাস কারী মানুষ, তাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত আচার আচরণ, পোশাক পরিচ্ছদ, ভাষা, শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, বিশ্বাস বা সংস্কার এবং লৌকিক দেবদেবী সমন্বিত গোষ্ঠী জীবনের ছবি পরিস্ফুট হয়। এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগান গুলির মধ্যে অন্যতম হল দেবীপালা। চব্বিশ পরগনা অঞ্চলের লৌকিক ইতিহাস সঠিক ভাবে অনুধাবন দেবীপালার আলোচনা ছাড়া অসম্পূর্ণ।

সূচক শব্দ : চব্বিশ পরগণা জেলা, লৌকিক সংস্কৃতি, লোককথা, পালা গান, দেবীপালা, করতাল, কাড়া, নাকাড়া বিশালাক্ষী, নারায়নী।

বিশ্লেষণ-অন্বেষণ

লোক (Folk) বলতে একটি লোক নয়, বৃহত্তর লোকসমাজ, গোষ্ঠীভুক্ত সমাজ, গ্রামীণ সমাজ, গ্রামীণ ঐতিহ্যনুসারে কৃষিভিত্তিক সমাজ কে বোঝানো হয়। Folk শব্দের অর্থ হলো common people অথবা লোর শব্দের অর্থ হলো knowledge বা জ্ঞান। যে সমস্ত কর্ম ক্রিয়া মধ্যে দিয়ে পরিবার ও সমাজবদ্ধ মানুষের সার্বিক উন্নয়ন ও পরিবেশিক বিকাশ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে লোকজ জীবনের স্বার্থে বিকশিত হয় তাই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতিবিদ ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী স্মরণ করিয়ে দেন, যে সংস্কৃতি লোকেদের জন্য, লোকেদের দ্বারা, লোকেদের নিয়ে সৃষ্ট তাই লোকসংস্কৃতি। লোকসংস্কৃতির বাহক সমাজের খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ। লোক, জীব, ভাষা ও ক্রিয়া এই চারটি লোকসংস্কৃতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জগতে মানুষের একমাত্র প্রাণী যার নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে। এই সংস্কৃতির দৌলতেই মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতিই মানুষকে বিবর্তনের পথ দেখিয়ে সভ্যতার শিখরে উত্তরণ ঘটায় আবার সংস্কৃতিকে ভিত্তি করেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ এই আদিকথা ও লোকসংস্কৃতির চর্চাকেই বলেছিলেন জ্ঞানের আদিনিকেতন চর্চা। সময়ের বিবর্তনে বিচিত্র সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠে বিশেষ অঞ্চলের বা স্থানের সভ্যতা ও কৃষ্টির ঐতিহ্য। এই ধরনের সংস্কৃতি লিখিত বা মুদ্রিত রূপে সম্প্রচালিত হয় না, প্রবাহিত হয় মুখে মুখে। লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে কোনো বিশেষ জনগোষ্ঠীর ভাবধারা, মূল্যবোধ, আচার-আচরণ, জীবন-যাত্রা ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে। লোকসাহিত্য, লোক-শিল্প, লোক-চিত্রকলা, লোকবিশ্বাস এবং লোকপ্রযুক্তি ইত্যাদি হচ্ছে লোকসংস্কৃতির শাখা-প্রশাখা। লোকসংস্কৃতি লোকজ্ঞানের আধার, শুভবোধ ও মঙ্গলচেতনার ধারক। লোকসংস্কৃতি লালন করে সৃজন কুশলতা দেয় সৃজনের আনন্দ।

বাংলা লোকসংস্কৃতি চর্চার ইতিহাস খুব একটা প্রাচীন নয়। বস্তুত লোকসংস্কৃতি বিদ্যা বিষয়টি অর্বাচীনকালের। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ডে এথেনিয়াম পত্রিকায় ইংরেজ সমাজবিজ্ঞানী উইলিয়াম জন থম্‌স প্রথম ফোকলোর শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। সে ইতিহাস আজ সকলেরই জানা। পরবর্তীকালে বহু তর্ক-বিতর্ক, ওজর-আপত্তি শর্তেও আমাদের দেশে ফোকলোর শব্দের প্রতিশব্দ রূপে

লোকসংস্কৃতি শব্দটিই বহুল ব্যবহারের সূত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ১৯৯০ সালে পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে কল্যাণীতে ফোকলোরচর্চার কেন্দ্রটির নাম দেওয়া হয় লোকসংস্কৃতি বিভাগ(Department of Folklore)। লোকসংস্কৃতি চর্চার প্রাথমিক পর্বে মূলত ব্যক্তিগত প্রয়াসেই লোকসংস্কৃতির চর্চা তথা তথ্য সংগ্রহ শুরু হয়েছিল। দি জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি, বেঙ্গল গেজেট, ইন্ডিয়া গেজেট সহ অসংখ্য পত্রপত্রিকা ও জার্নালে লোকসংস্কৃতি বিষয়ক অসংখ্য লেখা প্রকাশিত হতে থাকে। পরবর্তী পর্বে দেশীয় পন্ডিতদের নেতৃত্বে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ ও দীনেশচন্দ্র সেন ছাড়াও অসংখ্য পণ্ডিতের একক প্রয়াসে জাতীয় উদ্যোগে এই পর্ব সমৃদ্ধ। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে দেশীয় মানুষের মনে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও পরম্পরার প্রতি আগ্রহ তৈরি হয়। ধীরে ধীরে সমগ্র জাতি জেগে ওঠে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূত্র ধরেই।

লোকসংস্কৃতির মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসকারী মানুষ, তাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত আচার-আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, সংগীত, বিশ্বাস ও সংস্কার এবং লৌকিক দেবদেবী সমন্বিত গোষ্ঠী জীবনের ছবি পরিস্ফুট হয়। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং জনজাতির জীবনধারার প্রবাহের পটভূমিকায় গড়ে ওঠে একটি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল। সমাজ ও সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের মাধ্যমে অঞ্চল বিশেষে গড়ে ওঠে Culture Complex তথা জনজীবনাশ্রিত লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির বিচিত্র ধারায়। পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে নানা প্রকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠেছে যার মধ্যে চব্বিশ পরগনা অঞ্চলটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দাবি রাখে।

চব্বিশ পরগনা জেলাটি নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তে গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ অঞ্চলের অন্তর্গত। 'ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে এই জেলাটি ৮৮ ডিগ্রি পূর্ব থেকে ৮৯ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমা এবং ২১ ডিগ্রি ৩০' থেকে ২৩ ডিগ্রি উত্তর অক্ষরেখার মধ্যে অবস্থিত। প্রশাসনিক কারণে জেলাটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে জেলাটি উত্তরচব্বিশ পরগনা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা এই দুই ভাগে বিভক্ত। উত্তর চব্বিশ পরগনা অপেক্ষা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা আয়তনে বড়। অখন্ড জেলাটির দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পশ্চিমে হুগলি নদী, উত্তরে নদীয়া জেলা ও পূর্বে বাংলাদেশের

খুলনা জেলা অবস্থিত।'[১] জেলা চব্বিশ পরগনার জন্ম ১৭৫৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর। 'এই ২৪টি পরগনার নাম হলো ১. আমিরপুর ২. আকবরপুর ৩. আজিমাবাদ ৪. বালিয়া ৫. বারিদহাটি ৬. বাসন ধাওর ৭. কলকাতা ৮. দক্ষিণ সাগর ৯. গড় ১০. হাতিয়াগড় ১১. ইখতিয়ারপুর ১২. খারিজুড়ি ১৩. খাসপুর ১৪. ময়দান মল ১৫. মাগুরা ১৬. মানজুড়ি ১৭. ময়দা ১৮. মুড়াগাছা ১৯. পাইকান ২০. পেচাকুলি ২১. সাতাল ২২. সাহানগর ২৩. সাহাপুর ২৪. উত্তর পরগণা । ২৪টি পরগনার ভূখণ্ডের আয়তন ছিল ৮৮২ বর্গমাইল।'[২] ১৯৯১ খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী জেলা চব্বিশ পরগনার আয়তন ১৪০৫৩.৭৩ বর্গ কিলোমিটার, জনসংখ্যা ১,২৯,৯৬,৯১১ 'এই জনসংখ্যার মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন প্রভৃতি ধর্মাবলম্বী ও তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, কৃষক, কৃষক মজুর এছাড়াও আরো অন্যান্য সম্প্রদায় রয়েছে এখানে শিক্ষিত বা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা ৬৬৭৯৪৩০।'[৩] ভূতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতির আলোকে এই তথ্য ও সত্য উদ্‌ঘাটিত হয় যে চব্বিশপরগনার ইতিহাসের সীমারেখা প্রাগৈতিহাসিক যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিম্নবঙ্গের দক্ষিণ প্রান্তসহ ২৪ পরগনার লোকসংস্কৃতি লোকসাহিত্য বাংলার বিশিষ্ট সম্পদ। এখানকার বিস্তৃত অঞ্চলে লোকসমাজে ছড়িয়ে আছে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গাঁথা, গীতিকা, লোককথা লৌকিক দেব-দেবী প্রভৃতির বিচিত্র সম্ভার। চব্বিশ পরগনা তথা দক্ষিণবঙ্গে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশিষ্ট প্রকাশ ঘটেছে এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবীর পূজাচার সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস সংস্কার এবং আখ্যানমূলক পালাগানের সুবিপুল ঐতিহ্যে। চব্বিশ পরগনার লোকায়ত পালাগানের পর্যালোচনার প্রারম্ভে বাংলা সাহিত্যে আখ্যান কাব্যের রূপ ও প্রকৃতি বিশেষভাবে অনুধাবন করা প্রয়োজন। আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্য পাশ্চাত্য দেশে যা Ballad এবং Folk Narrative Song হিসাবে কথিত হয় বাংলা ভাষায় তা যথাক্রমে গীতিকা বা পালাগান হিসেবে উক্ত হয়। লৌকিক ধর্মশ্রীত আখ্যান কাব্যের একটি অভিজাত রূপ মঙ্গল কাব্য এবং আরেকটি লৌকিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ রূপ 'লোকায়ত পালাগান।' বাংলা আখ্যানমূলক গীতিসাহিত্যের ধারায় যেমন মৈমনসিংহগীতিকা এবং নাথগীতিকা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে, তেমনি বাংলা পালাগানের বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লৌকিক বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ লোকায়ত পালা গানসমূহ।

লোকায়ত পালাগানের উদ্ভব ও বিকাশের একটি অন্যতম প্রধান আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যময় ক্ষেত্র হল চব্বিশ পরগনা। আদিম ও লোকলোকায়ত ঐতিহ্য সমৃদ্ধ এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী এবং বিবি ও পীর গাজী বিষয়ক পালাগানগুলির একদিকে যেমন চব্বিশ পরগনার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয়ে মূল্যবান তথ্য নিহিত আছে, তেমনই আছে তার সাহিত্যিরসগত আবেদন- বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতির ইতিহাসে যার মূল্য অপরিসীম। চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার মূলক লোকায়ত পালাগানগুলি মূলত পাঁচালীপালার ধারা এবং কেচ্ছাকাহিনীর ধারা এই দুটি ভাগে বিভক্ত। পাঁচালীপালার ধারাটি মূলত হিন্দু ধর্মাশ্রয়ী লৌকিক দেবদেবী অবলম্বনে রচিত ও পরিবেশিত হয় এবং কেচ্ছাকাহিনীর ধারা প্রধানত পীর-গাজী ও বিবি মাহাত্ম্যের ইসলামী ধারাকে অবলম্বন করে প্রচারিত হয়। ইসলামিক কেচ্ছা কাহিনীর ধারাকে অনেকে পিরুলী গান বলেন। পালাগানগুলি সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর পূজানুষ্ঠান বা উৎসব উপলক্ষে লোকসমাজে পাঁচাল ও লোকনাট্যের ধারায় পরিবেশিত হয়। বিচিত্র উপাদানের সমৃদ্ধ এইসব লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করে যেসব লোক উৎসব ও পার্বণ অনুষ্ঠিত হয় তার একটি প্রধান অঙ্গ প্রমোদমূলক পালাগান বা লোকায়ত পালাভিনয়ের অনুষ্ঠান। এই পালাগানগুলি লোক প্রচলিত কাহিনী অবলম্বনে স্থানীয় কবিগণ রচনা করেন। কাহিনী, ছড়া, ছড়া জাতীয় সংলাপ, উক্তি, প্রত্যুক্তি, বর্ণনা, নৃত্য, গীত, হাস্যকৌতুক প্রভৃতির মাধ্যমে জনসমক্ষে পালাগানগুলি উপস্থাপিত হয়। সাধারণত মৌখিকভাবে পালাগানগুলি পরিবেশিত হয়। বর্তমানে অনেক ক্ষেত্রে পালাগানের লিখিত খাতা দেখা যায়। খাতা থাকলেও আসরে মূলত স্মৃতি নির্ভর মূল কাহিনীর কাঠামো অবলম্বনে ও উপস্থিত মত সংলাপ, গীত, নৃত্যাদি পরিবেশিত হয়। মূল গায়ক-বাদকগণ, দোহার প্রমূখ সকলের সক্রিয় প্রচেষ্টায় হারমোনিয়াম, করতাল, কাড়া, নাকাড়া, খোল, ঝাঁঝর প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে সমষ্টিগতভাবে পালা-আসরে গীত হয়। এই অঞ্চলের লৌকিক দেবদেবী নির্ভর লোকায়ত পালাগানগুলিকে— ১. দেবীপালা, ২. দেবপালা, ৩. বিবি পালা, ৪. পীর ও গাজীপালা এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।

দেবীপালা গড়ে উঠেছে লৌকিক হিন্দু দেবীকে কেন্দ্র করে। নারী দেবতার অবলম্বন করে রচিত পালাগানগুলিকে দেবীপালা বলা হয়। চব্বিশ পরগনায়

প্রচলিত লৌকিক দেবীপালাগুলি হল— শীতলা, মনসা, ষষ্ঠী, চন্ডী, লক্ষ্মী, দুর্গা(শঙ্খ পরিধান), বিশালাক্ষী, নারায়ণী, সন্তোষী মা। এই পালাগুলির আবার একাধিক শাখা কাহিনী প্রত্যক্ষ করা যায়। যেমন, শীতলা পালার শাখা পালাগুলি হল চন্দ্রকেতুর পালা, বিরাট রাজার পালা, রাবণ রাজার পালা। লক্ষীপালার শাখা পালাগুলি হল ভাঁটুই ঠাকুর, বিনন্দ রাখাল, বল্লভ দত্ত ও সনাতন, বলাই সদাগর, লক্ষ্মীনারায়ণ(দ্বারকা পালা)। বিশালাক্ষীর শাখা পালা হল সিদ্ধেশ্বর ও অনন্তদেব পালা। চব্বিশ পরগণার দেবীপালাগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আলোচনা করা যাক—

দেবী শীতলাকেন্দ্রিক পালাগান

চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানের বিশিষ্ট দেবী হলেন দেবী শীতলা। লোকসমাজের বিশ্বাস দেবী শীতলা বসন্ত ও কলেরা রোগের দেবী। এছাড়া কামলা, গলগন্ড, কোরণ্ড, সান্নিপাত, পীলে, ফোড়া, বাত উদরী প্রভৃতি ৬৪ টি ব্যাধি তার আজ্ঞাবহ। এই সমস্ত মারাত্মক রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে এই অঞ্চলের মানুষ দেবী শীতলাকে রোগ প্রতিকারিণী শক্তিরূপে পূজা করেন। 'চব্বিশ পরগনায় শীতলার পাথরের নুড়ি ও মৃৎ মূর্তি এই দুই প্রকার পূজারই প্রচলন আছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে আর্যেতর সমাজ থেকে দেবীর আর্যীকরণ করা হয়েছে।[4] বিক্রমপুরে প্রাপ্ত ও পর্নসভারির মূর্তির সাথে বসন্ত রোগ বসন্ত রোগ ও গাধার অস্তিত্ব থাকায় অনেকে পর্নসবরী ও শীতলা একেই বলে মন্তব্য করেছেন। 'পন্যসবরী হলেন বৌদ্ধতান্ত্রিক দেবী বৌদ্ধ হারিতির সাথে শীতলা দেবীর সাদৃশ্য আছে বলে কেউ কেউ মনে করেন।'[5] প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থগুলির মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরান,স্কন্দ পুরাণ ও পিচ্ছিলাতন্ত্র ও স্তবক বচমালায় দেবীর ধ্যান মন্ত্র আছে। যার সাথে ময়ূরভঞ্জে ধর্মের মন্দিরে খোদিত শীতলা মূর্তির সাদৃশ্য আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে উল্লিখিত জ্যেষ্ঠা দেবীর মাহাত্ম্যে দেবীকে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী অলক্ষী বলা হয়েছে এবং তার অস্ত্র ঝাঁটা ও বাহন গাধা। চব্বিশ পরগনার লোকসমাজে বসন্ত রোগের সাথে শীতলা নামটি বিশেষভাবে জড়িত। ফলে বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ও শীতলাকে নিয়ে নানা আচার-আচরণ ও বিধি নিষেধ মেনে চলার প্রবণতা অদ্যাপী বিদ্যমান।বসন্ত রোগে আক্রান্ত পরিবারে মাছ, মাংস, মুসুর ডাল, পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি উত্তেজক সমস্ত খাবার নিষেধ থাকে ।এই সমস্ত আচার-

আচরণ পালনে বাড়ির মহিলাগণ বেশি তৎপর হয়। জেলা চব্বিশ পরগনায় দেবীর তিন ধরনের পূজা প্রচলিত আছে। প্রথমত নিত্য পূজা, দ্বিতীয়ত বাৎসরিক পূজা, তৃতীয়ত সাপ্তাহিক পূজা। শীতলা দেবীর পালাগানের আসর বসে গৃহে বা সাধারনী থানে। প্রায় সর্বত্রই শীতলা দেবীর পূজার পরে রাত্রে পালাগানের আসর বসে, ব্যতিক্রমও আছে কোন কোন স্থলে দেবীর মূর্তি পূজা হয় না কিন্তু পালাগানের আসর বসে। কোন নির্দিষ্ট বাধ্যবাধকতা মূলক নিয়ম নেই। দেবীর পূজা সাধারণত দুপুর বা বিকেলে হয়। তারপরে পালা গান শুরু হয় । দেবী শীতলার পালাগান শুরুর আগে শীতলার ঘট বসানো হয় তারপর পালা গান শুরু হয় মূল কাহিনীকে পালা গায়ক জাগরণ বলেন। শীতলার পালা গানের আসরে মূল গায়ক অনেক সময় শীতলা সাজে সুসজ্জিত হয়ে হাতে ঝাঁটা, কুলো ও কাঁখে কলসী নিয়ে গান করেন, যারা শীতলার সাজ সাজেন না তারা পুরুষ হলে ধুতি পাঞ্জাবী পড়েন, গায়ে ওড়না ফেলে হাতে চামর নিয়ে গান করেন। ৪-৫ ঘন্টার এই পালা গান দর্শক বা শ্রোতা হাসি, ঠাট্টা, অশ্রু বিসর্জন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপভোগ করেন। শীতলার পালাগানগুলি মূলত চারটি ধারায় পরিবেশিত হয় যথা পাঁচালী গান ও পাঠের ধারা, পালাগানের ধারা, গীতিনাট্যের ধারা, বাদ্যকে দোহার করে একক গানের ধারা। দেবী শীতলাকে নিয়ে যেসব পালা গান রচিত হয়েছে তাদের অধিকাংশের রচয়িতা বা কবি সুন্দরবন ঘেঁষা অঞ্চলের অধিবাসী। লৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার এর মূল ভিত্তি। মধ্যযুগের কবি কৃষ্ণরামদাস তার রায়মঙ্গল কাব্যের পরে 'শীতলা মঙ্গল' রচনা করেছিলেন। ক্ষেত্রানুসন্ধান কালে শীতলা দেবীর নিম্নলিখিত পালাগানগুলি সংগৃহীত হয়েছে— ১. রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্রপালা, ২. রাবণ রাজার কাহিনী, ৩. বিরাট রাজার কাহিনী, ৪. চন্দ্রকেতুর কাহিনী। 'পাঁচালী গান ও পাঠ' এই রীতিতে লোকশিল্পী গণ কৃষ্ণরাম দাসের লেখা মূল 'শীতলামঙ্গল' কাব্যের বিষয়টি রামায়ণ গানের ঢঙে গান করেন। এক রাতেই পালাটি শেষ হয়ে যায়। পাঁচালী গানের আসরে শ্রোতাদের নিকট হতে 'প্যালা'[6] তোলা হয়। দেবী শীতলাকে নিয়ে চব্বিশ পরগনায় যে সমস্ত পালা গান প্রচলিত আছে সেগুলি হল— ১. শ্রীশ্রী শীতলা মাহাত্ম্য (বিরাট রাজার পালা বা চন্দ্রকেতুর পালা)। এই পালা গানের গায়ক বারুইপুরের নিতাই ছাটুই, প্রবোধ ছাটুই। এই পালা গানের রচয়িতা বা পালাকার হলেন দ্বিজপদ মণ্ডল। গানের পালা গায়ক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মেকিমপুরের বসন্তকুমার গায়েন। এই পালা গানের রচয়িতা হলেন দ্বিজমাধব ও নিত্যানন্দ। ৩.

রাজা নহুষের কাহিনী বা ইন্দ্র পালা, এই পালা গানের পালা গায়ক হলেন সুদিন মণ্ডল ও অনিল হাজরা। এই পালা গানের রচয়িতা সুদিন মণ্ডল। ৪. রাবণ রাজার কাহিনী এই পালাগান বলরাম জানা। ৫. বিরাট রাজার কাহিনী, এই পালা গানের পালা গায়ক শশধর মহিষ, সুদিন মণ্ডল, অনিল হাজরা প্রমূখ। ৬. চন্দ্র কেতুর কাহিনী, এই পালা গানের পালা গায়ক সুদিন মণ্ডল এবং রচয়িতা দ্বিজপদ মণ্ডল। ৭. শীতলামঙ্গল (লোকনাট্যের ধারা), এর পালা গায়ক এবং রচয়িতা দীপক মণ্ডল(ধোপাগাছি)।

দেবী মনসাকেন্দ্রিক পালাগান

চব্বিশ পরগনার পালাগানগুলির মধ্যে মনসার পালা দেবী পালার অন্তর্গত। দেবী মনসার কাহিনীকে অবলম্বন করে পালাগান রচিত এবং পরিবেশিত হয়। লোক বিশ্বাসে মনসা হলেন সর্পের দেবী। সর্পভীতি থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য মনসা পূজার সৃষ্টি, এমন ধারণার বশবর্তী হয়ে লোকসমাজের সকল স্তরের মানুষ মনসা পূজা করেন না। তাদের অনেকের ধারণা নাগ বংশ রক্ষা করে। এছাড়া যে কোনো রোগপীড়ার কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, বিষয় সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য ও সংসারের যাবতীয় মঙ্গল কামনা করে মনসা পূজা বা নাগ পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সন্তান দাত্রী রূপেও নাগ পূজিত হয়। 'বাংলাদেশে অনেক স্থানে মনসার মূর্তিতেই ষষ্ঠী পূজা করা হয় । ষষ্ঠী ও মনসার নিকট সম্বন্ধ এখানে সূচিত হয়েছে।'[৭] চব্বিশ পরগনায় হংসবাহন মনসা মূর্তি কম দেখা যায়। মনসার চার হাত, ওপরে দুই হাতে থাকে শঙ্খ ও সর্প, নিজের এক হাতের পদ্ম ও এক হাতে বরাভয় মুদ্রা। মনসাকে সাধারণত সালঙ্কারা দেবী মূর্তি রূপেই প্রত্যক্ষ করা যায়। ২৪ পরগনায় মনসা পূজার দু'রকম রীতি প্রচলিত আছে একটি মনসা দেবীর মূর্তি পূজা, অপরটি নাগ পূজা। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস মনসা দেবী রাগী তাই এই পূজা দুপুর বারোটার পর থেকে পাঁচটার মধ্যেই করা হয়ে থাকে। শ্রাবণ মাসের মকর সংক্রান্তিতে সর্প বা মনসা পূজা ব্যাপকভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। পুজোর শেষে রাত্রে পালাগান শুরু হয়। পালাগায়ক পালাগান শুরুর আগে ঘটটি গোলার ধারে বা বাড়ির মধ্যে কোন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন স্থানে বসানো হয়। গায়ক এই ঘটকে বন্দনা করে তার গান শুরু করেন। বাংলা মঙ্গলকাব্য ধারায় মনসামঙ্গল কাব্য বহু আলোচিত।

মনসা লৌকিক দেবী রূপে স্বীকৃত। চব্বিশ পরগনায় মনসার যে পালাগান গীত হয় তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ক্ষেমানন্দের 'মনসার ভাসান' কাহিনী অবলম্বনে রচিত। মনসার পালা গানের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকে সেগুলি হল কাহিনী, চরিত্র, সংগীত, সংলাপ, দোহার, বাদ্য, মূল গায়কের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি, মূল গায়কের অভিনেতার ভূমিকা, গায়কের ভূমিকা ও কথকের ভূমিকা ইত্যাদি। এই পালা গানগুলি লোকসমাজে লোকনাট্যের ধারায় পরিবেশিত হয়। চব্বিশ পরগনায় মনসার পালা গান পরিবেশনার মূলত তিনটি ধারা প্রচলিত আছে যথা— পালাগানের ধারা, রয়ানী ধারা, লোকনাট্যের ধারা। রয়ানী ধারার আবার পাঁচটি ধারা রয়েছে— ১. পাঁচাল, ২. একক গান, ৩. ঘোষা গীত, ৪. পাঠপালা, ৫. পুতুল গান। চব্বিশ পরগনার অধিকাংশ গায়ক মনসার পালা গান করেন।

দেবী ষষ্ঠীকেন্দ্রিক পালাগান

লোকায়ত পালা গানের বিশিষ্ট দেবী হলেন দেবী ষষ্ঠী। চব্বিশ পরগনায় লৌকিক দেবদেবী কেন্দিক পালাগানে ষষ্ঠী পূজা সংক্রান্ত কথা ও আচার-আচরণগত সংস্কার একটি বিশেষ অঙ্গ হিসেবে প্রতিপালিত হয়। বিশেষত দেব বা দেবী পালায় যেখানে সন্তানাদি জন্মের কথা আছে সেক্ষেত্রে ষষ্ঠীর কথা থাকে। সুখের সংসারে সন্তানাদি জন্ম ও তাদের ভালো থাকা একটি প্রধান ব্যাপার। যথাসময়ে সংসারে সন্তানাদি আসার জন্য ও শিশুর জন্মান্তে তাদের সুস্থ স্বাভাবিক বাড় বৃদ্ধির জন্য পরিবারের মায়েরা অতুল উৎসাহে ষষ্ঠী পূজা ও বার ব্রতাদি পালন করেন। সাত দিন বা ২১ দিনের মাথায় ষষ্ঠী পূজা মহিলাগণ করেন। শুধু তাই নয় সারা বছর তারা ষষ্ঠীর অনেক ব্রত পালন করেন। দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ ষষ্ঠী পূজার কথা স্কন্দ পুরাণে আছে। যেমন— বৈশাখ মাসে চান্দনী ষষ্ঠী (চন্দনষষ্ঠী), জৈষ্ঠ মাসে অরণ্য ষষ্ঠী (স্কন্ধ ষষ্ঠী), আষাঢ়ে কার্দমী ষষ্ঠী (বিপত্তারিণী), শ্রাবণে লুণ্ঠন ষষ্ঠী(লোটন ষষ্ঠী), ভাদ্রে চপেটী ষষ্ঠী (চাপড়া ষষ্ঠী, মন্থন ষষ্ঠী, অক্ষয় ষষ্ঠী), আশ্বিনে দুর্গা ষষ্ঠী, কার্তিকে নারী ষষ্ঠী(ছট পূজা), অগ্রহায়ণে মূলক ষষ্ঠী(মূলা ষষ্ঠী), পৌষ মাসে অন্ন ষষ্ঠী(অন্নরূপা ষষ্ঠী), মাঘ মাসে শীতল, ফাল্গুন মাসে গো রূপিণী, চৈত্র মাসে অশোক ষষ্ঠী চব্বিশ পরগনার বারব্রত প্রিয় মহিলাগণ পালন করেন। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে তিনি প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ রূপা কার্তিকেয় ভার্যা মাতৃকাবিশেষ দেবসেনা। 'ইনি শিশুদিগের

প্রতিপালনকারীনি পুত্র পৌত্র দাত্রী ও ত্রিভুবন ধাত্রী ।দ্বাদশ মাসে এর পূজা হয়। শিশুর মঙ্গলার্থে জন্মের ষষ্ঠ ও একবিংশ দিনে এই অর্চনার বিধান আছে।’[৮] সাধারণ গৃহস্থের ঠাকুর ঘর অথবা ধানের গোলার নিচে ষষ্ঠী মূর্তি বা ষষ্ঠী নুড়ি সারা বছর স্থাপিত থাকে। ‘মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখিত আছে, যে ব্যক্তি যৌবন সম্পন্ন,স্ব-পুত্রা এর মূর্তি গৃহে রাখে, তার গৃহ সর্বদা ধনধান্য পুত্র কন্যাদিতে পূর্ণ থাকে। এই সন্তানদাত্রী দেবী হলেন ষষ্ঠী দেবী। মতান্তরে, কার্তিকেয় ও কৃত্তিকাদি যে ছয় মাতৃকার স্তন্যপানে পালিত হয়েছিলেন তাঁদের সমবেত মূর্তি হলেন ষষ্ঠী।’[৯] চব্বিশ পরগনায় দেবী ষষ্ঠী কেন্দ্রিক আচার অনুষ্ঠান ও ব্রতকথা ব্যাপক কিন্তু ষষ্ঠীর পালা গান সেই তুলনায় ব্যাপক নয়। চব্বিশ পরগনার বারুইপুর থানার শ্রী সুদিন মন্ডল বেশ কয়েক আসর এই পালা গেয়েছেন। তিনি ষষ্ঠীর যে পালাটি গান করেন তা কৃষ্ণরাম দাসের ষষ্ঠীমঙ্গলের কাহিনীর সাথে অনেকটা মিল আছে। পালাটি প্রায় ২-৩ ঘন্টা গান করেন, মূল কাহিনীর সাথে আরও কিছু কথা, গান ও কৌতুকাদি জুড়ে দিয়ে গানটি বড় করা হয়।

দেবী লক্ষ্মীকেন্দ্রিক পালাগান

লোকায়ত পালা গানের মধ্যে অন্যতম পালা হলো দেবী লক্ষ্মীর পালা। শাস্ত্র পুরাণের প্রভাবে লক্ষ্মী বিশিষ্ট রূপে পুজিত হন। কিন্তু তিনি শ্রী, সম্পদ ও শস্যদায়িনী কৃষি লক্ষী রূপে এই অঞ্চলের লোকসমাজে পূজিতা হন। তিনি ধান্য লক্ষ্মী রূপে মান্যা হন। এই অঞ্চলের মানুষ ধানকে ‘লক্ষ্মীর দানা’ বলেন। লক্ষীর পূজা সংক্রান্ত নানা পূজা চার পালিত হয়। মোটের উপর জীবনের যে ক্ষেত্রে সৌভাগ্য লাভের প্রসঙ্গ থাকে সে ক্ষেত্রেই লক্ষ্মীকে কল্পনা করা হয়। সেইহেতু এই অঞ্চলের লক্ষ্মী দেবীকে যশোলক্ষ্মী, ভূমিলক্ষী, বাণিজ্যলক্ষ্মী, কৃষিলক্ষ্মী, ভাগ্যলক্ষ্মী ইত্যাদি নামে বিশেষিত করা হয়। চব্বিশ পরগনা ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে শস্যদেবী লক্ষ্মী অন্য নামে পূজিতা হন। লক্ষ্মী শব্দটি ব্যবহৃত হয় ঠান্ডা প্রকৃতির, ধৈর্যশীল, ধীর স্থির রমণীদের ক্ষেত্রে। শ্রী শব্দটি ব্যবহৃত হয় সাধারণত ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য, সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে সুতরাং বর্তমানে দেবী লক্ষ্মী সুদূর অতীতে আর্য ও আর্যেতর জাতির মধ্যে ধন-সম্পদ ও সৌন্দর্যের প্রতিক রূপে বর্তমান ছিলেন বলে অনুমান করা যায়। যার আঞ্চলিক রূপ ২৪ পরগনার লক্ষ্মী পূজা ও দেবিলক্ষ্মীর পালাগানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়। ‘শারদীয়া পূর্ণিমাতে কোজাগর

লক্ষ্মীর পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাহা আদিতে এই কৌম ও সমাজের পূজা বলিলে অন্যায় হয় না।’[১০] চব্বিশ পরগনায় লক্ষ্মী দেবীর যে মূর্তি পূজিত হয় সেই মূর্তির মধ্যেও তাকে শ্রী ও সম্পদের দেবীরূপে কল্পনা করা হয়। তার দুই হাত, সদাপ্রসন্ন মুখ, পেচক বাহন, ধানের শীষ হাতে ,কোথাও হাতে পদ্ম, দন্ডায়মানা বা পদ্মের ওপর উপবিষ্টা ঐশ্বর্যময়ী। দেবীর বাহন সাদা পেঁচা। এই অঞ্চলের মানুষের কাছে পবিত্রতা ও শুভ লক্ষণের প্রতিক। স্থানীয় মানুষ এই প্রজাতির পেচককে লক্ষ্মীপেঁচা বলেন। লক্ষী পূজায় ব্যবহৃত হয় পঞ্চ শস্য(ধান, সরিষা, তিল, যব, মাষকলাই), পঞ্চ পল্লব(আম, বট, অশ্বত্থ, পাকুর, যজ্ঞ ডুমুর), পঞ্চগুড়ি (চাল, হলুদ, বেলপাতা, তুষ পুড়িয়ে গুঁড়ো, চাল ও রং মিশ্রিত গুঁড়ো),পঞ্চরত্ন (সোনা, রুপো, তামা, দস্তা, সিসা বা লোহা), পঞ্চগব্য(দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোময়, গোচোনা), পঞ্চ ফল ইত্যাদি। চব্বিশ পরগনায় কেবল লক্ষ্মীর মূর্তি পূজা নয়, দেবীর ঘট পূজাও হয়। মূর্তি ও ঘট ছাড়া আচার সর্বস্ব লক্ষী পূজা আছে, ধানের গাদার পূজা, ক্ষেত্র পূজা ইত্যাদি। তিন ধরনের লক্ষ্মীপূজা প্রত্যক্ষ করা যায় মূর্তি পূজা, ঘট পূজা, আচার সর্বস্ব পূজা। ‘লক্ষ্মী পূজার পূর্বে অলক্ষী পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে অশুভ শক্তির প্রতীক অলক্ষ্মী বিদায় দিয়ে শুভ শক্তির প্রতীক লক্ষীকে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করার বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয়।’[১১] লক্ষ্মী পূজায় শেষে মহিলারা পাঁচালী পাঠ করেন। লক্ষ্মী মাহাত্ম্য জ্ঞাপক একটি জনপ্রিয় পাঁচালী হলো বৃহৎ লক্ষ্মী চরিত্র। লক্ষ্মী পূজার আচার, অনুষ্ঠান বাসনা-কামনা প্রভৃতির প্রকাশ ঘটে লক্ষ্মীর লোকায়ত পালায়। চব্বিশ পরগনার লক্ষ্মীর কাহিনী নির্ভর মাহাত্ম্য কথা তিন ধারায় প্রচলিত আছে ১. মেয়েদের ব্রতকথা যা লক্ষ্মীর উপলক্ষে পাঠ করা হয়, ২. পালা গান, যা লোক-শিল্পী কর্তৃক গীত হয়, ৩. ফকিরি গানে যা মুসলমান ফকিরগণ দুয়ারে দুয়ারে গান করে ফেরেন। চব্বিশ পরগনায় বহু লোকশিল্পী লক্ষ্মীর পালা গান করেন। চব্বিশ পরগনায় লোকসমাজে লক্ষ্মীর লোকায়ত পালা গানের বিশেষ জনপ্রিয়তা আছে। ক্ষেত্র অনুসন্ধানকালে বিভিন্ন রূপ শিল্পীর নিকট হতে নিম্নলিখিত পালা গান সংগৃহীত হয়েছে সংগৃহীত পালাগানগুলি হল— ১. সুদিন মন্ডলের বীরবাহুর পালা, বিনন্দ রাখাল পালা, ভাঁটুই ঠাকুরের পালা; ২. বসন্ত কুমার গায়েনের বলাই দত্তের পালা; ৩. নকুল চন্দ্র মন্ডলের বল্লভ দত্ত ও সনাতনের পালা; ৪. শশীধর মহিষের অমলার কথা; ৫. বলরাম জানার লক্ষ্মীনারায়ণের পালা।

দেবী চন্ডীকেন্দ্রিক পালাগান

বাৎসরিক পূজার কালে যে চন্ডী দেবীর মূর্তি পূজা হয় তা অতি সুন্দর দুই হাত কোথাও চার হাত বিশিষ্ট প্রহরণ হীন সুশ্রী দেবী মূর্তি দেবীর গাত্রবর্ণ হলুদ দুটি চোখ টানা কোথাও ত্রিনয়নী চন্ডীমূর্তি দেখা যায়। ক্ষেত্রানুসন্ধানে আরো জানা গেছে দেবী চন্ডীর নামে কোথাও নুড়ি, ঘট, কোথাও উঁচু বেদী, মুন্ডু প্রতীক, খেঁজুর গাছ পূজা হয়। চব্বিশ পরগনার নৈহাটি গ্রামে খেঁজুর গাছকে ঢেলাইচন্ডী নামে পূজা করা হয়। চব্বিশ পরগনায় তথা সমগ্র নিম্ন গাঙ্গেয় বঙ্গভূমিতে দেবী চণ্ডীর পালা গানের প্রচলন বহু প্রাচীন। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর পূর্বে মানিক দত্ত প্রথম চন্ডীমঙ্গল কাব্যের কবি বলে পরিচিত। তাঁর সময়কাল আনুমানিক খ্রিস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী। মানিক দত্তের পরে মাধবাচার্য ও মুকুন্দরাম চক্রবর্তী প্রমুখ কবিগন চন্ডীমঙ্গল কাব্য লিখেছেন, কিন্তু অধিক সাহিত্য গুণসম্পন্ন কাব্য বলতে গেলে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কন চন্ডী'র কথাই মনে হয়। ক্ষেত্র গবেষণায় জানা যায়, চব্বিশ পরগনায় চন্ডীমঙ্গল গানের জনপ্রিয়তা কম। বর্তমানে খুব কম সংখ্যক গায়ক এই গান করেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার পুনপুয়া গ্রামের শ্যামল কুমার সরদারের নিকট হতে চন্ডীমঙ্গলের একটি পালা সংগৃহীত হয়েছে। গানটি খুব সুসংহত নয়। তিনি চন্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগরের কাহিনীটি গান করেন। এই পালার অনেক ঘটনা পূর্বসূরীদের থেকে পৃথক, ধারাবাহিকতাও সব ক্ষেত্রে বজায় নেই। ধনপতি সওদাগরের সিংহল যাত্রা এবং সেখানে গিয়ে সিংহল রাজের কারাগারে বন্দী হওয়া ও পরে সসম্মানে গৃহে প্রত্যাবর্তন এই মূল ধারাটি রয়েছে।

দেবী বিশালাক্ষীকেন্দ্রিক পালা গান

চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক পালা গান আলোচনায় বিশালাক্ষীর পালা দেবী পালার অন্তর্গত। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, হাওড়া, হুগলী প্রভৃতি জেলা তথা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে বিশালাক্ষীর পূজা হয়। রঙ্কিনী, বাসলী, দেবী নিত্যা, বাচ্ছলী, চন্ডী, যোগিনী ডাকিনী, বিন্ধ্যবাসিনী, বিশালাক্ষী প্রভৃতি নামে তিনি পরিচিতি লাভ করেছেন। খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতকের কাছাকাছি সময়ের মহাতান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগিসের বৃহত্তম সার গ্রন্থে বিশালাক্ষীর ধ্যান মন্ত্র আছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার কাকদ্বীপে বিশালাক্ষীর এক বিশাল মন্দির আছে।

মন্দিরটি হুগলি নদীর একটি শাখার তীরে অবস্থিত। হেরম্ব গোপাল দাস, নস্কর কৃষ্ণ গোপাল দাস ও গণেশ গোপাল দাস নস্কর মহাশয়-এর জমিদারি আমলে দেবীর মন্দিরটি নিয়মিত হয়েছে বলে জানা যায় বকখালীর নিকট জম্বু দ্বীপে একটি বিশালাক্ষের থান আছে। এখানকার মন্দিরে যে বিশালাক্ষী দেবীর মূর্তি আছে তা প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বছরের মধ্যে বলে অনেকে মন্তব্য করেন। লোক প্রচলিত বিশালাক্ষীর পালার কাহিনী করঞ্জলি গ্রামের নিকটবর্তী কাঁটাবেনিয়া গ্রামের বিশালাক্ষীর পূজাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এখানে স্বপ্নাদেশ অনুসারে বিশালক্ষীর স্থান সিদ্ধেশ্বরের পাশে স্থাপিত হয় সেই থেকে বিশালাক্ষী ও সিদ্ধেশ্বরের পূজা অদ্যাবধি চলে আসছে। চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত বিশালাক্ষীর পালার দুটি প্রধান রূপ দেখা যায়— ১. পালা গানের রূপ ও ২. গীতিনাট্যের রূপ। পালা গান হিসেবে যে পালাটি চব্বিশ পরগনায় প্রচলিত আছে এটি অর্বাচীনকালের রচনা। বারুইপুর থানার বেগমপুর গ্রামের শ্রী সুবর্ণ মন্ডল পালাটি রচনা করেন। সুবর্ণ মন্ডল পালাগানের একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পী। পালা গীতিনাট্যের রূপে যেটি এই অঞ্চলে প্রচারিত বা আসরে পরিবেশিত হয় তার রচয়িতা হলেন আটঘরা গ্রামের গোষ্ঠ মন্ডল। এটিও অর্বাচীনকালের রচনা। গীতিনাট্যের ধারায় এটি পরিবেশিত হয়। ক্ষেত্রানুসন্ধানে বিশালাক্ষীর যে দুটি পালা সংগৃহীত হয়েছে এ দুটির কাহিনী কাকদ্বীপ, করঞ্জলি ও মহিষাদলের বিশালাক্ষী দেবীকে নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু এর উৎস এই অঞ্চলের প্রচলিত লোককথা। ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে গোষ্ঠ মন্ডল ও সুবর্ণ মন্ডল এই মতের সমর্থন জানিয়েছেন, তারা মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল বিশালাক্ষী সম্পর্কিত লোককথা ও কাঁটাবেনিয়া কাকদ্বীপের বিশালাক্ষী সম্পর্কিত কাহিনী রচনা করেছেন। তাতে তাদের উৎকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাম্প্রতিককালের রচনা হলেও এর অবয়ব গড়ে উঠেছে লোক পরম্পরাগত বিশালাক্ষী সম্পর্কিত কিংবদন্তিমূলক কাহিনী সূত্রে। লৌকিক দেবী বিশালাক্ষীর অলৌকিক মহিমা ও মাহাত্ম্য সূচক লোকায়ত দেবী পালার মধ্যে স্থানীয় ভূপ্রকৃতি ও জনজাতির জীবনধারার বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। সামগ্রিকভাবে দেবী পালা হিসেবে বিশালাক্ষীর পালার গুরুত্ব অবশ্য স্বীকার্য ।

দেবী নারায়ণীকেন্দ্রিক পালাগান

চব্বিশ পরগনার লৌকিক দেবদেবী নির্ভর পালা গান সাহিত্যে লৌকিক দেবী নারায়ণী এক উল্লেখযোগ্য নাম। সুন্দরবন অঞ্চলে বনবিবি ও দক্ষিণ রায়ের মতো

নারায়ণীর পূজা খুব নিষ্ঠার সঙ্গে পালিত হয়। অরণ্যময় পরিবেশে সাধারণ মানুষের জীবিকা ও জীবন যাপনের সহায়ক শক্তি হিসেবে বনবিবি, নারায়ণী, দক্ষিণ রায় প্রমুখ লৌকিক দেবদেবীগণ পূজিত হন। জেলা চব্বিশ পরগনায় দেবী নারায়ণীর থান, পূজা পূজা সংক্রান্ত আরম্ভরাদি দেখে প্রতীতি জন্মে যে, দেবী নারায়ণীর লীলাক্ষেত্র এই অঞ্চলেই। লোকিং সংস্কার ও বিশ্বাস অনুসারে লোকশিল্পীগণ বনবিবির পালা মোবারক গাজীর পালা ইত্যাদির ন্যায় নারায়ণীর পালা গান করেন। চব্বিশ পরগণায় দেবী নারায়ণীর দুই ধরনের মূর্তি প্রত্যক্ষ করা যায় যথা পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ও বারা (কাটা মুন্ডু) মূর্তি। প্রখ্যাত লোকসংস্কৃতির গবেষক গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু নারায়ণীর যে মূর্তির বর্ণনা দিয়েছেন তা হল 'সিংহ কিংবা বাঘের ওপর শিব শায়িত, তার বুকে নারায়ণী উপবিষ্ট, মুকুট নেই, মাথার ওপরে কেশগুলি কুন্ডলী করে স্থাপিত। চোখে মুখের ভাব যেন তীব্র অভিচারিকা দেবী বলে মনে হয়।'[১২] ক্ষেত্রানুসন্ধান লব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে এবং লৌকিক পালাগানের বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে নারায়ণী কোন পৌরাণিক, ঐতিহাসিক নারী বা শাস্ত্রীয় নারী নন। নারায়ণী মৌলিক তাৎপর্যে লোকবিশ্বাসজাত লৌকিক দেবী যার বিশিষ্ট রূপ বারামুন্ডু মূর্তিতে প্রতিফলিত হয়। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন ব্যাঘ্রবাহন নারায়ণীর উৎপত্তি কর্তিত মুণ্ড পূজা থেকে, যা নাকি দক্ষিণ রায়ের কর্তিত (বারা) মুন্ডু পূজার সাথে পূজিতা হন। এই যুগ্ম বারা পূজা 'লৌকিক বৈশিষ্ট্যে কৃষি সহায়ক আদিম উর্বরতা জাদু বিশ্বাস সঞ্জাত কাণ্ডবিহীন কর্তিত নৃমুণ্ড পূজা।'[১৩] চব্বিশ পরগনায় বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় বনবিবি বা দুখের পালার মধ্যে এবং বনবিবি জহুরানামায় নারায়ণীর প্রসঙ্গ আছে। বনবিবির পালা গানে যেহেতু নারায়ণীর কথা আছে সেহেতু বন বিবির পালা গানকে অনেক স্থানে নারায়নী পালা বলে গীত হয়। কোন কোন পালা গায়ক বন বিবির জহুরানামা পুঁথির বনবিবি ও নারায়ণীর জন্ম কাহিনী অংশকে নারায়ণী পালা বলে গান করেন। পালা গায়ক সুদিন মন্ডল একটি স্বতন্ত্র নারায়ণীর পালা গান করেন। এই পালায় নারায়নীর মাহাত্ম্য প্রচারের কাহিনী আছে। এই পালাটি সুদিন মন্ডলের নিজের হাতের লেখা বলে দাবি করেন গায়েন সুদিন মন্ডল নারায়ণীর পালা গাওয়ার সময় বনবিবি ও শা-জঙ্গুলী উভয়ে জন্ম বৃত্তান্তটি সংক্ষেপে বলে নারায়ণের পালায় প্রবেশ করেন। এই অংশে বনবিবি ও নারায়নের মাহাত্ম্য প্রকাশ পেলেও নারায়নীর মাহাত্ম্য বেশি করে দেখানো হয়েছে।

দেবী দুর্গা (দুর্গার শঙ্খ পরিধান) কেন্দ্রিক পালাগান

দেবী দুর্গা ও মহাদেবকে অবলম্বন করে এই দুর্গার শঙ্খ পরিধান এই লোকায়ত পালাটি রচিত ও পরিবেশিত হয়। দেবী দুর্গা বাংলা লোকবিশ্বাসে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান। তিনি চণ্ডী, কালী, দুর্গা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামে পূজিত হন। দেবী চণ্ডী রূপে তিনি শবর প্রধান কালকেতুর নিকট পূজা গ্রহণ করেছেন,কালী রূপে অরণ্যবাসী তান্ত্রিক যোগীর পূজা পেয়েছেন, দেবী অন্নপূর্ণা রূপে সুরথ রাজার নিকট পূজা গ্রহণ করেছেন, মহামায়া দুর্গা রূপে রামচন্দ্রের নিকট পূজা পেয়েছেন এবং পরবর্তীকালে তিনি মহাশক্তি শিবের ঘরণী গৌরী রূপে সমগ্র বাঙালি সমাজে পূজা পেয়েছেন। দেবী দুর্গা যেমন একদিকে দশভূজা মহা শক্তির প্রতিক তেমন অন্যদিকে তিনি বাঙালি পরিবারের কন্যা। চব্বিশপরগনার প্রচলিত পালা গানের ঐতিহ্যসূত্রে দেখা যায় যে দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালাগান বিশেষ পূজা পদ্ধতি বা পূজা অনুষ্ঠানের অঙ্গ নয়। চব্বিশ পরগনার লোকসমাজে মনসার পালা গান অনুষ্ঠানের সময় মনসাপালার শাখা কাহিনী হিসেবে 'দুর্গার শঙ্খ পরিধান' পালাটি পরিবেশিত হয়। সাধারণত পালা গানটি দুটি ধারায় পরিবেশিত হয়, যথা পাঁচাল বা পালাগানের ধারা, অপরটি লোকনাট্যের ধারা। এই ধারাতেই দুর্গার শঙ্খ পালাটি পরিবেশিত হয়। চব্বিশ পরগনার সীমান্ত ঘেঁষা অঞ্চলগুলিতে এই পালা রয়ানী রীতি ও ঘোষারীতিতে গাইতে শোনা যায়। ঘট প্রতিষ্ঠার পর পালাগায়ক বন্দনাদি করে গান বা পালা শুরু করেন। পালা গান শেষ হলে যখন অষ্টমঙ্গলা শুরু হয় তখন পালা গায়ক এয়োদের উদ্দেশ্যে বলেন, মা ভগবতীর নাম করে যে সিঁদুর পড়ে তার স্বামীর পরমায়ু বাড়ে। যে দেবী ভগবতীর নাম করে শঙ্খ পরিধান করে তার হাতের শঙ্খ লোহা হয়ে যায়, এই রূপ স্বামী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সাংসারিক নানাবিধ মঙ্গল কামনা করে পালাগায়ক এই দীর্ঘ গান করেন। দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালাটি গড়ে উঠেছে বাংলার লোকসমাজে বহুল প্রচলিত শিব পার্বতীর কলহ ও শঙ্খ পরিধানের পারিবারিক কাহিনী কে অবলম্বন করে। হরগৌরীর দারিদ্রক্লিষ্ট সংসারে গৌরীর শঙ্খ পরিধান এর শখ প্রতিনিবৃত্তি করা আত্মভোলা ভিখারী মহাদেবের পক্ষে কত কষ্টকর এই নিয়ে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরূপতা ও পিতৃ গৃহে গমন, গৌরী বিনে শিবের নিঃসঙ্গতা ও ব্যাকুলতা খুব সুনিপুণভাবে পালাগায়কগণ তাদের এই পাঁচাল গানে ফুটিয়ে তুলেছেন। বাস্তবতায় পালাটি খুবই উপভোগ্য হয়ে ওঠে চব্বিশ পরগনায়

দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালার বহু গায়ক আছেন। প্রত্যেক মনসামঙ্গল পালা গানের গায়ক এই পালাটি গান করেন। অনিল হাজরার নিকট হতে সংগৃহীত হয়েছে দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালাটি। অন্যান্য পালাগানের সঙ্গে দেবী দুর্গার শঙ্খ পরিধানপালা গানটি শাখা পালা হিসেবে কথিত হয়। এই পালা গানটি সাধারণত একক বা স্বতন্ত্র পালাগান হিসেবে পরিবেশিত হয় না। পালা গানের শেষে এয়োদের মধ্যে দেবী ঘটের শাখা, নোয়া, সিঁদুর পরার লোকাচার অনুষ্ঠিত হয়। শিব-পার্বতীর দাম্পত্য কলহ ও সুখ-দুঃখের আখ্যানকে কেন্দ্র করেই পালা গানটি গড়ে উঠেছে। দৈব মহিমা নয়, জীবনরসই দুর্গার শঙ্খ পরিধান পালার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

দেবী সন্তোষী কেন্দ্রিক পালাগান

চব্বিশ পরগনা লোকই দেব দেবীকেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগানগুলির মধ্যে সন্তোষীমার পালাটি অন্যতম। দেবীর পূজা সংক্রান্ত নানা আচার অনুষ্ঠান এই অঞ্চলে প্রাচীন নয়, আনুমানিক বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অথবা তারও পরে এই পূজার প্রচলন হয়। জানা গেছে চব্বিশ পরগনার সুন্দর বন ঘেঁষা গ্রামগুলিতে এই দেবীর নামও অনেক মানুষ শোনেননি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের মহিলাগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তোষীমার পূজানুষ্ঠান করেন। এছাড়া দারিদ্র্য ক্লিষ্ট, নানা ঘাত প্রতিঘাতে জর্জরিত ও মানসিক ভাবে বিপর্যস্ত মানুষ দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেন। দেবী সন্তুষ্টি বিধান করেন বলেই সন্তোষীমা। শুক্রবার দেবী সন্তোষী মাতার 'বার'। চব্বিশ পরগনায় শুক্রবার দিনটি সন্তোষী মাতার বার হিসেবে মান্য হয়। সন্তোষী মায়ের পূজাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি সংস্কার পালিত হয়। এই সংস্কারের মধ্যে সিঁদুর দান, নারিকেল ভাঙ্গা, আত্মীয়, কুটুম্ব ও জ্ঞাতির সন্তানাদির মধ্যে প্রসাদ বিতরণ ইত্যাদি প্রধান। দেবী দশমহাবিদ্যারূপে কোথাও লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা, দুর্গা ইত্যাদি রূপে পূজা পান। চব্বিশ পরগনায় তিনি সন্তোষী মাতা নামে পরিচিতি লাভ করেছেন। দেবীর মাহাত্ম্য ও পূজা বিধি সম্পর্কে হিন্দি ও বাংলায় নানারূপ পুস্তিকা প্রচারিত আছে। পূজার কালে মহিলাগণ ওই পুস্তিকা লক্ষ্মীর পাঁচালীর মতো পাঠ করেন। অবশ্য চব্বিশ পরগনার অনেক পালাকার বা গায়েন সন্তোষী মাতাকে অবলম্বন করে কিছু কিছু পালা রচনা করেছেন, যা সন্তোষী মায়ের পূজা উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠান হিসেবে পাঁচাল বা পালাগানের ধারায় পরিবেশিত হয়। দক্ষিণ

চব্বিশ পরগনার জয়নগর থানার পুনপোয়া গ্রামের শ্রীশ্যামল চন্দ্র সরদার সন্তোষী মায়ের পালা গান করেন। তার মতে এই পালার চাহিদা খুব কম। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেখানে পূজা হয় সেখানে দেবীর পাঁচালী পাঠ করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মায়ের ব্রত উদযাপনের দিন দেবীর পালাগানের আসর বসে। বর্তমানে ছাপার অক্ষরে যেসব সন্তোষী মায়ের পুস্তক প্রকাশিত হয়েছে এগুলির মধ্যে পন্ডিত শ্রীকালিপদ বিদ্যারত্ন সাহিত্যতীর্থ প্রণীত 'শ্রী শ্রী সন্তোষী মাতার পাঁচালী ও ব্রতকথা' পুস্তকটি অন্যতম। সন্তোষী মাতার প্রচলিত কাহিনীটি আসরে কথা ও গানের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়। হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্য সহযোগে পালাটি গীত হয়। সন্তোষী মায়ের মাহাত্ম্য প্রচারমূলক একটি পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে, এটি লোকনাট্যের আকারে লেখা। পুঁথিটি গায়েন সুদিন মন্ডলের নিকট হতে সংগৃহীত।

চব্বিশ পরগনায় লৌকিক দেবদেবী কেন্দ্রিক লোকায়ত পালাগান ও পূজা সংক্রান্ত নানা সংস্কারাদি যুগের দাবির সাথে বিবর্তিত হয়ে চলেছে। বিশেষত পূজা সংক্রান্ত প্রাচীন যে সমস্ত সংস্কারাদি বর্তমানে প্রতিপালিত হয় তার অস্তিত্ব রক্ষায় এই অঞ্চলের পালাগানের লোকশিল্পীদের অবদান অনস্বীকার্য। তাঁরা পালা গানের আসরে গানের মাধ্যমে সংস্কারের কথা প্রচার করেন।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১। কমল চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনার ইতিবৃত্ত।

২। ড. সুশীল ভট্টাচার্য, ২৪ পরগনার জন্ম ও রূপরেখা, ২৪ পরগনা প্রত্নতাত্ত্বিক সম্মেলন, বারুইপুর ১৯৮৩।

৩। Dr. M. Vijayanunni, census of India 1991, series-1 part-4-B

৪। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস।

৫। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত কবি কৃষ্ণ রাম দাসের গ্রন্থাবলী (১৯৫৮) ভূমিকা, বাংলা শীতলা পূজার উৎপত্তি।

৬। পালা গান চলাকালীন পালা গায়ক বিশেষ কোন কোন দৃশ্যে ভিক্ষা পাত্র হাতে নিয়ে দর্শক বা শ্রোতাদের নিকট হতে চাল পয়সাদি ভিক্ষা করেন একেই 'প্যালাতো' বলে।

৭। শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, কবি কৃষ্ণ রাম দাসের গ্রন্থাবলী।

৮। স্কন্দ পুরাণ

৯। সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত পৌরাণিক অভিধান, ৫ম সংস্করণ।

১০। নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালির ইতিহাস, আদিপর্ব, ১৪০০, পৃ. ৪৯১

১১। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, বিশ্বকোষ ১ম খন্ড, সাক্ষরতা প্রকাশন, ১৯৭৭, পৃ. ১৪৭-৪৮

১২। গোবিন্দকৃষ্ণ বসু, বাংলার লৌকিক দেবতা, ১৯৮৭, পৃ. ১০৭,

১৩। ড. তুষার চট্টোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা, তৃতীয় খন্ড ভারতের জনগণনা ১৯৬১, দক্ষিণ রায়, পৃ. ৫৩৯

প্রান্তিক শীতলকুচির গোসাইরহাট এক সাংস্কৃতিক চর্চার মিলন মেলা (১৯৪৭- ২০২৩): একটি ঐতিহাসিক অন্বেষণ

সুরজিৎ বর্মন
শিক্ষক, ইতিহাস বিভাগ, শীতলকুচি কলেজ, কুচবিহার

সারাংশ: কুচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের অন্তর্গত গোসাইরহাট বন্দরের পত্তন কোচবিহার রাজ আমলে হয়েছিল। তবে মনে রাখার বিষয় যে, 'গোসাইরহাট বন্দর' বলতে শুধুমাত্র বাজার এলাকাকেই বোঝায়। কিন্তু 'গোসাইরহাট' বলতে গোটা গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাকে বোঝায়। কাজেই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আলোচ্য প্রবন্ধে গোসাইরহাট বলতে 'গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত' এলাকাকেই বোঝানো হয়েছে। যাইহোক, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, স্বাধীনতা - উত্তর পর্বে গোসাইরহাট বন্দর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারে পরিণত হয়েছে। তবে আলোচ্য প্রবন্ধে গোসাইরহাট বন্দরের নামকরণসহ গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংস্কৃতিক চর্চার বিভিন্ন দিক, যেমন- মন্দির, মসজিদ, লোকসংস্কৃতি, যাত্রাপালা, মেলা, নাটক, দুর্গোৎসব, লেনিন উৎসব, ভাওয়াইয়া সংগীত প্রভৃতি আলোচনায় স্থান পেয়েছে। মূলত মৌখিক ঐতিহ্য ও ক্ষেত্র সমীক্ষার উপর অধিক নির্ভর করেই সতর্কতার সহিত প্রবন্ধটিকে তার ঐতিহাসিক চরিত্রে চিত্রাংকন করা হয়েছে। স্থান পেয়েছে সেই সব মানুষের কথা, যারা নিজের ব্যক্তিজীবনকে উপেক্ষা করে দিনের পর দিন সাধারণ মানুষের বেঁচে থাকার সেই আনন্দের রসদ জুগিয়েছেন অবলীলায় । স্থান পেয়েছে জাতি -ধর্ম -বর্ণ -নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মযজ্ঞ ; যা আজ স্মৃতির পাতায় মলিন হতে চলেছে। আর তারই লিপিবদ্ধকরণে আমার এই যৎসামান্য প্রয়াস।

সূচক শব্দ: গোসাইরহাট, মেলা, ভাওয়াইয়া সঙ্গীত, দুর্গাপূজা, জনতা অপেরা, বিষ্ণুপদ অপেরা, সপ্তরথী অপেরা, লেনিন উৎসব, নাটক, ইসকন মন্দির, সৎসঙ্গ বিহার, মাশান মেলা, শিব মেলা।

নামের উৎস সন্ধানে: দেশীয় রাজ্য কুচবিহারের অধীনস্থ যে সমস্ত বাজার - বন্দরের পত্তন ঘটেছিল এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তথা কুচবিহার রাজ্যের ভারত ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্তির অব্যবহিত পরে কোচবিহার জেলার যে কয়েকটি বাজার - বন্দর জেলায় প্রথম সারিতে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে নিঃসন্দেহে গোসাইরহাট বন্দর এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে । অনেকেরই ধারণা যে, সম্ভবত সন্ন্যাসী- ফকির বিদ্রোহের সময়কালেই এই সমস্ত বাজারের পত্তন ঘটেছিল।[১] তবে স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে এই বাজারের শ্রীবৃদ্ধি ক্রমশ এক আঞ্চলিক বিশিষ্টতা দান করে আসছে। পশ্চিমবঙ্গের বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন একটি জেলা কুচবিহার । এই জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার শীতলকুচি ব্লকের অন্তর্গত একটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা হলো গোসাইরহাট । লোকমুখে প্রচলিত আছে যে, 'গোসাইরহাট' নামক স্থানে অতীতে এক 'মুল্লিকি গোঁসাই' নামে গোসাই বাস করত। বর্তমান সময়ের গোসাইরহাট বাজার সংলগ্ন শিবমন্দির এর পাশেই সেই গোঁসাই খড়ের টালিতে বাস করতেন। অতীতে দূর- দূরান্ত থেকে লোকে পায়ে হেঁটে এই স্থানে হাট করতে আসত, কেউ কেউ সাথে করে তাদের জিনিসপত্র, দ্রব্য- সামগ্রী হাটে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসত, হাট শেষে তাদের বিক্রি না করতে পারা জিনিসপত্র, দ্রব্য-সামগ্রী পুনরায় বাড়িতে নিয়ে না গিয়ে সেই মুল্লিকি গোঁসাই[২] এর খড়ের টালিতে মজুত রাখত, সেই থেকে এই মুল্লিকি গোঁসাইয়ের নাম অনুসারে এই স্থান 'গোসাইরহাট বন্দর' নামে পরিচিতি লাভ করতে থাকে। নিঃসন্দেহে এই গোসাইরহাট বন্দরের পত্তন স্বাধীনতার অনেক পূর্বেই ঘটেছিল।[৩] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'হাট' বলতে যে সমস্ত বাজার যা রাজ্য সরকার হতে 'হাট' বলে ইজারা দেওয়া হয় বা বন্দোবস্ত করা হয় এবং যা প্রতি সপ্তাহে নির্দিষ্ট দিনে বসে এবং যেখানে লোকে পণ্যদ্রব্য ক্রয় - বিক্রয় একত্রে করে, তা বোঝায়। কিন্তু এর দ্বারা দৈনন্দিন বাজার বোঝায় না। অনুরূপভাবে, উত্তরবঙ্গকেন্দ্রিক পরিভাষায় 'বন্দর' বলতে ব্যবসায় বাণিজ্য স্থান যেখানে ব্যবসায়ীগণ স্থায়ীভাবে বাস করে এবং যেখানে ব্যবসায়ের জন্য তাদের আড়ত বা দোকান আছে, তা বোঝায়।[৪] ব্যুৎপত্তিগতভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, কুচবিহারের রাজ্য সরকার কর্তৃক এই হাটকে ইজারা দেওয়া হয়েছিল এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট দুটি দিন অর্থাৎ বুধবার ও শনিবার এখানে হাট বসে । শুধু তাই নয়, অনেক ব্যবসায়ী এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং ব্যবসার জন্য তারা আড়ত বা দোকান প্রতিষ্ঠা করেন। তাই সামগ্রিক অর্থে, গোসাইরহাট বন্দরের পত্তন হয় ও

বর্তমানেও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে । বর্তমানে গোসাইরহাট বন্দরে প্রায় ১২০০ দোকানপাট রয়েছে।[৫] উল্লেখ্য যে, গোসাইরহাট বন্দরের 'গরুহাটি' নামক স্থানে হাটবারে অর্থাৎ শনিবার ও বুধবারে একটি বড় গরুর হাট বসে। গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত অন্যান্য ছোট বাজারগুলির মধ্যে ভাবের হাট, খানুয়ার ডাঙ্গা, বাউদিয়া বাজার, সন্তোষী মোড়, মিলন বাজার, গড়খোলা উল্লেখযোগ্য । তবে আলোচ্য প্রবন্ধে গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্বাধীনোত্তর পর্বের সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনায় ব্রতী হলাম।

লোকসংস্কৃতিচর্চার কেন্দ্র: গোসাইরহাট বন্দর বহু অতীত থেকেই লোকসংস্কৃতি চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান হিসেবে পরিচিতি লাভ করে এসেছে।[৬] বর্তমানেও শীতলখুচি ব্লকের গোসাইরহাট বন্দর নামক স্থানটি শিক্ষা সংস্কৃতির এক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছে; যার শিক্ষার সূত্রপাত গোসাইরহাট হাইস্কুলের (১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দ) হাত ধরেই। স্কুলের মাঠ যেন সাংস্কৃতিক রঙ্গমঞ্চ, 'ঘটনার ঘনঘটায়' ঘটে গিয়েছে অনেক পরিবর্তন যা আজও সমানতালে পরিবর্তনশীল। উল্লেখ্য যে, গোসাইরহাটের বাজার সংলগ্ন এলাকায় আর কোনো বড় মাঠ নেই, এই স্কুল মাঠ ব্যতীত। কাজেই যেকোনো ধরনের বৃহৎ অনুষ্ঠানের জন্য এই মাঠ আজও সমান্তরালভাবে তার প্রাসঙ্গিকতা ধরে রেখেছে। এই মাঠ ছাড়াও গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকা বিশেষ করে বাজার এলাকা বহু ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। আর সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের এক জীবন্ত অধ্যায়ের নাম যাত্রাপালা, সে আজ তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে ; কিন্তু স্মৃতিকে রঙিন করে রেখেছে মানুষের মনের মনিকোঠায়।

বিষ্ণুপদ অপেরা: ১৯৫০ এর দশকের শেষের দিকে গোসাইরহাট বন্দর তথা শীতলখুচিতে একটি যাত্রা দল গড়ে তোলা হয়েছিল। শীতলকুচিসহ পার্শ্ববর্তী এলাকায় এই অপেরার জনপ্রিয়তার কথা কান পাতলে আজও শোনা যায়। বিষ্ণুপদ রায়[৭] প্রতিষ্ঠিত এই যাত্রা দলের নাম ছিল 'জনতা অপেরা'। এই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন অনিল রায় সূত্রধর, সুভাষ শীলশর্মা, প্রফুল্ল রায়, সুশীল সরকার, হরিদাস চন্দ্র সাহা, সুমতি কুমার সাহা, ধরণীকান্ত বর্মন, কমলা সিংহ, রবি সাহা, মিহির সেন, গুরুদাস ধারা, খোকন মজুমদার প্রমুখ। এই যাত্রা দলের একসময়ের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেতা গোকুল সাহা[৮] জানাচ্ছেন যে, বিষ্ণুপদ রায়েরই উদ্যোগে

এই যাত্রা দলটি তৈরি হয়েছিল এবং তিনি নিজেই ছিলেন এই দলের মাস্টার এবং পরিচালক। তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি যে, বিষ্ণুপদ রায়ই তাদের অভিনয় শিখিয়েছেন। কিন্তু কিছুটা পরবর্তী সময়ে কিছু অজ্ঞাত অভ্যন্তরীণ কারণে এই যাত্রা দল ত্যাগ করে বিষ্ণুপদ রায় এক নতুন যাত্রা দলের জন্ম দেন, এই যাত্রা দলের নাম 'বিষ্ণুপদ অপেরা' । যামিনী মোহন বর্মন[৯] জানাচ্ছেন যে, এলাকার স্বনামধন্য ব্যবসায়ী রসিক চন্দ্র বর্মনের[১০]বাড়িতেই বিষ্ণুপদ রায় এই নতুন যাত্রা দল গঠন করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিষ্ণুপদ রায় ১৯৫০ এর দশকের শুরুতে পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান থেকে এসে কোচবিহার জেলার অন্তর্গত এই গোসাইরহাট বন্দরের গরুহাটি নামক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সংস্কৃতিপ্রিয় এই ছিন্নমূল মানুষটি মাতৃভূমি হারানোর যন্ত্রণা বুকে পাথর চাপা দিয়েও তাঁর সংস্কৃতিসত্ত্বাকে এতদ্অঞ্চলের স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় সযত্নে লালন করেন। আক্রারহাট, খানুয়ার ডাঙ্গা, পঞ্চারহাট প্রভৃতি স্থান থেকে নতুন তরতাজা যুবককে সংগ্রহ করেন বিষ্ণুপদ অপেরায় অভিনয়ের জন্য, সাধারণ যাত্রা প্রেমী মানুষের মন জয়ের জন্য । তাঁর এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়নি। গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা যুবকদের নিয়েই তিনি জনপ্রিয়তার খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। দিকে দিকে তাঁর জনপ্রিয়তার জয়গান ছড়িয়ে পড়েছিল অবলীলায়। তিনি উপহার দিয়েছিলেন বৈচিত্র্যে ভরপুর শত শত যাত্রাপালা। কালের করাল গ্রাসে হারিয়ে গেছে তার মাহাত্ম্য, কিন্তু হারিয়ে যায়নি তাঁর ব্যবহার, তাঁর কোমলতা। তিনি যে যাত্রাপালাগুলো মঞ্চস্থ করেছিলেন, তার সামান্যই কয়েকটি নাম এখানে উপস্থাপন করার চেষ্টা হলো : 'গরিব কেন মরে', 'গরিবের মেয়ে', 'তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ', 'ধর্মের বিপ্লব', 'আশায় বাঁধিনুঘর', 'মানুষ', 'সাপুরিয়ার মেয়ে', 'ময়নার চোখের জল', 'টিপু সুলতান' এবং আরও অনেক। এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, 'সাপুরিয়ার মেয়ে' যাত্রা পালাটি যে আঙ্গিকে তৈরি করা হয়েছিল, ঠিক একই রকম বাচনভঙ্গিতেই বর্তমান বাংলাদেশের একটি জনপ্রিয়তম সিনেমা 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না'ও (১৯৮৯) তৈরি করা হয়েছিল। পাঠক সাধারণ এতক্ষণে বোধ হয় একটি বিষয় অনুধাবন করতে পেরেছেন যে, বিষ্ণুপদ রায় পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসলেও তাঁর একটা আত্মিক ও সাংস্কৃতিক লেনদেন ছিলই। অনুমিত হয়, বর্তমান বাংলাদেশের উপর্যুক্ত জনপ্রিয়তম সিনেমাটি 'সাপুরিয়ার মেয়ে' যাত্রাপালাটিই অনুকরণীয় একটি সিনেমা। গিরীন্দ্রনাথ বর্মন[১১] জানাচ্ছেন যে, এই যাত্রাপালাটি প্রথমে ঝুমুর[১২]ছিল ।

পরে তা যাত্রাপালায় রূপান্তরিত হয়েছিল। মনীন্দ্রনাথ রায় জানাচ্ছেন যে, কলকাতা থেকে আগত বিখ্যাত সব যাত্রাদলের সঙ্গে বিষ্ণুপদ রায় পরিচালিত যাত্রাদল প্রতিযোগিতা করেছিল। এতেও তিনি সুনাম অর্জন করেন। আজও লোকের মুখে শোনা যায়, "সাতহাত কালী, চান্দিয়া হইল মালি, নোকা মাস্টারের গান, গান শুনির যান" ।[১৩] যাইহোক, এই বিষ্ণুপদ অপেরার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন কামিনী বর্মন, গজেন বর্মন, মদন বর্মন, গিরেন্দ্রনাথ বর্মন, খগেন বর্মন প্রমুখ। এই অপেরার ম্যানেজার হিসেবে পরবর্তী সময়ে যোগদান করেছিলেন ভবেন বর্মন[১৪]। জানা যায় যে, ১৯৫০ এর দশকে তাঁর যাত্রাদল ছিল। সেই দল পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর সমস্ত জমি জায়গা বিক্রি করে দিয়েছিলেন।

সপ্তরথী অপেরা: বিষ্ণুপদ রায় 'জনতা অপেরা' ত্যাগ করলে তা অস্তিত্ব রক্ষার সংকটে ভুগতে শুরু করে। কারণ তিনি ছিলেন এই অপেরার অন্যতম প্রধান কান্ডারী। বলাবাহুল্য, জনতা অপেরার মৃত্যু ঘন্টা বেজে যায় এবং এর ধ্বংসস্তূপের উপর জন্ম নেয় 'সপ্তরথী অপেরা'।[১৫] মূলত সাতজনকে নিয়েই এই যাত্রা দলটি তৈরি হয়। এই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন অনিল রায় সূত্রধর, গোকুল সাহা, সুভাষ শীলশর্মা, রবি সাহা, সাক্ষী গোপাল সাহা, হরিদাস সাহা, সুনীল সাহা প্রমুখ। গোসাইরহাট কাঠালতলার নৃপেন কার্জীর চায়ের দোকানে দুর্গোৎসবের নবমীর সান্ধ্যকালীন আড্ডায় গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে আলোচনা প্রসঙ্গে (২৩.১০.২৩ ইং) শ্রদ্ধেয় গোকুল সাহা ও অখিল রায় মহাশয় বর্তমান লেখককে জানান যে, 'সাহিত্য সরস্বতী' উপাধিপ্রাপ্ত জিতেন বসাক ডিরেকশন দেওয়ার জন্য হলদিবাড়ি থেকে গোসাইরহাট বন্দরে আসতেন। ৯০ বছরের গোকুল সাহা মহাশয় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেন যে, জিতেন বসাকের লেখা 'মানুষ', 'বাস্তুহারা', 'পাহাড়ের ছেলে', 'মিলন সেতু', 'রক্ত স্নান', 'রক্ত কমল', 'রাজা দেবী দাস' এবং আরো অনেক যাত্রাপালায় তিনি অভিনয় করেছেন।

মহেন্দ্র অপেরা: জানা যায় যে, জনতা অপেরার অবলুপ্তির পর 'মহেন্দ্র অপেরা'র জন্ম হয়েছিল। মহেন্দ্র বর্মন[১৬]এই অপেরার পরিচালকের ভূমিকা পালন করতেন। তিনিও একজন ছিন্নমূল মানুষ। তিনিও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অনেক পূর্বেই ভিটেমাটি ছেড়ে গোসাইরহাটের 'পাকিস্তানটারী' বর্তমানে 'তরকারি ব্যাচাটারী'র দক্ষিনে বসতি

স্থাপন করেছিলেন। বলাবাহুল্য, সেই সময় অনেক মানুষ উপর্যুক্ত অঞ্চলে এসে বসবাস করায় এলাকাটির নাম 'পাকিস্তানটারী' নামে পরিচিত লাভ করে। যাইহোক, এই অপেরার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন মন্টু বর্মন[১৭], প্রভাত চন্দ্র সাহা, ধৌলু বর্মনসহ আরো অনেকেই। এই অপেরা আয়োজিত 'রাজা দেবীদাস' যাত্রাপালাটি সেই সময় মানুষের মন জয় করে নিয়েছিল। সম্ভবত গোসাইরহাট হাইস্কুলের মাঠেই এই পালাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।[১৮]

সংস্কৃতি-পূজারী অখিল রায়[১৯] জানাচ্ছেন যে, 'সপ্তরথী অপেরা'র পরবর্তী সময়ে 'জাগরণ নাট্য সমাজ' (১৯৭৭ সাল) নামে একটি নতুন যাত্রাদল গঠন করা হয়েছিল। বিমল সূত্রধর, শ্যামল সূত্রধর, প্রভাত চন্দ্র সাহা, নৃপেন শীল, সুধীর চন্দ্র বর্মন[২০], বিনয় রায়, অখিল রায়, মন্টু বর্মন এবং আরো অনেকেই এই যাত্রাদলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই যাত্রা দলের প্রথম অভিনীত যাত্রাপালা ছিল নির্মল মুখার্জির 'গরিব কেন মরে', 'চাঁদের মেয়ে', 'কয়েদি', 'কুরুক্ষেত্রের কান্না', 'ভক্ত ভগবান', 'নাচমহল' ইত্যাদি। জানা যায় যে, 'ভক্ত ভগবান' যাত্রাপালাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল । এই যাত্রাপালাটি গোসাইরহাট বাজারের কালী মন্দিরের সামনে আয়োজিত হয়েছিল। প্রচুর মানুষের সমাগম হয়েছিল। অখিল রায় আরো জানান যে, তখন চোর ডাকাতের খুবই উপদ্রব ছিল ; গরু, ছাগল চুরি যাওয়ার ভয় থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ দলে দলে যাত্রাপালা শুনতে আসতেন।

তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথা না বললে খুবই দোষের হবে, তা হল এই স্থানীয় যাত্রাদলগুলো সব সমসাময়িক না হলেও একে অপরের পরিপূরক ছিল। অনুমিত হয়, একই যাত্রার পালা বিভিন্ন যাত্রাদলের দ্বারা মঞ্চস্থ হয়েছে। শুধু তাই নয়, উপরে উল্লেখিত যাত্রাদলের অনেক সদস্যই বিভিন্ন যাত্রা দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ফলে বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করে বলা সম্ভব হচ্ছে না যে, কোন যাত্রাপালাটি কোন যাত্রা দলের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল।

দক্ষিণবঙ্গকেন্দ্রিক যাত্রাপালা : আশির দশকের প্রায় শুরুর থেকেই এই স্থানীয় যাত্রাপালাগুলোর জনপ্রিয়তা ক্রমশ শিথিল হতে থাকে। এই স্থানীয় স্তরে দক্ষিণবঙ্গকেন্দ্রিক যাত্রাপালা আমন্ত্রিত হতে থাকায় স্থানীয় অপেরাগুলি প্রায় বন্ধ হয়ে

যাওয়ার উপক্রম হয় । আর এভাবেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্থানীয় স্তরে গজিয়ে ওঠা যাত্রা অপেরাগুলি এক সংকটাপন্ন পরিস্থিতির মধ্যে কোনো এক সময় প্রাণহীন হয়ে পড়ে। তৎকালীন সময়ে এলাকার বর্ষীয়ান নেতৃত্ব স্বর্গীয় পরিমল চন্দ্র বর্মনের[২১]সুযোগ্য নেতৃত্বে গোসাইরহাট বন্দরে যাত্রা কমিটি তৈরি হয় এবং চলচ্চিত্রের অভিনেতা - অভিনেত্রীদের মুখ্য ভূমিকায় অভিনীত যাত্রাপালা তথা অপেরাগুলো গোসাইরহাটের বুকে ক্রমশ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। এই যাত্রা কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন সুভাষ শীলশর্মা, গোকুল সাহা, হরিনাথ বর্মন, লালমোহন সরকার, স্বপন সাহা, সুজন সাহা, আনন্দ সাহা, বাসুদেব সাহা, সুনীল সাহা, সুশীল বর্মন, শ্যামল বর্মন, মলিন বর্মন, সুকারু বর্মন, দ্বীপচরণ বর্মন, দিপেন বর্মন এবং আরো অনেকেই। ক্ষেত্র সমীক্ষা জানা যায় যে, ১৯৯২ সালে যখন বাবরি মসজিদ ভাঙা হয়েছিল তার একদিন পরেই হাই স্কুল মাঠে দ্বিগবিজয়ী অপেরা পরিচালিত একটি যাত্রাপালা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু যাত্রাদল রাস্তায় বাধার সম্মুখীন হওয়ায় যথাযথ সময় আসতে পারে নি। কাজেই সেদিন যাত্রা কমিটি বাধ্য হয়েছিলেন যাত্রা বন্ধ করে দিতে। সেই সময়ের যাত্রা কমিটির কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক সমরেশ চন্দ্র বর্মন[২২] জানান যে, উপর্যুক্ত ঘটনার কয়েকদিন পর হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত দিগ্বিজয়ী অপেরার যাত্রাপালাটি উপভোগ করতে প্রচুর সংখ্যক বাংলাদেশী মানুষও গোসাইরহাটে এসেছিলেন। দিগ্বিজয়ী অপেরা চারটি মঞ্চে তাদের যাত্রাপালা পরিচালনা করেছিল। সেই বছর এই অপেরা প্রচুর সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। গোসাইরহাট যাত্রা মঞ্চে অনুষ্ঠিত কিছু যাত্রাপালা, যেমন - তরুন অপেরা পরিচালিত 'আমি সুভাষ বলছি', বৈকুণ্ঠ নট্ট কোম্পানির 'অচল পয়সা', 'কাগজের ফুল', 'ময়লা কাগজ', 'জনতার আদালত', 'মা -মাটি- মানুষ','দেবী সুলতানা', অগ্রগামী অপেরার 'মীরার বধুয়া', 'বৈজু বাউরা', 'দস্যু রানী ফুলন দেবী', 'কাজলা গায়ের কালো মেয়ে', 'স্বর্গের পরের স্টেশন', 'ভুলি নাই প্রিয়া', 'সুখের ঘরে শয়তানের বাসা', 'চাঁপা রাঙ্গা চাঁপা বউ', 'সিঁদুরের অধিকার' ইত্যাদি। বিংশ শতকের শেষে 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না' খ্যাত বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী অঞ্জু ঘোষ গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠে যাত্রাপালায় অভিনয় করেন। সে বছর প্রচুর মানুষের সমাগম হয়। হুর লেগে যাওয়ায় যাত্রাপালার পরিবেশ বিঘ্নিত হয়। বাংলাদেশ থেকে প্রচুর মানুষ যাত্রা শুনতে এসেছিলেন। স্বপন কুমার সাহা[২৩] মহাশয় জানাচ্ছেন যে, যে সমস্ত অভিনেতা - অভিনেত্রী যাত্রাপালায় অভিনয় করতে নেমেছিলেন, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই

গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভিক্টর ব্যানার্জি, চুমকি চৌধুরী, কৌশিক ব্যানার্জি, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, জয় সেনগুপ্ত, অভিষেক ব্যানার্জি, লকেট চ্যাটার্জি, বিপ্লব চ্যাটার্জি, শতাব্দি রায়, যীশু সেনগুপ্ত, পরবর্তী সময়ে যাত্রার পরিবর্তে অরগেস্টার জনপ্রিয় হওয়ায় জিৎ, সায়ন্তিকা, মোনালি ঠাকুর এবং আরো অনেক শিল্পী মাঠকেন্দ্রিক সংস্কৃতির আঙ্গিনাকে অলংকৃত ও সমৃদ্ধ করেছেন এবং আজও নবাগত শিল্পী সমন্বয়ের আগমনের ধারা সমান্তরালভাবে প্রবাহমান।

কুশান যাত্রাপালা: উত্তরবঙ্গের কোচ- রাজবংশী সমাজ -সংস্কৃতির সঙ্গে ভাওয়াইয়ার যেমন প্রাণের যোগ, তেমনি কুচবিহারকে মূলত কেন্দ্রে রেখে রংপুর, জলপাইগুড়ি ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে প্রচলিত কুশানপালার সঙ্গে এখানকার মানুষের ভাবের ও রসের যোগ সূত্র মধ্যযুগ থেকেই।[২৪] বলাবাহুল্য, বৃহত্তর উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতম লোকনাটক কুশান। প্রচলিত বিশ্বাস যে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজসভায় লব ও কুশ বীণা বাজিয়ে দুঃখিনী মা সীতা দেবী সম্পর্কে গান পরিবেশন করেন। এই গান পরবর্তীতে 'কুশান গান' নামে পরিচিতি লাভ করে। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর কুশান গানের আসর জমে উঠত। তবে আদিতে পৌরাণিক পালা জনপ্রিয়তা পেলেও পরবর্তীতে দর্শকের চাহিদা অনুযায়ী ঐতিহাসিক ও সামাজিক পালা আয়োজিত হতে থাকে। বলাবাহুল্য, এর জনপ্রিয়তাও ছিল আকাশচুম্বী। ড. জ্যোতির্ময় রায় লিখেছেন যে, প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ জলপাইগুড়ি, কুচবিহার জেলায় কয়েক দশক আগেও কুশান গানের ব্যাপক বিস্তার থাকলেও বর্তমানে প্রায় অস্তমিত।[২৫]

কুশান যাত্রাপালায় গিদালী, ছোকরা ও দোয়ারির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। পালা চলাকালীন অবস্থায় দর্শকের নাট্যমুক্ত বা মনোরঞ্জনের জন্য 'ফাঁস গান' বা 'খোসা গান' পরিবেশিত হয়। এইসব গানের বিষয়বস্তু মূল পালার সঙ্গে যুক্ত নয়। একে ভর্তুগানও বলা হয়।[২৬]আলোচ্য অঞ্চলে ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, স্থানীয় এবং কোচবিহার জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এমনকি জেলার বাইরে থেকেও কুশান দল গোসাইরহাটের বিভিন্ন মেলার মাঠে, বাজারে জনপ্রিয় কুশানপালা মঞ্চস্থ করেছিল। অনুমিত হয়, উপযুক্ত কুশান প্লেয়ারের অভাবে কোন একটি নির্দিষ্ট

জায়গার মানুষজনকে নিয়ে এই দল গঠন করা সম্ভব হত না। কাজেই বাধ্য হয়েই প্রয়োজনে তাগিদে জেলার বাইরে থেকেও কখনো কখনো প্লেয়ার সংগ্রহ করা হতো। গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশান দল এর ব্যতিক্রম ছিল না। শোনা যায়, গোসাইরহাটের রবীন্দ্রনাথ সরকার (রবি ডিলার), খোকন মজুমদার, নান্ডালু বর্মন (ডাক্তার) প্রমূখরা কুশান গানের দল কিনে নিতেন। যাদের 'মালিক' বলে সম্বোধন করা হত । জগদীশ বর্মন[২৭]জানাচ্ছেন যে, উপেন বর্মন (দোয়ারী, গোসানিমারি), বাবলু বর্মন (দোয়ারী) , হিতেন বর্মন (দোয়ারী,গোসানিমারি), কোনারাম বর্মন (দোয়ারী), সাধা মাধব বর্মন (দোয়ারী), নিখিল বর্মন (দিনহাটা), নির্মল দেবনাথ, জগদীশ বর্মন, রেনুকা দাস (নিশিগঞ্জ, কোচবিহার), প্রমিলা বর্মন (সঙ্গার বাড়ি), ভারতী বর্মন, মালতি বর্মন (শীতলখুচি), টগরু বর্মন, কামিনী বর্মন, ললিত বর্মন, সুরোদ বর্মন, নিশি শীল (গোসাইরহাট), পরেশ বর্মন (সরকারের হাট), ললিত বর্মন (সরকারের হাট), বিদ্যেশ্বর বর্মন (সরকারের হাট), দেবী বর্মন, (সরকারের হাট), বাচ্চু বর্মন, সুধীরশীল শর্মা, প্রাণহরি বর্মন, ধীরেন বর্মন (গোসানিমারি), যাদব বর্মন (গোসানিমারি), তরণী বর্মন, কার্তিক বর্মন (ভাওয়াইর থানা), মহিন বর্মন, ধনেশ্বর বর্মন, ললিত বর্মন, বাঁশি বর্মন (তুফানগঞ্জ), বসন্ত সিনহা (খাগড়াবাড়ি), সুজন বর্মন, সতীশ বর্মন (জামালদাহ), লাল্টু বর্মন, দেল্লা বর্মন, বাচ্চু বর্মন (গোসাইরহাট)প্রমূখ গিদালের গান গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয় । এছাড়াও বাইরে থেকে যে সমস্ত মহিলা প্লেয়ার নিয়ে আসা হত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আলো সাহা, ছায়া সাহা, তিলোত্তমা দাস, রত্না পোদ্দার, লক্ষ্মী দে, ঝর্না, সন্ধ্যা, মীরা, কোহিনুর প্রমুখ । ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা যায় যে, এদের বেশিরভাগই স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সত্তরের দশকে গ্রামে গ্রামে জোতদারদের বাড়িতে কিংবা কোন ধর্মীয় স্থানে[২৮],বিভিন্ন মেলায়, অনুষ্ঠানাদিতে কুশান যাত্রাপালায় অভিনয় করেছিলেন।

লেলিন উৎসব: গোসাইরহাটে সঙ্গীতচর্চার আর এক উজ্জ্বলতম দিন হলো 'লেলিন উৎসব'। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমরেশ চন্দ্র বর্মন জানাচ্ছেন যে, শীতলখুচি ব্লকের গোসাইরহাটের 'লেনিন উৎসব' কুচবিহার তথা পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ লেনিন উৎসব। ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের প্রধান নেতা তথা কমিউনিস্ট রাজনীতিবিদ ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ ওরফে লেলিনের জন্মদিন। এই

বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে গোসাইরহাটের কিছু কমিউনিস্ট নেতৃত্ববর্গ ১৯৭২ তে গোসাইরহাটের গড়খোলায় 'লেলিন উৎসব' উদযাপন করেন।[২৯] এরপর ১৯৭৭ এর দিকে গোসাইরহাট বন্দরে এই উৎসবটিকে নিয়ে আসা হয়। এরপর গোকুল সাহা মহাশয়ের দোকানের সামনে, অজিত সরকার মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির সামনে, পুরনো কলাহাটিতে, বিশ্ব প্রামাণিক মহাশয়ের বাড়ির সামনে এবং সবশেষ গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠে এই উৎসব উদযাপন করা হয়েছিল। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক বিশ্বনাথ প্রামানিক জানাচ্ছেন যে, এতদঞ্চলের শিল্প -সংস্কৃতির বিকাশ বিশেষ করে লোকশিল্পী, ভাওয়াইয়া শিল্পী, কবি, গল্পকার, চিত্রশিল্পী ইত্যাদি শিল্পী এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই বিকশিত হয়েছেন । তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, কুইজ প্রতিযোগিতা, রবীন্দ্র সংগীত প্রতিযোগিতা, নজরুল সংগীত প্রতিযোগিতা, নৃত্য প্রতিযোগিতা, ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতা, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, একাঙ্ক নাটক ইত্যাদি লেনিন উৎসবের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের স্বনামধন্য শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন এবং তাঁরা অনেক সুন্দর সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দিয়েছেন। যার কম্পন অনুভূত হয়েছে এখানকার সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের মনোজগতে । অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমান শিল্পী সমন্বয় লেনিন উৎসব থেকে অনেক কিছুই শিখতে পেরেছেন। শ্রদ্ধেয় শিক্ষক হরিনাথ বর্মন জানাচ্ছেন যে, বামফ্রন্ট সরকারের জামানায় গোসাইরহাট অঞ্চলের বিপরীতে একটি ভাওয়াইয়া সংগীতচর্চা কেন্দ্র ছিল। সঙ্গারবাড়ি মোড়ে নৃপেন বর্মনের উদ্যোগে 'শ্রীমণি সংগীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে এক সংগীত পর্ষদের অধীনে ছমাস অন্তর পরীক্ষার ব্যবস্থা হত। কৈলাস বর্মন, যামিনী বর্মন, শৈলেন বর্মন, জামালউদ্দিন আহমেদ প্রমুখ শিল্পীরা এই সংগীতচর্চা কেন্দ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন । যামিনী বর্মন, কৈলাস বর্মন প্রমূখরা এই সংগীত প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকের ভূমিকা পালন করেছেন। একসময়ের জনপ্রিয় বেতার শিল্পী যামিনী বর্মন[৩০] জানাচ্ছেন যে, ১০-১৫ বছর ধরে এই প্রতিষ্ঠানটি চলেছিল। এরপর তিনি ২০০০ সালের পরে দিকে 'উজান- ভাটি সংগীত বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন । মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত রাখালিয়া সংগীত বিদ্যালয়, উজান- ভাটি সঙ্গীতালয়, ডাকালিয়া সংঘ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান আজ সঙ্গীতচর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

ভাওয়াইয়া সঙ্গীত: গোসাইরহাট হাই স্কুলের মাঠ প্রাঙ্গণ যেন আরেক সাংস্কৃতিক যুগ সন্ধিক্ষণের সাক্ষী হয়ে ওঠে। কোচবিহার জেলার আদি এবং মূল জনগোষ্ঠী রাজবংশী। দেশভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আগত অসংখ্য মানুষের সঙ্গে ঘটেছে এই রাজবংশী সংস্কৃতির মিশ্রণ। সেই সংমিশ্রনের প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায় ভাওয়াইয়া সংগীতের ক্ষেত্রেও। এখানকার হিন্দু-মুসলমান সকলেই রাজবংশী সাংস্কৃতিক ধারায় পুষ্ট হয়ে এসেছে। তাদের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, মূল্যবোধ জীবন দর্শন সবই এক।[৩১] এর ফলে লোকসংস্কৃতির আঙ্গিনা ক্রমশ বিস্তৃত হয়ে ওঠে। 'ভাওয়াইয়া' শব্দের অর্থ সম্পর্কে স্বর্গীয় সুরেন রায় বসুনিয়া মহাশয়ের অভিমত হল যে, "ভাবপূর্ণ যে গীত মানুষকে ভাব বিহ্বল করে দেয়, তাই ভাওয়াইয়া" । ভাওয়াইয়ার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যেভাবে' অর্থাৎ ভাবুকের গান।[৩২] 'ভাওয়া' শব্দ থেকে ভাওয়াইয়া গানের জন্ম হয়েছে। 'ভাওয়া' মহিষের চারণ ক্ষেত্র, মহিষের চারণক্ষেত্রে মহিষের রাখালরা মাসের পর মাস মহিষ চড়িয়ে বেড়াতো এবং মহিষের পিঠে বসে দোতরা বাজিয়ে গান করত।[৩৩]আঞ্চলিক নামকরণ অনুসারে ভাওয়াইয়া গানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

(ক) চিতান ভাওয়াইয়া - বিচ্ছেদ বেদনায় ভেঙে পড়ার গান ।
(খ) ক্ষীরোল ভাওয়াইয়া - বিরহের প্রতীক এই ক্ষীরোল ডাং (stroke) গান । দোতরা বাজানোর সময় দেওয়া হয় ।
(গ) দরিয়া ও দীঘলনাসা ভাওয়াইয়া – দুটো দীর্ঘ প্রসারিত দমসাপেক্ষ সুর ।
(ঘ) গড়ান ভাওয়াইয়া — বিরহকাতর নারীর মত্ততার গান ।
(ঙ) মইধালী ভাওয়াইয়া — এ গানের চাল ভিন্ন ধরনের । কোনো কিছুর সোওয়ার হয়ে চলার ছন্দ এ গানে ।[৩৪]

তবে মূলত ভাওয়াইয়া গানে দুটো আঙ্গিকেই দেখা যায়, দরিয়া ও চটকা। যাইহোক, ভাওয়াইয়া সঙ্গীতচর্চা এতদঞ্চলে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। যদিও ভাওয়াইয়াগানের সম্রাট আব্বাসউদ্দিন কুচবিহারেরই মানুষ ছিলেন, তথাপি আলোচ্য অঞ্চলে তাঁর (জন্ম ১৯০১, বলরামপুর - মৃত্যু ১৯৫৯, ঢাকা)[৩৫] সমকালীন কিংবা কিছুটা পরবর্তী সময়েরও ভাওয়াইয়া শিল্পীর নাম পাওয়া যায় না। যাইহোক, ৭০ এর দশক থেকে এখন পর্যন্ত আলোচ্য অঞ্চলের যে কয়েকজন শিল্পীর নাম পাওয়া

যায়, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন স্বর্গীয় শ্রী প্রফুল্ল বর্মন, শ্রী সুশীল রায়, শ্রী ধীরেন বর্মন, শ্রী যামিনী বর্মন, শ্রী শিবেন্দ্র বর্মন, শ্রী সুরেশ বর্মন, শ্রী চরনারায়ণ বর্মন, জনাব গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, জনাব জামালউদ্দিন আহমেদ, শ্রীমতি কুহেলি বর্মন, শ্রীমতি পার্বতী বর্মন, শ্রীমতি একাদশী বর্মন, শ্রী সুশীল বর্মন, শ্রী সুবল বর্মন, শ্রী ধনঞ্জয় বর্মন, শ্রী জ্ঞানেন্দ্র নাথ বর্মন, শ্রী প্রশান্ত রায়, শ্রী গণেশ বর্মন, শ্রী যামিনী বর্মন(দোতারা), শ্রী রত্না বর্মন, শ্রী রত্না দাস সরকার, শ্রী ললিত বর্মন, শ্রী পবিত্র রায়, শ্রী প্রসেনজিৎ বর্মন, শ্রীমতি দীপিকা বর্মন এবং বর্তমান সময়ের আরো অনেক ভাওয়াইয়া ও বাদ্যশিল্পী রয়েছেন যারা এখানকার এবং বাইরে থেকে এখানে এসে সাংস্কৃতিক মঞ্চকে এক নতুন মর্যাদা দান করেছেন।[৩৬] ১৯৮৯ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের মন্ত্রী মাননীয় শ্রী দীনেশচন্দ্র ডাকুয়ার উদ্যোগে সারা উত্তরবঙ্গব্যাপী ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল।[৩৭] প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ২০২১ সালে রাজ্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত প্রতিযোগিতা গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানের শুভারম্ভ হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শ্রদ্ধেয় ড. আনন্দ গোপাল ঘোষ, ড. জয়ন্ত কুমার বর্মন, ড. জ্যোতির্ময় রায়, ড. পরিমল বর্মন প্রমূখ। এই রাজ্য ভাওয়াইয়া প্রতিযোগিতায় বিচারকের আসন অলংকৃত করেছিলেন জনাব কেরামত আলী (আসাম), রহিমা বেগম খলিফা (আসাম) এবং শ্রী শিবব্রত কর্মকার(কলকাতা) । এই প্রতিযোগিতায় যারা স্থান অধিকার করেছিলেন, তারা হলেন শ্রী পবিত্র বর্মন (প্রথম, দরিয়া বিভাগ এবং তৃতীয়, চটকা বিভাগ), শ্রীমতি টুম্পা বর্মন (প্রথম, চটকা বিভাগ), শ্রীমতি পাঞ্চালি রায় (দ্বিতীয়, চটকা বিভাগ), শ্রী শ্যামল বর্মন (দ্বিতীয়, দরিয়া বিভাগ), শ্রীমতি অনামিকা বর্মন (তৃতীয়, দরিয়া বিভাগ)[৩৮]। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অনেক বিশিষ্ট আমন্ত্রিত শিল্পী এই প্রতিযোগিতার মঞ্চকে আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এই অনুষ্ঠান উপভোগ করতে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ ভিড় জমিয়েছিল; সবমিলিয়ে গোসাইরহাটের ভাওয়াইয়া সঙ্গীতচর্চার ইতিহাসে এই দিনগুলি স্মরণীয় অধ্যায় হিসেবে লেখা থাকবে।

নাটক: ঐতিহাসিক যুগ থেকে রামায়ণ- মহাভারতের যুগ পর্যন্ত সময়কালে নাটকের যথার্থ এবং পূর্ণাবয়ব বিকশিত হতে শুরু করে[৩৯], যা স্বাধীনতা- উত্তরপর্বে আঞ্চলিক পরিসরেও রস আস্বাদনে জনসাধারণকে তৃপ্তি দান করে আসছে। আর

এই তৃপ্ততা গোসাইরহাটের সংস্কৃতিচর্চাকে পাদপ্রদীপের আলোয় এক নতুন পরিচিতি এনে দেয়। নাট্যকার দীপায়ন ভট্টাচার্য লিখেছেন যে, ১৯৫৩ সালে গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘ ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে অরূপ রায়চৌধুরী, সুভাষ শীল শর্মা, জগৎপতি ভাণ্ডারি, নৃপেন শীলশর্মা, তমাল দে প্রমুখের উদ্যোগে 'রানার', 'ডাকঘর', 'দেনা - পাওনা' প্রভৃতি নাটক বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ হয়েছিল।[৪০]ভানুলাল প্রামানিক, বিজয় ভুষণ রায়, প্রফুল্ল রায়, ধৈর্য নারায়ণ বর্মন প্রমূখ জাগৃতি সংঘের নেতৃত্ববৃন্দ আনুমানিক ষাটের দশক থেকেই নাট্যচর্চায় উৎসাহ দিয়ে আসছিলেন। কিছুটা পরবর্তীতে গোসাইরহাট জাগৃতি সংঘের সভাপতি তথা গোসাইরহাট হাই স্কুলের শিক্ষক স্বর্গীয় শ্রী ধৈর্য্যনারায়ণ বর্মন মহাশয়ের উদ্যোগে নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল গোসাইরহাটের বিভিন্ন স্থানে। শ্রী বিমল সূত্রধর মহাশয় জানাচ্ছেন যে, ৭০ এর দশকের শুরুতেও জাগৃতি সংঘ পরিচালিত এই নাটক দল যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। শ্রী কমলা সিংহ, শ্রী কার্তিক পাল, শ্রী প্রফুল্ল রায়, শ্রী বিমল সূত্রধর, শ্রী শ্যামল সূত্রধর প্রমুখ এই নাটক দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। 'ব্রাদার্স ইউনিট' নামে একটি ক্লাব ছিল বিজয় বাবুর কাছারি বাড়িতে। জয়ানন্দন রায় প্রমুখের উদ্যোগে এই ক্লাবটি তৈরি করা হয়েছিল। এই ক্লাবের পক্ষ থেকেও আটের দশকে বিভিন্ন নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল। সেগুলির মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হল সমরেশ বর্মন পরিচালিত নাটক - কিন্তু নাটক নয়[৪১], ১৯৬৮ সালে গোসাইরহাট হাই স্কুলের (স্কুলটি তখন ক্লাস ৮ পর্যন্ত ছিল) মাঠে মঞ্চস্থ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুকুট' নাটকটি । ওই বছরই রবীন্দ্রনাথের কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য'কে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল। সমরেশ চন্দ্র বর্মন, কামিনী বর্মন, দীপায়ণ ভট্টাচার্য প্রমূখ স্কুলের ছাত্ররা এতে অভিনয় করেছিলেন। সেই সময় গোসাইরহাট স্কুলের শিক্ষক রঞ্জিত ভৌমিক (বাড়ি গোসানিমারী) এর তত্ত্বাবধানে নাটকের আয়োজন করা হত । সেই সময় থেকেই প্রতিবছর গোসাইরহাট স্কুলে বেশ বড় করে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হতো।[৪২]

১৯৮০ র দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রামকৃষ্ণ সংঘের পরিচালনায় রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রতিবছর শ্রী প্রদ্যুত সাহা, শ্রী হরিনারায়ণ সরকার, শ্রী বিপ্লব রক্ষিত, শ্রী প্রদীপ সাহা, শ্রীমতি কল্পনা সরকার প্রমুখের উদ্যোগে পুরনো কলাহাটি অর্থাৎ কালী মন্দিরের সামনে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যাকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বরাবরেরই

আকর্ষণীয় একটি অংশ ছিল তাদেরই নিজস্ব নির্দেশনা ও পরিচালনায় অভিনীত নাটকের পরিবেশনা। উপর্যুক্ত ব্যক্তিরা নিজেরাই অভিনয় করতেন এবং আরো অনেককেই অভিনয় করতে উৎসাহ দিতেন। হরিনারায়ণ সরকার[৪৩] জানাচ্ছেন যে, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস মহাশয়ের উদ্যোগ ও নির্দেশনায় শ্রী জয় গোপাল সাহা, শ্রী রাধেশ্যাম সাহা, শ্রী হরি নারায়ন সরকার, শ্রী প্রদ্যুৎ সাহা প্রমূখ 'গরিবি হটাও' নাটকে অভিনয় করেছিলেন। ১৯৮৪ সালে নাটকটি প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল লেলিন উৎসবে, গোসাইরহাট হাই স্কুল সংলগ্ন গোকুল সাহা মহাশয়ের দোকানের সামনে। একটা সময় সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাস ও পরমানন্দ সাহা মহাশয়ের বাড়িতেই নাট্যচর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এছাড়াও আরো যারা সেই সময় এবং পরবর্তী সময়ে এই নাট্যজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম শ্রীমতি ঝুমা সাহা, শ্রীমতি কণা সরকার, শ্রীমতি চম্পা সাহা, শ্রী অজয় সরকার, শ্রী আনন্দ সাহা, শ্রী সীমন্ত সাহা, শ্রী তন্ময় সাহা, শ্রী প্রশান্ত সূত্রধর, শ্রী পঙ্কজ সাহা, শ্রী পঙ্কজ বিশ্বাস প্রমূখ। শ্রী প্রদ্যুৎ সাহা মহাশয় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে জানান যে, তাঁরা ১৯৮৮/১৯৯০ এর দিকে সামাজিক প্রেক্ষাপটের উপর 'পুরস্কার' নামে একটি নাটক তুফানগঞ্জ, মাথাভাঙ্গাসহ বিভিন্ন স্থানে মঞ্চস্থ করেছিলেন। যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল সেই নাটক। তাদের নাটক পরিবেশনের মূল লক্ষ্যই ছিল সমাজ সচেতনতা । আরো যে নাটকগুলো মানুষের হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উপর 'সেথুয়া', রবীন্দ্রনাথের 'দেনা- পাওনা', 'মরা', 'ডাকঘর', 'নটী বিনোদিনী' ইত্যাদি।[৪৪] বিপ্লব রক্ষিতের লেখা ও নির্দেশনায় 'খেলা' নাটকটি অভিনীত হয় মাথাভাঙ্গা নজরুল সদনে । প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, রামকৃষ্ণ সংঘের পক্ষ থেকে শ্রী হরিনারায়ণ সরকার এর সম্পাদনায় 'বলাকা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হত ১৯৯০ এর দশকে।[৪৫]

ড.আম্বেদকর মিউজিক কলেজ : সংস্কৃতিচর্চার আর এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয় বিশেষভাবে সক্ষম শ্রীকার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের হাত ধরে। তাঁর প্রচেষ্টাতেই ১৯৯৩ সালে গোসাইরহাটে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আম্বেদকর মিউজিক কলেজ' ।[৪৬] উল্লেখ্য যে, কার্তিকবাবুর বাপঠাকুরদা পূর্ববঙ্গীয় ছিলেন। পরবর্তী সময়ে কয়েকটি জায়গা ঘুরে গোসাইরহাট বন্দরে বসতি স্থাপন করেন। তিনি জানান যে, তাঁর পূর্বপুরুষরা সঙ্গীতচর্চার সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। সেই ধারা তাঁর বংশে আজও প্রবাহমান।

বর্তমানেও নিষ্ঠার সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে তাঁর কর্মযজ্ঞে সর্বোচ্চ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন শুধুমাত্র বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে এক সোনালী পর্বে উত্তরণের তাগিদে। তাঁর প্রত্যাশা তাঁর মিউজিক কলেজ থেকে কৃতি ছাত্র-ছাত্রীরা অদূর ভবিষ্যতে সারা ভারতবর্ষব্যাপী তো বটেই এমনকি বহির্ভারতেও সুনাম অর্জন করবে এবং সর্বোচ্চ খ্যাতির শীর্ষে আরোহন করবে। তাঁর এই প্রত্যাশা একেবারেই অমূলক নয়। তার খতিয়ান হলো জাতীয় স্তরে তবলায় রৌপ্যপদক পেয়েছেন পিংকু রায়, স্বর্ণপদক প্রাপ্ত অমিত সাহা, পদাবলীতে পুরস্কারপ্রাপ্ত নীলিমা সরকার, শ্রীখোলে বিশেষ সম্মানিত রাধেশ্যাম সাহা, রতন সাহা, আবৃত্তিতে স্বর্ণপদক পেয়েছেন সীমা সাহা, ভোকাল-ক্লাসিকালে পুরস্কারপ্রাপ্ত মাম্পি সরকার, ভাওয়াইয়া সংগীত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রামকুমার বর্মন, মীনাক্ষী বর্মন, পিংকি বর্মন । বলাবাহুল্য, উল্লেখিত শিল্পীরা প্রত্যেকেই কিন্তু স্থানীয় নন; জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এখানে এসে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন । কার্তিক চন্দ্র চক্রবর্তীর শিক্ষাগুরু জ্যোতির্ময় গুপ্ত (গোষ্ঠ বাবু) এই মিউজিক কলেজে দীর্ঘদিন যাবৎ শিক্ষকতার কাজ করেছেন। কার্তিকবাবু নিজেও একজন স্বনামধন্য তবলা শিক্ষক এবং এই কলেজের অধ্যক্ষ। এই মিউজিক কলেজের পক্ষ থেকে একটি বাৎসরিক পত্রিকা 'নবজাত নক্ষত্র', প্রকাশ করা হয়।[৪৭] এছাড়াও গরিব দু:স্থদের বস্ত্র দান, গুণী ব্যক্তিদের সম্বর্ধনাসহ বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি যুক্ত । আমরা আশাবাদী, যেভাবে আম্বেদকর মিউজিক কলেজ হাজারও প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে স্বমহিমায় এগিয়ে চলছে, তা একদিন বিশেষ পদমর্যাদায় উত্তীর্ণ হবে।

২০০৩ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় সংগীত পরিষদ পরিচালিত নৃত্য প্রতিযোগিতায় লোকনৃত্যে স্বর্ণপদক এবং রবীন্দ্র নৃত্যে ব্রোঞ্জপদক পেয়েছিলেন গোসাইরহাটের অন্যতম কৃতি সন্তান মৌমিতা পাল (সূত্রধর)। তিনি শিউলি চৌধুরী (কুচবিহার), বাবলি মুখার্জি (কুচবিহার) এবং গুরু রুনু ভট্টাচার্য (শিলিগুড়ি) কাছ থেকে নৃত্য শিখেছিলেন। মৌমিতা পাল সূত্রধর (১৫.০১.২৪ ইং) জানান যে, 'গুরু রুনু ভট্টাচার্যের কাছ থেকে শিখেই তিনি সর্বভারতীয় সংগীত পর্ষদ পরিচালিত প্রতিযোগিতায় প্রথম এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন।' পরবর্তী সময়ে সিকিমের গ্যাংটক, শিলিগুড়ি, কুচবিহার প্রভৃতি স্থানে রাজ্য সরকারের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়েছিলেন এবং মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান উপহার দিয়েছিলেন। তিনি ওই বছরেই নিজ

বাসগৃহে 'গীতি নৃত্যম' নামে একটি নৃত্যচর্চার বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং ২০১০ সাল পর্যন্ত তাঁর এই প্রতিষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গিয়েছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, 'গীতি নৃত্যম' এর শিক্ষার্থীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা ড. আম্বেদকর মিউজিক কলেজেই করা হত।

ধর্মচর্চার কেন্দ্র: ১৯৪৭-র পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে উদ্বাস্তু/শরণার্থীদের এতদঞ্চলে আগমনের ফলে একদিকে যেমন ভাষা-শিক্ষা-রাজনীতি- অর্থনীতিতে গভীর প্রভাব পড়েছে, অন্যদিকে তেমনি মিশ্র সাংস্কৃতিক আঙ্গিনা যে ব্যাপক বিস্তৃততর হয়েছে, তা আলোচ্য অঞ্চলের সর্বস্তরের মানুষ স্বীকার করেন। বলতে খুব উৎসাহ বোধ করি এই ভেবে যে, মানুষ তার সম্প্রদায় ভুলে একে অপরের সংস্কৃতিকে আলিঙ্গন করছেন। আর এখানেই আলোচ্য অঞ্চলের ধর্মালোচনার সার্থকতা।

১. গোসাইরহাট অষ্টপ্রহর: গোসাইরহাট বন্দর বাজার সংলগ্ন এলাকায় এক বিরাট অষ্টপ্রহর এর আয়োজন করেন অষ্টপ্রহর কমিটি। সত্তরের দশকে অষ্টপ্রহরের শুভ সূচনা ঘটেছিল বর্তমান গোসাইরহাট হাইস্কুলের বিপরীতে অর্থাৎ ব্যবসায়ী শিব সুন্দর সাহা মহাশয়ের বাড়ির স্থানে।[৪৮] আজ থেকে ৫০ বছর পূর্বে যার ভিত্তিমূল গড়ে ওঠে মূলত পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ থেকে আসা ছিন্নমূল এবং এখানকার কিছু স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায়। বলাবাহুল্য, এই ধর্মীয় উৎসব স্থানীয় স্তরে যেন তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। তবে মূলত ছিন্নমূল মানুষরাই এই ধর্মীয় উৎসবাদিতে অধিক নেতৃত্ব দান করে থাকেন। যাইহোক, অনুষ্ঠান চলাকালীন এত মানুষের সমাগম ও সমারোহে মেতে ওঠে গোটা গোসাইরহাট বন্দর এলাকা। সৎ হৃদয়বান মানুষের ভক্তি ও শ্রদ্ধা মাতিয়ে তোলে হিন্দু ধর্মের সব স্তরের মানুষকে। বিশিষ্ট ব্যবসায়ী স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল সাহা মহাশয় শুরু থেকে আমৃত্যু পর্যন্ত এই অষ্টপ্রহর কমিটির সম্পাদকের ভূমিকা পালন করে ছিলেন।[৪৯] এছাড়াও চানমন সাহা, জিতেন্দ্র কুমার সাহা এবং আরো অনেকেই এর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান অষ্টপ্রহর কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শ্রী স্বপন সাহা মহাশয় জানাচ্ছেন যে, দিবারাত্রি জেগে অষ্টপ্রহর শোনার আনন্দই আলাদা। ভক্তরা ভক্তিভরে প্রসাদ গ্রহণ করেন এবং জয়ধ্বনি দেন রাধা-কৃষ্ণের নামে। এতেই পরম তৃপ্তি- পরম আনন্দ।

এই অষ্টপ্রহর কমিটির অন্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যদের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী সুজন সাহা, শ্রী সুশীল বর্মন, শ্রী আনন্দ সাহা, শ্রী মদন চন্দ্র বর্মন[৫০] এবং আরো অনেকেই।

২. নাম সংকীর্তন সম্প্রদায়: স্বাধীনতা - উত্তরপর্বে গোসাইরহাটের বুকে বেশ কয়েকটি নাম সংকীর্তন সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ছিল। এই সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'কৃষ্ণদাসী সম্প্রদায়', 'গৌড়দাসী সম্প্রদায়', 'মদন মোহন সম্প্রদায়' এবং 'রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়'।'কৃষ্ণদাসী সম্প্রদায়ে'র যারা উদ্যোক্তা ছিলেন তাদের মধ্যে - রবীন্দ্র লাল সাহা[৫১], নিতাই সূত্রধর, মন্টু সূত্রধর, ঋষিকেশ সাহা, মঙলু বর্মন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এই দলের হারমনি মাস্টার হিসাবে জনপ্রিয় ছিলেন হরিদাস বর্মন । মূলত এদের উদ্যোগে ১৯৬০ এর দশকে 'কৃষ্ণদাসী সম্প্রদায়' তৈরি হয়েছিল। কিছুটা পরবর্তী সময়ে মিনু সূত্রধর, আরতি সূত্রধর, মায়া সূত্রধর, নির্মলা পাল, গুপী রায়, রাধেশ্যাম সাহা, মনা বর্মন, অনিল বর্মন এবং আরো অনেকেই এর সাথে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তী সময়ে এই কৃষ্ণদাসী সম্প্রদায় ভেঙে যায় এবং ৮০'র দশকে 'গৌড়দাসী সম্প্রদায়' গড়ে ওঠে। যার উদ্যোক্তা ছিলেন গোকুল সাহা[৫২]। উল্লেখ্য যে, এই সম্প্রদায় পুরুষদের নিয়েই তৈরি করা হয়েছিল। 'কৃষ্ণদাসী সম্প্রদায়ে'র কিছু পুরুষ সদস্য এবং পরবর্তীতে ভগীরথ সাহা, প্রাণেশ পাল, নিতাই সাহা প্রমুখকে নিয়েই এই দল গঠন করা হয়েছিল।[৫৩]

পরবর্তী সময়ে সাক্ষী গোপাল সাহা মহাশয়ের উদ্যোগেই 'মদনমোহন সম্প্রদায়' গড়ে ওঠে।[৫৪] এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন প্রহ্লাদ অধিকারী। অনুমিত হয়, উপরে উল্লেখিত 'গৌরদাসী সম্প্রদায়' জনপ্রিয়তা হারালে এই সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে এবং 'গৌড়দাসী সম্প্রদায়ে'র অনেক সদস্যই এই সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুক্ত হন।[৫৫] সমকালীন সময়ে তরণী মোহন বর্মনের পৃষ্ঠপোষকতায় 'রাধাকৃষ্ণ সম্প্রদায়' নামে আরও একটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল।

৩. গোসাইরহাট সৎসঙ্গ বিহার : গোসাইরহাট গরুহাটি সংলগ্ন এলাকায় স্থাপিত সৎসঙ্গ বিহারটি আজ এক তীর্থভূমিতে পরিণত হয়েছে। সম্ভবত এই সৎসঙ্গ বিহারটি কুচবিহার জেলার সর্ববৃহৎ সৎসঙ্গ বিহার। গোসাইরহাট হাই স্কুলের

(পূর্বতন গোসাইরহাট এম. ই. স্কুল) বর্তমান বয়োজ্যেষ্ঠ প্রাক্তনী তথা তৃতীয় শ্রেণীর বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম স্থানাধিকারী এবং সেজন্য কুচবিহার রাজ্যের মহারাজা কর্তৃক পুরস্কারপ্রাপ্ত পরমানন্দ সাহা মহাশয়ের দানকৃত ভূখণ্ডে সৎসঙ্গ বিহারটি গড়ে উঠেছে।[৫৬] তবে মন্দিরের ভিত্তিভূমি অনেক আগেই স্থাপিত হয়েছিল বর্তমান গোসাইরহাট বন্দরের আশ্রমপাড়া নামক স্থানে। শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের অন্যতম অনুরাগী এবং ঋত্বিক শ্রী বিজয়ভূষণ রায়ের বাড়িতেই গোসাইরহাট বন্দরের সৎসঙ্গ বিহারের যাত্রা শুরু হয়। উল্লেখ্য যে, শ্রী ধনমোহন বর্মন, শ্রী বিজয় ভূষণ রায় - প্রথম দুইজন শ্রী শ্রী ঠাকুরের ঋত্বিক ছিলেন। যাইহোক, শ্রী বিজয়ভূষণ রায়ের মৃত্যুর পরে মন্দির স্থাপন নিয়ে তাঁর উত্তরসূরিদের সঙ্গে একটা মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে তৎকালীন সৎসঙ্গবাসী মন্দির স্থাপনের জন্য বিকল্প স্থান খুঁজতে শুরু করেন। শ্রী পরমানন্দ সাহা, শ্রী সুনীল রায় প্রামানিক, শ্রী সুবোধ চন্দ্র বর্মন, শ্রী হরিনাথ বর্মন এবং আরো অনেকেই সৎসঙ্গ বিহার স্থাপনের জন্য বর্তমান মন্দির স্থাপিত জমিটি শনাক্ত করেন।[৫৭] জমিটি আড়াই বিঘা ছিল শ্রদ্ধেয় শ্রী পরমানন্দ সাহার। ঋত্বিক শ্রী সুভাষচন্দ্র বর্মন[৫৮] জানাচ্ছেন যে, ১৯৯৭ সালে মেজদা[৫৯] মন্দির পরিদর্শনে এসেছিলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, সৎসঙ্গ আশ্রমটি পূর্বে গোসাইরহাটের যে স্থানে ছিল, সে স্থানটি আজ 'আশ্রমপাড়া' নামে পরিচিত।[৬০]

সর্বজন শ্রদ্ধেয় মিশুক স্বভাবের হৃদয়বান মানুষটি ১৯৯৭ সালে[৬১] মন্দিরের নামে জমিটি দানপত্র করে দিতে কোনো রকম কার্পণ্য করেননি। এমনকি মন্দির যাতে পর্যাপ্ত জমির উপর গড়ে উঠে সেজন্য উপর্যুক্ত আড়াই বিঘা জমির সঙ্গে আরও দেড় বিঘা জমি (মোট জমির পরিমাণ ১০৫ ডেসিমাল) কিনে মন্দিরের জন্য দান করেন। তবে শিক্ষক শ্রী হরিনাথ বর্মন মহাশয় পরমানন্দ সাহাকে দারুণভাবে উৎসাহিত করেছিলেন মন্দিরের জন্য জমিটি দান করতে। শুরুতে বর্তমান মন্দিরটিতে একটি টিনের চালা ঘর তৈরি করা হয়েছিল। শ্রী মনোরঞ্জন বর্মন নামে একজন স্থানীয় গুরুভাই দেখাশোনার জন্য সেখানে থাকতেন। মাটির ঘরেই সকাল ও সান্ধ্যকালীন প্রার্থনা জমে উঠত। এরপর সেখানে প্রাইভেট শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের পঠন-পাঠনের জন্য অবৈতনিক শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় মন্দির কমিটির উদ্যোগে। নিঃসন্দেহে এতে এলাকার অনেক ছেলে মেয়ে উপকৃত হয়েছিল। এরপর ২০১৬ সালে দেওঘর থেকে শ্রদ্ধেয় বাবাইদা[৬২] এখানে এসে শ্রীমন্দির তৈরীর

অনুমতি দেন। শ্রদ্ধেয় শ্রী বাবাই দাদার নির্দেশানুসারে ইঞ্জিনিয়ার শ্রী দীপ্ত বণিক মহাশয় বর্তমান শ্রীমন্দিরের পরিকাঠামো নির্মাণে যুক্ত হন। এমনকি দেওঘর থেকেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কিভাবে শ্রীমন্দির নির্মাণের জন্য দান গ্রহণ করতে হবে। বর্তমান 'গোসাইরহাট সৎসঙ্গ বিহার'টি কোচবিহার জেলার বৃহত্তম সৎসঙ্গ বিহার। এই মন্দিরটি তৈরিতে এক কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছে। ২০২৩ সালের ১২ ই ফেব্রুয়ারি সৎসঙ্গ বিহারটি উদ্বোধনের দিন ২৫ থেকে ৩০ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল।[৬৩] কুচবিহার তো বটেই, রাজ্য এমনকি রাজ্যের বাইরে থেকেও ভক্তরা উৎসবাদিতে ও মনোজ্ঞ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে থাকেন । এক্ষেত্রে ঠাকুরবাড়ির একটি নিয়ম আছে যে, যে তারিখে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে, সেই তারিখেই সেই মন্দিরের সর্ববৃহৎ অনুষ্ঠান হিসেবে পালন করা হবে। শ্রী পরমানন্দ সাহা, ঋত্বিক শ্রী সুবোধচন্দ্র বর্মন, ঋত্বিক শ্রী সুনীল রায় প্রামানিক, শ্রী গৌতম সাহা, শ্রী চন্দন পাল, শ্রী সুরেশ বর্মন, শ্রী সুধাংশু দেবনাথ, শ্রী ধনচন বর্মন, শ্রী স্বপন বর্মন, শ্রী কামিনী প্রামাণিক, শ্রী বীরেন বর্মন, শ্রী ধনঞ্জয় বর্মন এবং আরো অনেকেই সৎসঙ্গ বিহারটি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।[৬৪] এই মন্দির কমিটির তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সেবামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়ে থাকে। সাধারণ মানুষ যাতে বিনামূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পান তার জন্য নিয়ম করে একজন হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বর্তমানে সৎসঙ্গ বিহার প্রাঙ্গনে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন বসেন। শুধু তাই নয়, নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে গোসাইরহাটবাসীকে সচেতন করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েই মন্দির কমিটি সর্বান্তকরণে আজীবন তাদের কর্মধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

৪. ইসকন মন্দির: ধর্মচর্চার আর এক লালন ভূমি হল গোসাইরহাট বন্দরের ইসকন মন্দির (আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ)। মন্দিরটির বর্তমান অবস্থান গোসাইরহাট সাঙ্গার বাড়ি মোড়ের পাশে। শ্রদ্ধেয় শ্রী সুকারু বর্মন জানাচ্ছেন যে, বর্তমান ইসকন মন্দির যেখানে অবস্থিত সেখানে আগে মাশান ঠাকুর, কালী ঠাকুর, বুড়ি ঠাকুর, পাগলাপীর, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা হত। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, তা হল এই ঠাকুরগুলো মূলত এতদ্অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মানুষের পূজনীয় দেবতা। কিন্তু কালক্রমে এইসব ঠাকুরের পূজার পরিবর্তে অতি সম্প্রতিককালে উক্ত স্থানে কিছু স্থানীয় উদ্যোগী মানুষ ইসকনের ভাবধারায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠায়

উদ্যোগ নেন। যে জমির উপর এই মন্দিরটি তৈরি হয়েছে সেই জমিটি গোসাইরহাট হাই স্কুলের সহকারী শিক্ষক স্বর্গীয় ধৈর্য নারায়ণ বর্মন ও উপর্যুক্ত বিষ্ণুপদ অপেরার ম্যানেজার স্বর্গীয় ভবেন বর্মনের ছিল বলে জানা যায়।[৬৫] যাইহোক, উদ্যোগী মানুষের মধ্যে অন্যতম হলেন শ্রী কমলা বর্মন, শ্রী বিজয় বর্মন, শ্রী অখিল রায়, শ্রী নিপেন বর্মন, শ্রী মধু মঙ্গল প্রভু প্রমূখ।[৬৬]অনুমিত হয় যে, এনারা বেশিরভাগই ওপার বাংলা থেকে এসে কোনো এক সময়ে এতদঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে রবীন্দ্রলাল সাহা এই মন্দিরের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। যাইহোক, এই ইসকন উৎসবটিকে কেন্দ্র করে এবারই প্রথম মেলার আয়োজন করা হয়েছিল। এই ইসকন মন্দিরের পাশ দিয়ে একটি নালা প্রবাহিত। স্থানীয় অঞ্চলে কিছু বিহারী মানুষ বসবাস করায় ছট পূজার দিন মন্দিরের পাশেই এই নালাটি ধর্মচর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষজন এই পূজার দ্বারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট এবং এদিনটিকে তারাও মহাসমারোহে উদযাপন করে থাকেন।

৫. মসজিদ: গোসাইরহাট কলাহাটি নামক স্থানে একটি মসজিদ রয়েছে। সেখানে নিয়মিত নমাজ পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। ক্ষেত্র সমীক্ষায় জানা যায় যে, দূর দূরান্ত থেকে যারা গোসাইরহাটে বাণিজ্যের জন্য আসেন, মূলত তাদের কথা মাথায় রেখেই ততকালীন বামফ্রন্ট শাসনকালের শেষের দিকে স্থানীয় নেতৃত্বের সহযোগিতায় এই মসজিদটি তৈরি করা হয়।[৬৭] বর্তমান এই মসজিদের ইমাম হলেন কাশেম আলী মিয়া।[৬৮]

মেলা: গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত আওতাধীন এলাকায় বেশ কিছু মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে স্বাধীনতার পূর্ব ও পরবর্তী সময় থেকে। এই মেলাগুলি স্থানীয় মানুষজন ও কতকগুলো মেলা স্থানীয়- শরণার্থী/উদ্বাস্তু মানুষদের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়ে আসছে। এই মেলাগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে নিম্ন তুলে ধরার চেষ্টা করা হলো :

গোসাইরহাট গরুহাটিতে অবস্থিত সাতহাত কালী মন্দির। শুরুতে এই পুজোর সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, তারা হলেন বিষ্ণুপদ রায়, উমাকান্ত বর্মন, মাধব বর্মন, ভরত

বর্মন, যামিনী মোহন বর্মন প্রমূখ। বর্তমান যেখানে পূজোটি অনুষ্ঠিত হয়, তার উত্তর - পূর্ব দিকের একটি স্থানে মাধব বর্মন এই পূজোর শুভ সূচনা করেছিলেন।[৬৯] সত্তরের দশকের শেষে কিংবা আশির দশকের শুরুতে এই মন্দিরটি বর্তমান স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয় বলে জানা যায়।[৭০] এই পুজো উপলক্ষ্যে একটি মেলার আয়োজন করা হয়। এই পূজায় ভক্ত সাধারণের অনেক মানস থাকে। কবুতর, পাঠা ইত্যাদি বলি হিসেবে প্রদত্ত হয়। ১৫ থেকে ১ মাসব্যাপী এই মেলা চলতে থাকে। একটা সময় বেশ জমজমাট ছিল এই মেলা। দূর দূরান্ত থেকে সার্কাস, পুতুল নাচ[৭১] ইত্যাদি আসতো। এখন স্থানীয় মানুষজনই মূলত দোকানপাট নিয়ে বসেন এবং তাছাড়াও মেলায় বিভিন্ন ধরনের দোকানের পাশাপাশি নাগরদোলা, লটারি, এমনকি জুয়া খেলার আসরও বসে।

গোসাইরহাট গরুহাটি সংলগ্ন এলাকায় আরো একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয় । মেলাটির নাম ধোধ্বোরার পাড়ের মেলা। এই মেলাটিও অনেক প্রাচীন। এই মেলার উদ্যোক্তা হিসাবে যাদের নাম জড়িয়ে রয়েছে, তাঁরা হলেন পেন্টু চন্দ্র বর্মন, মিন্টু বর্মন, ভগীন্দ্র নাথ বর্মন, গিরিন্দ্রনাথ বর্মন[৭২], গোবিন্দনাথ বর্মন, ক্ষীরোদচন্দ্র বর্মন, মদন চন্দ্র বর্মন, সুরেন্দ্রনাথ বর্মন, মনোরঞ্জন বর্মন, ভাদাং বর্মন প্রমূখ। মেলাটি একেবারে শ্মশানঘাট লাগোয়া। এই শ্মশানে শ্মশানকালীর পূজা হয়ে থাকে। এখানে প্রত্যেক বছর অসংখ্য পাঠা ও কবুতর বলি হয়। কয়েকদিন যাবৎ মেলা চলতে থাকে। একটা সময় এই মেলায় কুষান গান যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল।[৭৩]

গোসাইরহাট বন্দরের ব্যাঙ মাথার পুল নামক স্থানে রাস্তা লাগোয়া একটু শ্মশান রয়েছে। বিংশ শতকের ষাটের দশকে স্বর্গীয় নিধন বর্মন, জাদুরাম বর্মন, কর্ণপ্রসাদ বর্মন, দীননাথ বর্মন, কালীনাথ বর্মন, হরেন্দ্র বর্মন, উপেশ্বর বর্মন প্রমুখের উদ্যোগে শ্মশানের উত্তর-পূর্ব কোণে বাসন্তী পূজা ও কালী পূজা উপলক্ষে চৈত্র মাসে এই চড়ক মেলার শুভ সূচনা হয়েছিল। পূজো কমিটির অন্যতম সদস্য যামিনী বর্মন[৭৪] জানাচ্ছেন যে, "বর্তমান এই মেলায় চড়কের আয়োজন করা হয় না। তবে ১০ থেকে ১৫ দিন যাবৎ এই মেলা চলে।" এই মেলায় খুব বেশি দোকানপাট বসে না ; বলা ভালো মেলাটি তার পূর্বের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলেছে।

গোসাইরহাট হাসপাতাল পাড়া এলাকায় রাস পূর্ণিমা উপলক্ষে একটি রাস মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তিন দশকের অধিক সময়কাল ধরে এই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম নিরোধ বর্মন, সুরোধ বর্মন, চণ্ডী পাল, মেঘা সাহা, অন্নদামোহন বর্মন(ডাক্তার), শচীন বর্মন[৭৫], নারায়ণ বর্মন, মহেশ বর্মন, খগেন শীল, বাবু বর্মন, খোকা বর্মন, যোগেশচন্দ্র বর্মন, মন্টু বর্মন[৭৬], পরিমল বর্মন[৭৭], সুরিন বর্মন, গণেশ বর্মন, সুকারু বর্মন[৭৮] (মেকার),বিমল বর্মন এবং আরো অনেকেই।[৭৯] শুরুতে যে উৎসাহ নিয়ে মেলাটি আরম্ভ হয়েছিল, সেই উদ্যোগ ও উৎসাহ আজ আর তেমন চোখে পড়ে না। বর্তমানে মেলাটি দিন দিন জুয়া খেলা নির্ভর হয়ে পড়ছে । বলতে পরোয়া নেই যে, আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখিত অধিকাংশ মেলাই আজ জুয়া নির্ভর; সুসভ্য ভাবুক চিন্তক সমাজ যদি এই জুয়া সংস্কৃতি বন্ধের উদ্যোগ না নেন, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতি এক বিষাক্ত সংস্কৃতিতে পরিণত হবে।

গোসাইরহাট খুটামারা সেতুর নিচে শ্মশানের পাশে প্রতি বছর একটি বারণী মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে । জানা যায় যে, আজ থেকে ১০০ বছর আগে মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে শ্যামচরণ বর্মন, রাজচন্দ্র অধিকারী প্রমুখের পরিচালনায় মেলাটির শুভারম্ভ হয়েছিল।[৮০] খুটামারার উত্তর দিক ও এগারো মাইল সংলগ্ন এলাকার মানুষজনের যৌথ উদ্যোগে মেলাটির আয়োজন হয়ে থাকে। মেলাটি সাত দিন ধরে অনুষ্ঠিত হয়। তবে কখনো কখনো সর্বনিম্ন তিনদিনও অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। বর্তমান লেখকের অভিজ্ঞতা রয়েছে যে, ফাল্গুন চৈত্র মাসে চাষিরা মাঠ থেকে তামাক তোলার পরেই মেলার আয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু এই সময়কালে হঠাৎ কালবৈশাখী ঝড়ের তান্ডবে যথেষ্ট উদ্যোগ আয়োজন থাকা সত্ত্বেও সমস্ত কিছুই নষ্ট হয়ে যায় । এতে ব্যবসায়ীরা যথেষ্ট সম্মুখীন হন।

গোসাইরহাট বড় ধাপের চাত্রা তথা বড় ধাপের চাত্রা জুনিয়র হাই স্কুলের পাশেই একটি উঁচু ধাপে বসন্তকালীন দুর্গোৎসব প্রতিবছর হয়ে আসছে।[৮১] তবে এই মেলাটি কত প্রাচীন তা স্পষ্ট নয়। ক্ষেত্র সমীক্ষা দেখা গেছে যে, বয়োজ্যেষ্ঠরাও তাঁদের পূর্বপুরুষের কাছে জানতে পারেননি বসন্তকালীন এই উৎসবটি কত পুরনো। মূলত

স্থানীয় লোকজনের উদ্যোগে এই মেলা চার দিন যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কোনো কোনো বছর স্থানীয় শিল্পী সমন্বয়ে যাত্রাগানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৮২]

বুড়া ধরলার তীরে ত্রয়োদশী তিথিতে আয়োজিত পাঁচ কইন্যার থানের মেলা তথা গঙ্গা বারুনী মেলা । ১৯৭০ এর দশক নাগাদ প্রধান উদ্যোক্তা খোকা বর্মনের[৮৩] জমিতে সুরেন্দ্রনাথ বর্মন, কান্দুরা বর্মন, শরৎচন্দ্র বর্মন প্রমুখের উদ্যোগেই প্রথম এই মেলার শুভ সূচনা ঘটে। পরবর্তী সময়ে অনিল চন্দ্র বর্মন[৮৪], বিজয় বর্মন, ভবেন্দ্রনাথ বর্মন, নবকুমার বর্মন, কনেশ্বর বর্মন প্রমুখরা এই মেলা পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। হাতির উপর পাঁচজন কন্যা ঠাকুর পূজা, গঙ্গা পূজা ও মাসান পূজা একই সময় হয়ে থাকে। বর্তমানেও গোসাইরহাট ও ভাঐরথানা অঞ্চলের বাসিন্দারা যৌথভাবে এই মেলার আয়োজন করে থাকেন। এখানেও মেলা উপলক্ষে গান বাজনার আয়োজন করা হয়ে থাকে।[৮৫]

গোসাইরহাট মহাকালের ধামে চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রতিবছর একটি চড়ক মেলার আয়োজন করা হয়ে থাকে। আশির দশকের শেষেও এই মেলা যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। বড় বড় স্থানীয় শিল্পীরা বিশেষ করে মহিন গিদাল, ললিত গিদালের কুষাণ গান যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। সে সময় ৩-৪ দিনব্যাপী মেলা অনুষ্ঠিত হত ।[৮৬] জানা যায় যে, এক সময়ে মহাসমারোহ আয়োজিত হয়ে থাকলেও বর্তমানে কিন্তু এই মেলা তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।[৮৭]

গোসাইরহাট হাসপাতাল পাড়ার পিছনে অনুষ্ঠিত তিমনির বারণী মেলা অনেক প্রাচীন। জানা যায় যে, স্বাধীনতার অনেক পূর্ব থেকেই মেলাটি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত গড়ে উঠেছিল এই মেলার মধ্য দিয়ে। হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে মেলা আয়োজনের উদ্যোগ গ্রহণ করতেন। ৮৫ উর্ধ্ব সতেশ্বর বর্মন জানাচ্ছেন যে, খিজিন বর্মন, গোড্ডা বর্মন, জগিন বর্মন (বড়), জগিন বর্মন(ছোটো), নন্দেশ্বর বর্মন, নরে বর্মন, ইব্রাহিম মিয়া প্রমুখের উদ্যোগে মেলাটি আয়োজিত হয়েছিল। মেলাটি খুটামারা নদীর তীরে অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় একটা সময় ছিল্লান[৮৮] হত। পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বরখাতা থেকে এখানে বড় বড় দোকানপাট আসত । বেশ কয়েকদিন

যাবৎ চলত মেলা। কিন্তু মেলাটি আজ তার জনপ্রিয়তা হারিয়েছে। তার পুরনো চাকচিক্য আজ আর নেই।

গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শতাব্দী প্রাচীন একটি মেলা হুলির ডাঙ্গার মেলা। বৈকুণ্ঠ নাথ রায়, ভদ্রমোহন বর্মন, ভিভিন বর্মন প্রমুখের উদ্যোগে ধাপের যাত্রা এ. পি. বিদ্যালয়ের মাঠে এই মেলাটির শুভ সূচনা ঘটেছিল। রাধাকৃষ্ণের দোলযাত্রা উপলক্ষে দোল পূর্ণিমায় মেলাটির শুভারম্ভ হয়ে থাকে। ঐতিহ্যবাহী এই মেলায় একসময় জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দোকানপাট আসতো এবং প্রচুর মানুষের সমাগম হত। বর্তমান পূজো কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গৌতম কুমার রায়[৮৯] জানাচ্ছেন যে, তাঁরা বংশ পরম্পরায় এই পূজোয় পৌরোহিত্যের ভূমিকা পালন করে আসছেন ।

এছাড়াও, বিএড কলেজের পাশে মাশান মেলা, সন্তোষী মোড়ের মেলা, গোসাইরহাট বাজারের শিব মেলা, ভাবের হাটের শিব মেলা[৯০] এবং এধরনের আরো বেশ কিছু মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অতি সাম্প্রতিককালে গোসাইরহাট গরুহাটির বোতল ভাঙার মাঠে একটি চড়ক মেলা আয়োজন করা হয়ে থাকে। রামকৃষ্ণ সংঘ, জাগৃতি সংঘ পরিচালিত সাংস্কৃতিক উৎসব গোসাইরহাট বন্দরকে এক সাংস্কৃতিক বিশিষ্টতা প্রদান করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই মেলাগুলো কোনোটি জনপ্রিয়, কোনোটি বা জনপ্রিয়তা হারিয়েছে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আলোচ্য প্রবন্ধে অনালোচিতই রয়ে গেল। কিন্তু যে কথা না বললে অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে, তা হলো উপর্যুক্ত মেলাগুলিতে এক ধরনের অপ-সংস্কৃতি বাসা বেঁধেছে, প্রায় প্রতিটি মেলাতেই বেশ বড়সড়ো জুয়ার আসর বসানো হয়। আর তার ওপর নির্ভর করেই মেলা কমিটিগুলো মেলা করার সাহস দেখান । এতে বর্তমান প্রজন্ম যেমন জুয়া খেলায় আরো বেশি করে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন, তেমনি খুব শীঘ্রই এই অপ-সংস্কৃতি বন্ধ করা না হলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে অনেক বড় মূল্য দিতে হবে, যা নিঃসন্দেহে সামাজিক অধঃপতনের অন্যতম কান্ডারী হয়ে উঠবে।

দুর্গোৎসব : প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে দুর্গাপূজার প্রচলন ছিল। আধুনিককালে এই পূজার প্রবণতা আরো বেড়ে যায়। একটা সময় এই পূজা শুধুমাত্র রাজবাড়ী, জমিদার বাড়ি ও ধনী ব্যক্তিদের বাড়িতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কুচবিহার রাজ্যে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই দুর্গা পূজার প্রচলন ঘটে। মহারাজা নরনারায়ণের (১৫৩৩ - ১৫৮৭ খ্রিষ্টাব্দ) উদ্যোগে কুচবিহার রাজ্যে দুর্গাপূজার শুভারম্ভ ঘটে।[৯১] স্বাধীন- উত্তর পর্বে আলোচ্য অঞ্চলে এই পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। তবে এখন এই পূজা পাড়ায় পাড়ায়, ক্লাবে ক্লাবে, এমনকি অলিতে গলিতেও হয়। দ্বিধাহীন চিত্তে বলা যায় যে, দেশে-বিদেশে যেখানেই বাঙালিরা পৌচ্ছাছেন, সেখানেই আজকাল দুর্গাপূজা করা শুরু হয়েছে এবং হচ্ছে।[৯২] নিঃসন্দেহে এরফলে দেশীয় সংস্কৃতি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক আঙ্গিনায় এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে। লক্ষণীয় যে, জলপাইগুড়ি, কুচবিহারের কোনো কোনো অংশে ভান্ডানী পূজার প্রচলন থাকলেও আলোচ্য অঞ্চলে ভান্ডানী পূজার প্রচলন নেই ।

বর্তমানে গোসাইরহাট বন্দরে বেশ কয়েকটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে পুজোগুলো একেবারেই ইদানিংকালের নয়। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি পূজো বেশ পুরনো। গোসাইরহাট গাছতলার দুর্গাপূজা এই পূজোগুলোর মধ্যে প্রাচীনতম বলা যায়।[৯৩] এই পূজোটা কত পুরনো তা কেউ নির্দিষ্ট করে বলতে পারেন নি। মনিন্দ্র নাথ রায়[৯৪] জানাচ্ছেন যে, বিদ্যা বর্মন (মাড়েয়া), অহিন্দ্র কুমার রায়, ধীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বরা আজ থেকে ৬০ বছর আগে এই পূজোয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। তবে এনারা এই পুজোর প্রতিষ্ঠাতা নন। মনিন্দ্র নাথ রায় নিজেও কুড়ি বছর এই পুজো কমিটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর আক্ষেপ যে, একটা সময় এই পূজো উপলক্ষে বেশ জাঁকজমকপূর্ণ একটি মেলার আয়োজন করেছিলেন। কিন্তু আজ আর তার কোন অস্তিত্ব নেই। বর্তমান পূজো কমিটির সভাপতি শিবু বর্মন, সম্পাদক পলাশ ঋষি এবং কোষাধ্যক্ষ দিলীপ কুমার বর্মন।

গোসাইরহাট আশ্রম পাড়ার দুর্গাপূজা এবার ৩৩ বছরে পদার্পণ করল। এই পূজোর শুরুটা একটু অন্য রকমের। এই পূজোর সদস্যরা আগে গাছতলার দুর্গাপূজোর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু একটি ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে তিক্ততার সৃষ্টি হয়। কল্যাণ রায় জানাচ্ছেন যে, প্রত্যেক বছরের ন্যায় সে বছরেও বিয়াওদারি- অবিয়াওদারি

ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। উভয় দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয়, যে দল জয়যুক্ত হবে, তারা কুড়ি টাকা পুরস্কার পাবেন । কিন্তু উভয় দলের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি হয় আর সেখান থেকেই আশ্রম পাড়ার দুর্গাপূজার উদ্যোগ গ্রহণ পর্ব শুরু হয়। দূর্গা পূজার ১০/১৩ দিন পূর্বে সিদ্ধান্ত হয় যে, তারা নতুন করে দুর্গাপূজা করবেন। যাইহোক, মূলত ফুটবল টিমের অবিয়াওদারি সদস্যরাই এই পূজোর উদ্যোক্তা ; তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জয় নন্দন রায়, গজেন বর্মন, কল্যাণ রায়, সন্তোষ রায়, ভোলা রায়, বিষ্ণু প্রসাদ রায় এবং আরো অনেকেই।[৯৫] বর্তমান পূজো কমিটির সভাপতি গীতা সিংহ, সম্পাদক রাধারানী সিংহ এবং কোষাধ্যক্ষ উত্তরা বর্মন ।[৯৬]

গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠের পূজো বেশ কয়েকবার শীতলকুচি ব্লকের সেরা পূজোর শিরোপা পেয়েছে। ৫৫ বছরের পুরনো এই পূজাটি যাদের সক্রিয় সহযোগিতায় শুরু হয়েছিল, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গোসাইরহাট হাইস্কুলের প্রাক্তন সহকারী শিক্ষক স্বর্গীয় তাপস চৌধুরী, বসন্ত সাহা, মেঘা সাহা, ভক্ত সাহা, অনিলচন্দ্র রায় সূত্রধর, মন্টু রায় সূত্রধর, গোকুল সাহা, সুনীল কুমার সাহা, উত্তম কুমার সাহা, জিতু সরকার প্রমূখ।[৯৭] এই পূজোর শুভারম্ভ হয়েছিল বর্তমান গোকুল সাহা মহাশয়ের দোকানের সামনে একটি টিনের চালা ঘরে। বলাবাহুল্য, আজ থেকে ৫৫ বছর পূর্বের দুর্গাপুজো এবং এখনকার দুর্গাপূজার মধ্যে উদ্যোগ- আয়োজনের তফাৎ কিন্তু আসমান জমিন। এখনকার মত আলোর ছটা তখনকার দিনে অপ্রত্যাশিত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৯ সালে গোসাইরহাট বন্দরবাসী প্রথম বৈদ্যুতিক তারযুক্ত বাতি জ্বালানোর সুবিধা পান।[৯৮] যাইহোক, বর্তমানে এই পূজো কমিটির সভাপতি হলেন শ্রীমন্ত সাহা, সম্পাদক গিরি সাহা, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ জগন্নাথ সাহা ও সীমান্ত পাল। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, গোসাইরহাট হাই স্কুল মাঠে গত ১০ বছর থেকে ৪০-৪৫ টি দোকানের সমারোহে একটি জাঁকজমক মেলা বসছে ; যার ফলে গোসাইরহাট গাছতলার দুর্গোৎসবের চিরাচরিত মেলার যে জনপ্রিয়তা, তা উপর্যুক্ত হাই স্কুল মাঠের পূজোর মেলার প্রাণকেন্দ্রে স্থানান্তরিত হয়েছে।

৪০ এর দশক থেকেই স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র রায়ের ব্যক্তিগত উদ্যোগে তাঁর বাড়িতে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে । মহেশচন্দ্র রায়ের পৌত্র তপেন্দু নারায়ন রায়[৯৯] জানাচ্ছেন

যে, স্বর্গীয় মহেশচন্দ্র রায়ের আদি বাড়ি ডাকালীহাটের আবুয়ার পাথারে চৈতা দেবী(বাসন্তী পূজা)র পূজা হত। ১৯৩৮/৩৯ সালে মঁহেশ চন্দ্র রায়ের সাথে গোসাইরহাট নিবাসী নিঁন্দেশ্বরী বর্মনের বিয়ে হয়। বিয়ের পরবর্তী সময়ে মহেশচন্দ্র রায় তাঁর শ্বশুরবাড়ি এলাকা অর্থাৎ গোসাইরহাটে বাস করতে শুরু করেন। তার ঠিক দু/এক বছর পর মহেশচন্দ্র রায় গোসাইরহাটের বাড়িতে শারদীয়া দুর্গা পূজার প্রচলন করেন। ১৯৮৪ সালে মঁহেশচন্দ্র রায়[১০০] মারা যান। তাঁর উত্তরসূরীরা আজও সেই পূজা বহাল তবিয়তে চালিয়ে যাচ্ছেন।

গোসাইরহাট বাজারে কালী মন্দিরের সামনে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পূজাটি এবারই ৭৯ বছরে পদার্পণ করলো। যাদের উদ্যোগে এই পূজোর শুভারম্ভ ঘটেছিল, তারা হলেন জিতেন্দ্র কুমার সাহা, সুমতি কুমার সাহা, কৃষ্ণকুমার সাহা, হরিদাস সাহা, বিজয়ভূষণ রায় প্রমূখ। হাতে গোনা এই কয়েকজন ব্যক্তিত্বের হাত ধরেই পূজাটি চলতে থাকে।[১০১] গোসাইরহাট বাজারের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই পূজার সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে। এই পূজাটিও কখনো কখনো ব্লকের সেরা প্রচার শিরোপা পেয়ে থাকে । বর্তমান পূজা কমিটির সভাপতি ডা. উত্তম বর্মন, সম্পাদক সৌরভ সাহা, কোষাধ্যক্ষ স্বপন দেবনাথ।

গরুহাটিতেও একটি দুর্গা পূজার আয়োজন করা হয়। পূজা কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি যামিনী মোহন বর্মন জানাচ্ছেন যে, ১৯৭০ র দশকের শেষের দিকে এই পূজার শুভারম্ভ হয়েছিল। শুরু থেকে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রমেশ বর্মন, গজেন বর্মন, খগেন বর্মন, লাল্টু বর্মন প্রমুখ। জনকল্যাণ সংঘের সদস্যবৃন্দের উদ্যোগে এই পূজাটি আয়োজিত হয়ে থাকে। বর্তমানে এই পুজো কমিটির সভাপতি যামিনী মোহন বর্মন, সম্পাদক গোবিন্দ বর্মন, কোষাধ্যক্ষ নির্মল বর্মন প্রমূখ।[১০২]

গরুহাটির পূর্ব প্রান্তে নোকা মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। পঞ্চাশের দশকে বিষ্ণুপদ রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই পূজার শুভারম্ভ করেন। বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুর পর ১৯৭৬- ৭৮ সাল নাগাদ এই পূজা বন্ধ ছিল। তারপর থেকেই এই দুর্গোৎসব তাঁর উত্তরাধিকারী ও এলাকাবাসীর সহযোগিতায় সার্বজনীন পূজায় পরিণত হয়। বর্তমান পূজা কমিটির সভাপতি মনীন্দ্রনাথ রায়,

সম্পাদক প্রবীর রায়, কোষাধ্যক্ষ নরেশ চন্দ্র রায় এবং আরো অন্যান্য । প্রবীর রায়[১০৩] জানাচ্ছেন যে, পূর্বের তুলনায় এই পূজার জনপ্রিয়তা ও উৎসাহ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

গোসাইরহাট বন্দরের মদন সাহার খামারের সন্নিকটে স্থাপিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ কলেজ অব এডুকেশন (বিএড কলেজ) এর মাঠে বীণাপানি সংঘের পক্ষ থেকে একটি পূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। এই পূজার শুভারম্ভ হয় ২০১০ সালে। এই পূজা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য তথা বীণাপাণি সংঘের সভাপতি শিব সুন্দর সাহা, সম্পাদক পঙ্কজ বর্মন, কোষাধ্যক্ষ রাজু সরকার, সমীর সাহা, মদন চন্দ্র বর্মন, শ্যামসুন্দর সাহা, গদাই সাহা প্রমূখ।[১০৪]

গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খুটামারার পূর্ব প্রান্তে অর্থাৎ পূর্ব গোসাইরহাটে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। বিগত ১০ বছরে থেকে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। রবীন্দ্র সংঘ পরিচালিত পূজা কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য মন্টু সরকার (সভাপতি), পিন্টু দে (সম্পাদক), শ্যামল সরকার (কোষাধ্যক্ষ), রাখাল সরকার, প্রদীপ সরকার, বিশ্বজিৎ সরকার প্রমূখ।[১০৫]পূজার মাড়েয়া অমল বর্মন[১০৬] জানাচ্ছেন যে, রাখাল সরকার তাঁর পিতার নামাঙ্কিত রবীন্দ্র সংঘের জন্য এবারই প্রায় এক দোন জমি দান করেছেন।

পল্লী দর্শন ক্লাবের পক্ষ থেকে গড়খোলায় ১৯৭৩ সালে প্রথম দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়েছিল। এই পূজা কমিটির সভাপতি ছিলেন মহীনাথ প্রামানিক, সম্পাদক ধীরেন প্রামাণিক, সহ-সম্পাদক বিশ্বনাথ প্রামাণিক, এবং সাংস্কৃতিক সম্পাদক ছিলেন সমরেশ চন্দ্র বর্মন। বেশ কয়েক বছর ক্লাবের পক্ষ থেকে পূজো করা হয়েছিল।[১০৭] তবে বর্তমানে গড়খোলা দুর্গোৎসব কমিটির পরিচালনায় গড়খোলায় একটি দুর্গ পূজা হয়ে আসছে গত ১৩ বছর থেকে। অর্থাৎ এবারই ১৪ বছরে পদার্পণ করল। শুরুতেই যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা ছিলেন, তাদের মধ্যে রুইদাস বর্মন, জল্লেশ বর্মন, সদানন্দ বর্মন প্রমূখ। বর্তমানেও যারা এই দুর্গোৎসবের সঙ্গে সম্পৃক্ত, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন তন্ময় প্রামাণিক, সদানন্দ বর্মন (সম্পাদক) রামরাজ হরিজন(কোষাধ্যক্ষ), শংকর বর্মন, সরেশ বর্মন, জল্লেশ বর্মন, উজ্জ্বল বর্মন প্রমূখ ।[১০৮]

অতি সাম্প্রতিককালে অর্থাৎ ২০১৬ সাল থেকে গোসাইরহাট ইসকন মন্দিরের পাশে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে । বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এই পূজাটি মূলত মহিলাদের উদ্যোগেই আয়োজিত হয়ে থাকে।[১০৯]এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা অখিল রায়, সুশান্ত মোহন্ত[১১০], গোবিন্দ রায়, অশোক কুমার রায়[১১১], বিশ্বজিৎ মহন্ত, ছোটন বর্মন, সুজন বর্মন প্রমুখের তত্ত্বাবধানে এলাকার মহিলাদের নিয়ে একটি পূজা কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্যবৃন্দ হলেন সভাপতি শশিকা রায়, সম্পাদক কৃষ্ণা বর্মন, কোষাধ্যক্ষ বুলু রায়, পম্পি রায়[১১২], পুতুল বসাক (সাহা), বিমলা বর্মন, স্বপ্না রায়, লতিকা বর্মন প্রমুখ।[১১৩]

গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খানুয়ার ডাঙ্গা এলাকায় একটি দুর্গাপূজো অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। ষাটের দশকে এই পূজার শুভারম্ভ হয়।[১১৪] রবীন্দ্রনাথ বর্মন জানাচ্ছেন যে, দেবেন্দ্রনাথ বর্মন, তরণী অধিকারী, নিশিকান্ত বর্মন প্রমুখের উদ্যোগে এই পূজার শুভারম্ভ ঘটেছিল। বর্তমান পূজা কমিটির সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বর্মন, সম্পাদক রতন বর্মন, কোষাধ্যক্ষ রামকান্ত বর্মন প্রমূখ।[১১৫]

গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভাবেরহাটে একটি দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়ে থাকে। ৫৪ বছরের পুরনো এই পূজার উদ্যোক্তা ছিলেন গিরিন্দ্রনাথ বর্মন, পরিমল চন্দ্র বর্মন, তরণীকান্ত রায়, অজিত বিশ্বাস, ভবেন্দ্রনাথ বর্মন, দেবীচরণ বর্মন, কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন, তুষারকান্তি রায়, গোপাল শর্মা, বীরেন বর্মন প্রমুখ। বর্তমান পূজা কমিটির সভাপতি হলেন খোকা রায়, সম্পাদক প্রদীপ বর্মন, কোষাধ্যক্ষ সুজিত বিশ্বাস[১১৬]। হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের যৌথ উদ্যোগে এই পূজা আয়োজিত হয়ে থাকে । পুজো কমিটির সভাপতি খোকা রায় জানাচ্ছেন যে, প্রতিবছর এলাকাবাসীর সহযোগিতায় পূজো কমিটি গরিব দুঃস্থ মানুষজনকে বস্ত্র বিতরণ করে থাকে।

উপরিউক্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্থ এলাকায় স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সংস্কৃতিচর্চার বিভিন্ন দিক তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, যদিও এই আলোচনার অসম্পূর্ণতার কথা নতমস্তকে স্বীকার করি। কেননা, কোনো আলোচনাই সর্বাংশে নিখুঁত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে না। এই প্রবন্ধটির ক্ষেত্রেও বোধ করি তার ব্যতিক্রম হবে না। পাঠক সাধারণকে সাদরে সমালোচনার আমন্ত্রণ জানাই, যাতে আগামীতে আরও বেশি নির্ভুল গবেষণালব্ধ প্রবন্ধ আপনাদেরকে উপহার দিতে পারি । সেইসঙ্গে গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের একজন স্থানীয় বাসিন্দা হিসেবে আমার বিনম্র আবেদন এই যে, আমাদের সতর্কতার সহিত অপসংস্কৃতিকে বর্জন করে আরও সুস্থ ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তুলতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠতে হবে ; এই সাংস্কৃতিক আঙ্গিনাকে যাতে কখনোই কালিমালিপ্ত হতে না হয়, তা দেখার গুরুদায়িত্ব বর্তমান প্রজন্মও অস্বীকার পারেন না।

তথ্যসূত্র

১. রায়, ড. দীপক কুমার, ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য, রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, সাক্ষাৎকার : ১২.০৬.২৩ ইং, বয়স ৫৮ ।

২. প্রামানিক, বিশ্বনাথ, একজন কমিউনিস্ট নেতা, কবি ও প্রাক্তন শিক্ষক, সাক্ষাৎকার : ১৮.০৭.২৩ ইং, বয়স ৭২।

৩. The Cooch Behar Gazette, March 16, 1937.

৪. The Cooch Behar Gazette, April 1, 1937, Part III, Bill No.I

৫. বর্মন, ডা: উত্তম কুমার, গোসাইরহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক, সাক্ষাৎকার : ২০.০৮.২৩ ইং, বয়স ৩৮ ।

৬. মানসাই, ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও জনজীবন, ২০০৮ সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ৮৬।

৭. তিনি এলাকায় 'নোকা মাস্টার' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন। নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, রাজবংশী সম্প্রদায়ের এই সংস্কৃতিবান ছিন্নমূল মানুষটি গোসাইরহাট বন্দরে একটি সংস্কৃতি জগৎ তৈরি করেছিলেন ; সে জগতে ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষ অবলীলায় বিচরণ করতেন।

৮. সাহা, গোকুল, সাক্ষাৎকার : ২৩.১০.২৩ ইং, বয়স ৯০।

৯. তিনি এলাকায় 'যামিনী ঠক' নামে পরিচিত। সাক্ষাৎকার :২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৮০।

১০. তিনি 'রসিত বানিয়া' নামে সমধিক পরিচিত। স্বাধীনতার প্রাকমুহূর্তে তিনি পূর্ব পাকিস্তান থেকে বর্তমান আলোচ্য অঞ্চলে আসেন। তিনি একজন সংস্কৃতিবান মানুষ ছিলেন।

১১. তিনি লাল্টু- খগিন নামে পরিচিত। তাঁর প্রিয় বন্ধু খগিন এর নাম তার নামের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয়। গিরীন্দ্রনাথ বর্মন নারী চরিত্রেই অভিনয় করে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন । সাক্ষাৎকার : ১০.০৯.২৩ ইং, বয়স ৭০।

১২. গিরীন্দ্রনাথ বর্মন জানাচ্ছেন যে, নাচ ও গানের সমারোহে তৈরি অনুষ্ঠানকে 'ঝুমুর' বলা হত।

১৩. মহেন্দ্র বর্মন গোসাইরহাট গরুহাটিতে মালীর কাজ (মাটির প্রতিমা বানানোর কাজ) করতেন। তাঁর মাথায় টাক ছিল; 'টাক মাথা'কে রাজবংশী ভাষায় 'চান্দিয়া' বলা হয়ে থাকে।

১৪. তিনি 'টোনেয়া ম্যানেজার' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন।

১৫. সাহা, গোকুল, পূর্বোক্ত ।

১৬. তিনি এলাকায় 'দেড়তালা মহেন্দ্র' নামে পরিচিত ।

১৭. তিনি ভিলেনের অভিনয় করতেন ।

১৮. বর্মন, জিতেন, তিনি এলাকায় 'খান সাহেব- জিতেন' নামেই পরিচিত, সাক্ষাৎকার : ২২.০৯.২৩ ইং, বয়স ৭২ ।

১৯. রায়, অখিল, সাক্ষাৎকার : ২৩.১০.২৩ ইং, বয়স ৬৬।

২০. তিনি স্বনামধন্য একজন গ্রামীণ ডাক্তার। ৬০ বছরেরও অধিক সময় ধরে সমান্তরালভাবে মানুষকে পরিষেবা দিয়ে চলছেন।

২১. তিনি পাঁচ বছর গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে ছিলেন। এলাকার গরীব দুঃস্থ মানুষের সর্বক্ষণের সঙ্গী এবং একজন গুণী অভিভাবক ছিলেন। আজও এলাকাবাসী তার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন।

২২. তিনি একাধারে কমিউনিস্ট নেতা, লেখক, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং সংস্কৃতি প্রিয় মানুষ, বয়স ৬৮ ।

২৩. তিনি একজন স্বনামধন্য ব্যবসায়ী। গোসাইরহাটের প্রায় সকল ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। সাক্ষাৎকার : ১৫.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৮।

২৪.সম্পাদনা : গাজী, আব্দুর রহিম, কোচবিহারের লোকসংস্কৃতি বহুমাত্রা বহুস্বর, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৩৭ ।
২৫ রায় জ্যোতির্ময়, রাজবংশী সমাজ দর্পণ, প্রথম খন্ড, দি সি বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃষ্ঠা ২৭০ ।
২৬. কুচবিহার জেলার সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ১১২ ।
২৭. জগদীশ বর্মনের পূর্বপুরুষ পূর্ববঙ্গের মানুষ ছিলেন, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান থেকে আলোচ্য চলে আসেন। সাক্ষাৎকার : ২৯.১০.২৩ ইং, বয়স ৭০ ।
২৮. সম্পাদক : চাকী, দেবব্রত, উত্তর প্রসঙ্গ : একটি আর্থ- সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, কোচবিহার জেলা সংখ্যা ২ , প্রকাশকাল : রাসমেলা, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৬৩ ।
২৯. প্রামানিক, বিশ্বনাথ, পূর্বোক্ত।
৩০. তিনি একজন স্বনামধন্য ভাওয়াইয়া শিল্পী।
তাঁর শিল্প প্রতিভার লোকসমাজে যথেষ্ট সমাদর করা হয়। সাক্ষাৎকার : ১২.০৮.২৩ ইং, বয়স ৬১।
৩১. বর্মা, ড. সুখবিলাস, উত্তরবঙ্গ পরিক্রমায় : প্রবন্ধ সংকলন, দ্বিতীয় খন্ড, উপজনভুই পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা, ২০১৮, পৃষ্ঠা : ২৩০- ৩১ ।
৩২. মধুপূর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলার সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃষ্ঠা : ৩৫৮ ।
৩৩. মধুপূর্ণী, পূর্বোক্ত, ৩৫৯ ।
৩৪. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পৃষ্ঠা : ১০৭ ।
৩৫. মধুপর্ণী,পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৩৬ ।
৩৬. বর্মন, যামিনী, পূর্বোক্ত।
৩৭. বর্মা, ড. সুখবিলাস, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩২ ।
৩৮. বর্মন, পিংকি, সাক্ষাৎকার : ১৪.০৮.২৩ ইং, বয়স ৩৩ ।
৩৯. ঘোষ, অজিত কুমার, বাংলা নাটকের ইতিহাস, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ষষ্ঠ সংস্করণ : অক্টোবর, ১৯৬০, পৃষ্ঠা : ২ ।
৪০. পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা, পৃষ্ঠা : ৩২২ ।
৪১.পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার জেলা, পৃষ্ঠা : ৩২২ ।
৪২.বর্মন, সমরেশ চন্দ্র, সাক্ষাৎকার : ০৫.১১.২৩ ইং, বয়স ৬৯ ।
৪৩. সরকার, হরিনারায়ন, সাক্ষাৎকার : ০২.১১.২৩ ইং, বয়স ৫৩ ।

৪৪. সাহা, প্রদ্যুত ও সরকার, ধনঞ্জয়, সাক্ষাৎকার : ২৫.১০.২৩ ইং, বয়স ৫২ এবং ৪৮ ।
৪৫. সরকার, হরিনারায়ন, পূর্বোক্ত ।
৪৬. চক্রবর্তী, কার্তিক, সাক্ষাৎকার : ২৩.০৯.২৩ ইং, বয়স ৪৫ ।
৪৭.করোনা অতিমারির সময় থেকে এখনো পর্যন্ত পত্রিকাটি প্রকাশ বন্ধ রয়েছে।
৪৮. বর্মন, সমরেশ চন্দ্র, পূর্বোক্ত।
৪৯. সাহা, স্বপন, সাক্ষাৎকার : ২৬.১০.২৩ ইং, বয়স : ৫৫ ।
৫০.প্রাক্তন গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান, বর্তমান শীতলখুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ।
৫১.স্বর্গীয় রবীন্দ্রলাল সাহা তাঁর মায়ের নামে এই সম্প্রদায়টি তৈরি করা হয়েছিলেন ।
৫২. শ্রদ্ধেয় গোকুল সাহা তাঁর মায়ের নামই এই সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন ।
৫৩. সাহা, রাধেশ্যাম, সাক্ষাৎকার : ০৬.১১.২৩ ইং, বয়স : ৬০ ।
৫৪. শ্রদ্ধেয় সাক্ষী গোপাল সাহা তাঁর পিতার নামে এই সম্প্রদায়টি গড়ে তুলেছিলেন।
৫৫. সাহা, রাধেশ্যাম, পূর্বোক্ত ।
৫৬. সাহা, পরমানন্দ, সাক্ষাৎকার : ১০.০৯.২৩ ইং, বয়স : ৯৪ । তিনি আরো জানান যায় যে, গোসাইরহাটের এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি কুচবিহার রাজ্যের তৎকালীন রাজস্ব মন্ত্রী খাঁ চৌধুরী আমানতউল্লা আহমেদের উদ্যোগেই আয়োজন করা হয়েছিল।
৫৭. বর্মন, হরিনাথ, সাক্ষাৎকার : ০৯.১০.২৩ ইং, বয়স : ৭৫ ।
৫৮. বর্মন, সুবোধচন্দ্র, সাক্ষাৎকার : ১২.১০.২৩ ইং, ৭৬।
৫৯. শ্রী শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের পৌত্র ।
৬০.রায়, কল্যাণ, সাক্ষাৎকার: ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৫।
৬১. বর্মন, সুবোধ চন্দ্র, পূর্বোক্ত ।
৬২. শ্রী অর্কদ্যুতি চক্রবর্তী, বর্তমান আচার্যদেব ।
৬৩. বর্মন, হরিনাথ ও সাহা, গৌতম, সাক্ষাৎকার : ১৬.১০.২৩ ইং।
৬৪. সাহা, গৌতম, পূর্বোক্ত ।
৬৫. বর্মন, যামিনী মোহন, পূর্বোক্ত ২০.১০.২৩ ইং।

৬৬. বর্মন, কমলা, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৬।
৬৭.বর্মন, সমরেশ, পূর্বোক্ত, ১৫.১০.২৩ ইং।
৬৮. ইসলাম, হাজী নুরুল, সাক্ষাৎকার, ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৭২।
৬৯.বর্মন, যামিনী মোহন, পূর্বোক্ত, ২০.১০.২৩ ইং।
৭০. বর্মন, সমরেশ চন্দ্র, পূর্বোক্ত।
৭১. 'রাজা হরিচন্দ্র', 'ময়নার চোখের জল', 'দস্যু রানী ফুলন দেবী' ইত্যাদি পুতুল নাচের অভিনীত সিনেমা আজও মানুষ স্মৃতিচারণ করে থাকেন। বর্তমান লেখকেরও সেই অভিজ্ঞতার অংশীদার।
৭২. তিনি 'হাতি গিরিন' নামে বেশ পরিচিত ছিলেন। তিনি নির্দল প্রার্থী হয়ে প্রত্যেক বছর নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতেন।
৭৩. বর্মন, সুভাষ, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৮।
৭৪. বর্মন, যামিনী, পূর্বোক্ত।
৭৫. বামফ্রন্ট জামানার প্রাক্তন পঞ্চায়েত।
৭৬. তিনি ১৯৯৩ সালে গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। সাক্ষাৎকার : ১৯.১০.২৩ ইং, বয়স ৭৮।
৭৭. বর্মন, পরিমল, পূর্বোক্ত।
৭৮. বর্তমান লেখকের পিতা।
৭৯. বর্মন, বীরেন্দ্রনাথ, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৪২ ।
৮০. বর্মন, বিধান চন্দ্র, সাক্ষাৎকার : ১০.১০.২৩ ইং, বয়স ২৫ ।
৮১. এই 'বড় ধাপ' অর্থাৎ একটি উঁচু ভূখণ্ডের সঙ্গে ইতিহাস খ্যাত কান্তেশ্বর রাজার গড় সম্পর্কিত। এই উচু ভূখণ্ডের পাশেই একটি জলাশয় আছে যা 'চাত্রা' নামে পরিচিত। রায়, গৌতম কুমার, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৬০।
৮২. বর্মন, মনি শংকর, সাক্ষাৎকার : ১৮.১০.২৩ ইং, বয়স ৩২ ।
৮৩. 'দোতালা খোকা' নামে সমধিক পরিচিত ছিলেন ।
৮৪. প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, বর্তমান পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ।
৮৫. বর্মন, অনিল চন্দ্র, সাক্ষাৎকার ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৬৫।
৮৬. বর্মন, দীপেনচন্দ্র, সাক্ষাৎকার : ১৮.১০.২৩ ইং, বয়স ৪৫।
৮৭. বর্মন, তপন, সাক্ষাৎকার : ১৭.১০.২৩ ইং, বয়স : ৩০ ।

৮৮. 'ছিল্লান' বলতে পার্শ্ববর্তী খুটামারা নদীতে স্নান সেরে ব্রাহ্মণের মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনেকে উপবীত গ্রহণ করেন, অস্থি ফেলেন এবং আরো অনেক মনোবাসনা পূরণের জন্য ঠাকুরকে পূজা দিয়ে থাকেন।
৮৯. রায়, গৌতম কুমার, পূর্বোক্ত ।
৯০. বর্মন, মন্টু, প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান, বয়স ৭৮ । বর্তমান লেখককে জানিয়েছেন যে, ১৯৬২ সাল থেকে শিব মন্দিরে পূজা হয়ে আসছে।
৯১. বর্মা, ডঃ ধর্ম নারায়ণ, কামরূপ - কামতা- সংস্কৃতি- আর্য সংস্কৃতির নামান্তর, প্রকাশন : রঞ্জিত কুমার বর্মা, ২৮ শেষ জুন, ২০২০, পৃষ্ঠা : ৮১ ।
৯২. সম্পাদনা : মন্ডল, ডঃ রঞ্জিত কুমার, ইতিহাসের পাতা থেকে, উত্তর বঙ্গ মূলনিবাসী সমিতির আলোচিত বিষয়ের সারমর্ম, প্রথম খন্ড, সেঞ্চুরি পাবলিকেশন্স, নিউ দিল্লী, পৃষ্ঠা : ৬১।
৯৩. বর্মন, সমরেশ চন্দ্র, পূর্বোক্ত।
৯৪. রায়, মনিন্দ্র নাথ, সাক্ষাৎকার : ১০.১০.২৩ ইং, বয়স : ৭৫ ।
৯৫. রায়, বিষ্ণুপ্রসাদ, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৬৫।
৯৬. পাল, সৌভাগ্য, সাক্ষাৎকার : ০৫.০৯.২৩ ইং,বয়স ৩৭।
৯৭. সাহা, জগন্নাথ, সাক্ষাৎকার : ২১.১০.২৩ ইং, বয়স ৩৪ এবং সাহা, গোকুল, পূর্বোক্ত।
৯৮. বর্মন, সমরেশ, পূর্বোক্ত।
৯৯. রায়, তপেন্দু নারায়ন, সাক্ষাৎকার : ২১.১০.২৩ ইং, বয়স ৩৬। তিনি 'জাগরণী' পত্রিকার সম্পাদক।
১০০. 'দোপা দেওয়ানি' নামেই তিনি অধিক পরিচিত ছিলেন।
১০১. সাহা প্রদ্যুৎ, সাক্ষাৎকার : ২১.১০.২৩ ইং, বয়স ৫২।
১০২. বরমন, দিলীপ, পঞ্চায়েত সদস্য, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৭।
১০৩. রায়, প্রবীর, সাক্ষাৎকার : ১৯.০৯.২৩ ইং, বয়স ৫৬।
১০৪. বর্মন, পঙ্কজ, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, ৩২।
১০৫. সরকার, প্রসেনজিৎ, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৩২।
১০৬. বর্মন, অমল, সাক্ষাৎকার : ২৩.১০.২৩ ইং, ৫৬।
১০৭. বর্মন, সমরেশ চন্দ্র, সাক্ষাৎকার : ০৫.১১.২৩ ইং, পূর্বোক্ত।
১০৮. প্রামানিক, তন্ময়, সাক্ষাৎকার : ১০.১০.২৩ ইং, বয়স : ৩৯ ।

১০৯. মহন্ত, বিশ্বজিৎ, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৪৫।
১১০. প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত।
১১১. প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য। শ্রদ্ধেয় অশোক রায় জানাচ্ছেন যে, শুধুমাত্র পোস্ট অফিস লেখার ক্ষেত্রেই গোসাইরহাটের সঙ্গে 'বন্দর' শব্দটা ব্যবহার করা হয় । যেমন - পোস্ট অফিস : 'গোসাইরহাট বন্দর'। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের নামসহ অন্যান্য ক্ষেত্রে লেখা হয় শুধু 'গোসাইরহাট'। যদিও অনেকেই 'গোসাইরহাট বন্দর' বলতে গোসাইরহাট বাজারকেই বোঝেন।
১১২. প্রাক্তন, পুজা কমিটির প্রথম সম্পাদিকা।
১১৩. রায়, অশোক কুমার, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৬।
১১৪. অধিকারী, রমেশ, সাক্ষাৎকার : ২২.১০.২৩ ইং, বয়স ৬০।
১১৫. বর্মন, রবীন্দ্রনাথ, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৫৫ ।
১১৬. শীল, চন্দন, সাক্ষাৎকার : ২০.১০.২৩ ইং, বয়স ৩৩।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

যাদের উদার সহযোগিতা ছাড়া আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস সম্ভব হত না, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন অধ্যাপক ড. কার্তিক সাহা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ভবেন্দ্রনাথ বর্মন, শিক্ষক বীরনারায়ণ সাহা, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক গিরিন্দ্রনাথ বর্মন, প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমরেশ বর্মন, উপাচার্য ড. নিখিল চন্দ্র রায়, উপাচার্য ড. দীপক কুমার রায়, অধ্যক্ষ ড. আফজাল হোসেন, অধ্যাপিকা ড. সঙ্গীতা রায়চৌধুরী, শিক্ষক হরিনাথ বর্মন, শিক্ষক বিশ্বনাথ প্রামানিক, শিক্ষক সুবোধ কুমার বর্মন, অধ্যাপক ড. অমৃতকুমার শীল, গোকুল সাহা, সাক্ষী গোপাল সাহা, রতন সাহা, ড. গৌতম সাহা, বিশিষ্ট গবেষক ড. রাজর্ষি বিশ্বাস, ডা. হরিনারায়ণ সরকার, প্রদ্যুৎ সাহা, শিক্ষক তন্ময় প্রামানিক, গবেষক ড. প্রসেনজিৎ রায়, গবেষক পলাশ চন্দ্র মোদক, গবেষিকা ভাস্বতী রায়, শিল্পী রামকুমার বর্মন, তপেন্দু নারায়ন রায় প্রমূখ। এছাড়াও বন্ধুবর মনিশংকর বর্মন, সঞ্জয় বর্মন, দীনেশচন্দ্র বর্মন, গোবিন্দ সাহা, পঙ্কজ বর্মন, রবীন্দ্রনাথ বর্মন, লক্ষ্মী সাহা, প্রিয়াঙ্কা রায়, সোমা সাহা প্রমুখের অকৃপণ সহযোগিতা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে।

সাংখ্য সৎকার্য্যবাদ— একটি সমীক্ষা

প্রসেনজিৎ পাত্র
শিক্ষক, দর্শন বিভাগ
বাগনান কলেজ, হাওড়া

সংক্ষিপ্তসার : কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতানৈক্য প্রচলিত। তবে কার্য্যের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণকে স্বীকার করেছেন বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিকরা। ভারতীয় দর্শনে কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের মতভেদের কেন্দ্রে দুটি বিষয় স্পষ্ট। যথা— ১. কার্য্যের সঙ্গে উপাদানকারণের সম্বন্ধ বিষয়ে, ২. উপাদান কারণের প্রকৃতি। উপাদান কারণের সঙ্গে কার্য্যের সম্বন্ধ কেমন হবে তা নিয়ে ভারতীয় দর্শনে দুটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ পাওয়া যায়। তা হল— ১. ন্যায় ও বৈশেষিক মতে কার্য্য হল নতুনের আরম্ভ। কার্য্য যা উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণের নিহিত থাকে না। এঁদের মতে কার্য্য ও উপাদান কারণ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একটিকে কার্য্য অপরটিকে উপাদান কারণ না বলে দুটিকেই কার্য্য বলা হত। কিন্তু আমরা তা বলি না। তাই কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে নিহিত থাকে না। ২. সাংখ্য ও যোগ মতে কার্য্য কোন নতুনের শুরু নয়। নিষ্কর্ষ এই যে, যা উপাদান কারণে অব্যক্ত রূপে ছিল তা কার্য্য ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয়। কার্য্যটি উপাদান কারণের মধ্যে পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল। ভারতীয় দর্শনে কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য মতবাদ রয়েছে যেমন–বৌদ্ধদের অসৎকারণবাদ, রামানুজের ব্রহ্ম-পরিণামবাদ, অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ প্রভৃতি।

সূচক শব্দ : কার্য্য-কারণ, দর্শন, অসৎকারণবাদ, নিমিত্ত, কারণত্ব, কার্য্যত্ব, অব্যক্ত।

বিশ্লেষণ-অন্বেষণ

কার্য্য-কারণ সম্পর্ক বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে বৈদিক ও অবৈদিক সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা মতানৈক্য প্রচলিত। তবে কার্য্যের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণকে স্বীকার করেছেন বৈদিক ও অবৈদিক দার্শনিকরা। ভারতীয় দর্শনে কার্য্য-কারণ

সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের মতভেদের কেন্দ্রে দুটি বিষয় স্পষ্ট। যথা— ১. কার্য্যের সঙ্গে উপাদানকারণের সম্বন্ধ বিষয়ে, ২. উপাদান কারণের প্রকৃতি। ভারতীয় দর্শনে উপাদান কারণের প্রকৃতি সম্পর্কে দুটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ পাওয়া যায়। যথা- ১. ন্যায় ও বৈশেয়িক মতে কার্য্য কারণের থেকে বেশি ব্যাপক। যেমন—টেবিল রূপ কার্য্যটি উপাদান কারণ হল কাঠের অংশ। আর এই কাঠের অংশটি থেকে টেবিল কার্য্যটি বেশি ব্যাপক। ২. সাংখ্য, যোগ ও বেদান্ত মতে কার্য্য কারণের থেকে কম ব্যাপক। অর্থাৎ টেবিল রূপ কার্য্যটি থেকে উপাদান কারণরূপ কাঠের অংশটি থেকে কম ব্যাপক। তাঁরা, কাঠের অংশ বলতে এখানে সমগ্র কাঠকে না বুঝিয়ে অংশ কাঠকে বুঝিয়েছেন। উপাদান কারণের সঙ্গে কার্য্যের সম্বন্ধ কেমন হবে তা নিয়ে ভারতীয় দর্শনে দুটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ পাওয়া যায়। তা হল— ১. ন্যায় ও বৈশেষিক মতে কার্য্য হল নতুনের আরম্ভ। কার্য্য যা উৎপত্তির পূর্বে উপাদান কারণের নিহিত থাকে না। এঁদের মতে কার্য্য ও উপাদান কারণ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একটিকে কার্য্য অপরটিকে উপাদান কারণ না বলে দুটিকেই কার্য্য বলা হত। কিন্তু আমরা তা বলি না। তাই কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে কারণের মধ্যে নিহিত থাকে না। ২. সাংখ্য ও যোগ মতে কার্য্য কোন নতুনের শুরু নয়। নিষ্কর্ষ এই যে, যা উপাদান কারণে অব্যক্ত রূপে ছিল তা কার্য্য ব্যক্তরূপে প্রকাশিত হয়। কার্য্যটি উপাদান কারণের মধ্যে পূর্ব থেকে বর্তমান ছিল। ভারতীয় দর্শনে কার্য্য-কারণ সম্পর্কে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য মতবাদ রয়েছে যেমন-বৌদ্ধদের অসৎকারণবাদ, রামানুজের ব্রহ্ম-পরিণামবাদ, অদ্বৈতবেদান্তের ব্রহ্ম-বিবর্তবাদ প্রভৃতি। এই প্রবন্ধে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধে সাংখ্যের সৎকার্য্যবাদের উপর আলোকপাত করা হবে ।

বাচস্পতি মিশ্র তাঁর সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে সৎকার্য্যবাদের আলোচনার পূর্বে কার্য্য-কারণ সম্পর্কীয় অসৎকারণবাদের অপকর্ষ দেখাতে গিয়ে বলেছেন— 'সুখ-দুঃখ মোহাত্মক জগৎ অসৎ হতে উৎপন্ন হতে পারে না।'।।১।। বৌদ্ধ অভাব হতে ভাবের উৎপত্তি স্বীকার করেন। যুক্তি হল, বীজ ও মৃৎপিন্ড অবিকৃত থাকলে তা কখনো অঙ্কুর ও ঘটকে উৎপন্ন করতে পারে না। সুতরাং অসৎ কারণ থেকে সৎ কার্যের উৎপত্তি। 'অসৎ' শব্দের দ্বারা অবশ্য অভাবাত্মক বস্তুকে বোঝানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন— যদি বীজ, মৃৎপিন্ড প্রভৃতির ধ্বংসজন্যই অঙ্কুর, ঘটাদির উৎপত্তি দেখা যায় তাহলে ঐ ধ্বংসকে উপাদান কারণ বলা যায় না।

বীজের ধবংস অঙ্কুরের উপাদান কারণ হতে পারে না। বীজের অবয়বস্বরূপ ভাবপদার্থই অঙ্কুরের উপাদান কারণ হয়। যদিও বীজের বিকার হলে ঐ বিকারকে বিনাশের সমপর্যায় বলা যায় এবং বীজের অবয়বসমূহের মতো বীজধ্বংস ও অঙ্কুরোৎপত্তির নিয়তপূর্ববৃতি হওয়ায় কারণরূপে অবশ্য স্বীকার্য হয়। তথাপি অর্থাৎ বীজাবয়ব ও বীজধবংসের অঙ্কুরোৎপত্তি নিয়তপূর্বৃতিত্ব সিদ্ধ হলেও বীজাবয়বকেই অঙ্কুরের উপাদান কারণ বলতে হবে। বীজধ্বংস নিমিত্ত কারণ হবে। বীজধবংসকে উপাদান কারণ বলা উচিত নয়। কারণ অভাবস্বরূপ উপাদান কারণ হতে ভাববস্তুর উৎপত্তি হলে ঐ অভাব সর্বত্র কাল প্রভৃতিতে বর্তমান থাকায় সর্বদা সকল কার্য্য উৎপত্তির আপত্তি হবে। বীজধবংস যদি অঙ্কুরের উপাদান কারণ হয়, তাহলে বীজধ্বংসের ধ্বংস না হওয়ায় সর্বদা অঙ্কুরের অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অঙ্কুরোৎপত্তির আপত্তি হবে। বৌদ্ধ নিরন্বয়বিনাশবাদী। কোনো বস্তুর ধবংস হলে তার অবয়ব ঐ ধ্বংস আশ্রিত হয় না। যেহেতু ঐ বস্তুর তাদৃশ্য অবয়ব থাকে না। তার ফলে যববীজভাব ও ধান্যবীজধ্বংসের পার্থক্য ব্যবস্থা হবে না, যববীজধ্বংশ হতে ধান্যাঙ্কুরের উৎপত্তির আপত্তি হবে; ইত্যাদি বহুবিধ দোষের জন্য উক্ত বৌদ্ধ মত গ্রাহ্য নয়। তাই বাচস্পতি মিশ্র বলেন অসৎকারণবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

ঈশ্বরকৃষ্ণ সাংখ্যকারিকায় সৎকার্য্যবাদ প্রতিষ্ঠায় বলেছেন—

'অসদকরণাদাপাদানগ্রহণাৎ সর্বসম্ভবাভাবাৎ

শক্তস্য শক্যকরণাৎ কারণভাবাচ্চ সৎকার্যম্'।।২।।

এই কারিকায় প্রতিজ্ঞাবাক্য হল-কার্যং সৎ। কার্য্যমাত্রে সত্ত্ব প্রতিপাদিত করার হেতু হল-অসৎ- অকরণাৎ। পক্ষে সাধ্যবৈশিষ্টবোধক বাক্যকে প্রতিজ্ঞা বলা হয়। এই স্থলে পক্ষ হল কার্য্য। আর সাধ্য হল সত্ত্ব। কার্য্যপক্ষে, সত্ত্ব সাধ্যের বৈশিষ্ট্যবোধক বাক্য হল কার্যং সৎ। কার্য্য স্বরূপ পক্ষে সাধ্যরূপে বিবক্ষিত সত্ত্ব হল কার্য্যপূর্ব ক্ষণ অবচ্ছেদে উপাদান সমবেতত্ত্ব। কিন্তু এখানে কেবলমাত্র উপাদান সমবেতত্ত্ব বললে কার্য্যের উৎপত্তিকালে ও অনন্তরকালে উপাদান সমবেতত্ত্ব নৈয়ায়িক সম্মত হওয়ায় সিদ্ধসাধন দোষ হবে। কার্য্যস্বরূপ পক্ষে সত্ত্বরূপ সাধ্যের সিদ্ধির জন্য 'অসদকরণাৎ' এই হেতু উপনীত হয়েছে। তাই বাচস্পতি মিশ্র

সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী বললেন– 'অএ হেতুম্ আহ অসদকরণাদ্ ইতি'। কিন্তু আপত্তি হতে পারে যদি আমরা হেতু শব্দটিকে এখানে যথাশ্রুত অর্থে গ্রহণ করি হেতুটি স্বরূপসিদ্ধি হেত্বাভাস দোষে দুষ্ট হবে। কারণ 'অসদকরণ' হেতু হলে তা কার্য্যরূপ পক্ষে বৃত্তি হবে না। হেতু যদি পক্ষে বৃত্তি না হয় তাহলে সেই হেতুর স্বরূপই অসিদ্ধ এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন 'অত্র হেতুম্ আহ' এই বাক্যস্থ হেতু শব্দের যথাশ্রুত অর্থ করা সঙ্গত হবে না। 'অত্র প্রতিজ্ঞাতে অর্থে, হেতুম্ আহ-জ্ঞাপকং তর্কম্ আহ' এইরূপ অর্থ গ্রহণ করতে হবে। সুতরাং এখানে হেতু শব্দের অর্থ অনুকূল তর্ক। 'অসদকরণাদ' এইবাক্যের দ্বারা অনুকূল তর্ক প্রদর্শিত হয়েছে। কার্য্যর উৎপত্তির পূর্বে কোন কিছু যদি অসৎ হয় তাহলে তাকে কেউ সৎ করতে পারে না। সাংখ্যের প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত হল, সহস্র সহস্র শিল্পী প্রাণপাত প্রয়াস করেও নীলকে পীত করতে পারে না। তাৎপর্য হল, নীলে পীতবর্ন না থাকায় অর্থাৎ নীলরূপে পীতরূপ অসৎ হওয়ায় নীলকে পীত করা যায় না ।। ৩।। সেইরূপ স্বীকার করতে হবে যে মৃৎপিন্ডে যদি ঘট উৎপত্তির পূর্বে অসৎ হতো তাহলে তাতে ঘটের উৎপত্তি কখনও সম্ভব হত না। কারণ অসৎ কখনো উৎপন্ন হতে পারে না। তাই সাংখ্য সিদ্ধান্ত হল, কার্য্য সৎ।

কার্য্য উৎপত্তির পূর্বেই সৎ হলে 'কার্য্যর উৎপত্তি হল' কথাটি অর্থহীন হয়। যেমন, কখনওই সম্ভব নয়। সৎ তো উৎপন্ন হতে পারে না, কারণব্যাপারের পূর্বেও ঘট সৎ হয়। এর উত্তরে বাচস্পতি বলেন উৎপত্তি বলতে বুঝতে হবে আর্বিভাবকে ।। ৪।। ধানের ভেতরে তন্ডুল থাকে, অবঘাত করলে ধান হতে তন্ডুল বাহির হয়, একেই তন্ডুলের উৎপত্তি। এইরূপ উৎপত্তির পূর্বে ধানে যদি তন্ডুল না থাকতো তাহলে ধান থেকে তন্ডুল পাওয়া কখনওই সম্ভব হত না। এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন নীলকে পীত করা যায় না এইরূপ উদাহরণের দ্বারা এটা প্রমাণ করা যায় না যে অসৎকে সৎ করা যায় না। ঘটে রক্তরূপ ছিল না বলেই যে তাতে পাকের দ্বারা রক্তরূপ হতে পারে না, তা বলা চলে না। বাস্তব অভিজ্ঞতায় দেখা যায় শ্যামবর্ণ ঘটে পাকের দ্বারা রক্তরূপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং বলতে হয় ঘটের উভয়রূপ থাকতে পারে। পাকের পূর্বে ঘটের মধ্যে রক্তরূপ অসৎ হলেও পরে তার উৎপত্তি সম্ভব হয়। একই ঘটে যদি বিরুদ্ধরূপ কালভেদে থাকতে পারে তাহলে একই ঘটে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব বিরুদ্ধ ধর্ম থাকতে পারে। এর উত্তরে সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, সত্ত্ব

এবং অসত্ত্বকে ঘটের ধর্ম বললেও তা উপপাদন করা যাবে না। কারণ উৎপত্তি কালাবচ্ছেদে ঘটে অসত্ত্ব থাকে, এই বক্তব্যই ব্যাঘাত দোষযুক্ত ।। ৫ ।। উৎপত্তি পূর্বকালে ঘট না থাকলে অসত্ত্ব ধর্মটি কোথায় থাকে এই প্রশ্ন হবে। তাই উৎপত্তির পূর্বকালাবচ্ছেদে ঘটে অসত্ত্বধর্ম স্বীকার করতে হলে ধর্মীরূপে ঘটের সত্ত্ব পূর্বে স্বীকার করতে হবে। তাই বলা যায় না যে অসৎ থেকে সৎ এর উৎপত্তি সম্ভব। এখন কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন যে, কারণব্যাপারের পূর্বে যদি কার্য্য সৎ হয় তাহলে কারণব্যাপারের প্রয়োজন কোথায়? ।। ৬ ।। এর উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেন– 'কারণাৎ চ অস্য সতঃ অভিব্যক্তিঃ এব অবশিষ্যতে'।। ৭ ।। অর্থাৎ কার্য্যটি কারণব্যাপারের পূর্বে সৎ হলেও কারণের দ্বারা তার অভিব্যক্তি হয়। কার্য্যটি নিজের উপাদান কারণে সৎ অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে অবস্থিত। কারণব্যাপারের দ্বারা ঐ সূক্ষাবস্থায় স্থিত কার্য্যের স্থুলতাপ্রাপ্তি হয়। একেই অভিব্যক্তি শব্দের দ্বারা বোঝানো হয়েছে ।। ৮ ।। পূর্বে যে কার্য্য সূক্ষ্মরূপে ছিল, কারণব্যাপারের দ্বারা তার স্থুলতাপ্রাপ্তি হয়। সুতরাং কারণব্যাপার নিরর্থক নয়। উপাদান কারণে সূক্ষ্মরূপে স্থিত কার্য্যে স্থুলরূপে অভিব্যক্তি হয় কিংবা অসৎ কার্য্যেরই উৎপত্তি হয়। এই দু-পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষ গ্রহণের অনুকূল যুক্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন– 'সতঃ চ অভিব্যক্তিঃ উপপন্ন' ।। ৯ ।। পূর্বে সৎরূপে অবস্থিত কার্য্যের অভিব্যক্তি যুক্তিযুক্ত। স্থুলরূপে স্থিত কার্য্যের স্থুলরূপে অভিব্যক্তির অর্থাৎ সাংখ্যমতের সমর্থনে বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু অসৎ এর কোনো দৃষ্টান্ত নেই। পীড়নের দ্বারা তিলে তৈলের অভিব্যক্তি হয়। অবঘাতের দ্বারা ধানের তান্ডুলের অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং অভিব্যক্তি বল, আর উৎপত্তি বল, তাতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু অসৎকে কখনো উৎপাদ্য হতে দেখা যায় না।

কার্য্য উৎপত্তির পূর্বে অসৎ। যেখানে ঘটসংযোগ ছিল, সেখানে ঘটাভাব থাকে, ঘটের সমবায়িকারণ কপালে ঘট ধ্বংস যেমন থাকে, তেমনি ঘটের উৎপত্তির পূর্বে ও কপালে ঘটাভাব থাকে। উৎপত্তির পূর্বে ঘটের অভাবই যদি কপালে থাকে, তাহলে তখন সেখানে ঘট থাকবে কিরূপে? এইরূপ বক্তব্যের প্রতিবাদে স্বমত সর্মথনে দ্বিতীয় হেতুর উল্লেখ্য করেছেন– 'ইতশ্চ কারণব্যাপারাৎ প্রাক্ সদেব কার্য্যম্ উপাদান-গ্রহণাৎ।। ১০।। এখানে উপাদান শব্দের অর্থ কারণ এবং গ্রহণ শব্দের অর্থ সম্বন্ধ। কারণের সহিত কার্য্যর সম্বন্ধ থাকার জন্যও কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্বে সৎ

বলতে হয়। কপালাদি কারণ ও ঘটাদি কার্য্য, একথা সর্বস্বীকৃত। কপালাদির সহিত ঘটাদির কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ অস্বীকার করার উপায় নেই। সম্বন্ধ সর্বদা উভয়বৃত্তি হয়। ঘটাদির উৎপত্তির পূর্বে কপালাদিকে কারণ বলতে হলে অর্থাৎ ঘটাদির সত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কার্য্য অসৎ হলে ঐ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না, এই জন্য উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যকে সৎ বলতে হবে। যদি কেউ উল্লিখিত অনুমানে ব্যভিচারশঙ্কা করে বলেন– উপাদানজন্যত্বহেতু কার্য্য থাকে উৎপত্তির পূর্বে উপাদানসম্বন্ধত্ব সাধ্য যদি না থাকে, তাহলে এ অনুমানের দ্বারা উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের সত্তাসিদ্ধ হবে কিরূপে? উপাদানসম্বন্ধরহিত কার্য্যই কারণের দ্বারা উৎপন্ন হবে কেন? বলা হবে কেন যে, অসৎকার্য্য উৎপন্ন হয় না। এইরূপ আক্ষেপ এর সমাধানে কিংবা উক্ত ব্যভিচারশঙ্কার নিবারণে আচার্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বললেন– 'সর্বসম্ভবাভাবাৎ'। ঈশ্বরকৃষ্ণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করার জন্য বাচস্পতি বলেছেন—উপাদান এর সহিত অসম্বন্ধ কার্য্যের উৎপত্তি স্বীকার করলে সকল কার্য্যের সকল কারণ হতে উৎপত্তির আপত্তি হবে। কপালের সহিত ঘটের সম্বন্ধ না থাকলেও যদি কপাল হতে ঘট উৎপন্ন হয়, তাহলে কপাল হতে পটাদি সকল কার্য্য উৎপন্ন হবে না কেন? যেহেতু কপালের সহিত ঘট যেমন(উৎপত্তির পূর্বে) অসম্বদ্ধ, পটাদিও তেমনি অসম্বদ্ধ উভয় ক্ষেত্রে অসম্বন্ধের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নেই। সুতরাং বলতে হবে যে কোন কারণ থেকে যে কোন কার্য্য উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু তা হয় না। কারণে অসম্বদ্ধ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। বিশেষ কারণ থেকেই বিশেষ কার্য্য উৎপন্ন হয়। কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ স্বীকার করতে হলে কার্য্যকে অসৎ বলা যায় না। আমাদের বলতে হয় কার কার্য্য সৎ।

যদি বলা হয়, উৎপত্তির পূর্বে কার্য্য সৎ নয়। সেইজন্য তখন কারণে কার্য্যের সম্বন্ধ থাকে না। কার্য্য স্বোপাদান কারণে অসম্বদ্ধ হলেও কারণব্যাপারের দ্বারা ঐ অসৎ কার্য্য এরই উৎপত্তি হয়। যেহেতু ওই কারণে ঐ কার্য্য শক্তি আছে। যৎ কারণং যৎ কার্য্য নিরূপিতশক্তি বিশিষ্টং তত কারণং তৎ কার্য্যং করতি। অর্থাৎ যে কারণে যে কার্য্য উৎপাদনের শক্তি আছে। সেই কারণ সেই কার্য্য উৎপন্ন করে। যে কারণের সহিত যে কার্য্য সম্বন্ধ, সেই কারণ সেই কার্য্যকে উৎপন্ন করে এইরূপ বলার কোন প্রয়োজন নেই। কারণত্ব সম্বন্ধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়, তা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। মৃত্তিকা তন্ত প্রভতিতে ঘট পটাদির কারণ হয়, যেহেতু মৃত্তিকা

ঘটজননশক্তি, তন্তুতে পটজননশক্তি আছে। তন্তুতে পটজননশক্তি আছে, ঘটজননশক্তি নেই। একথা বলা অভিপ্রেত নয় যে মৃত্তিকাদির সহিত উৎপত্তির পূর্বে ঘটাদির থাকার জন্যই মৃত্তিকাদি ঘটাদির কারণ হয়।

কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ স্বীকার না করে কারণে কার্য্যবিশেষজনক শক্তি স্বীকার করে যে অসৎকার্য্যবাদী সৎকার্য্যবাদ পরিহার করতে উদ্যত হয়েছেন, তা নিরস্ত করার জন্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বললেন– 'শক্তস্য শক্যকরণাৎ'। টীকাকার এই বাক্যের তাৎপর্য প্রকাশ করছেন— এই যে শক্তি স্বীকৃত হলো, যে শক্তি থাকার জন্য প্রত্যেকটি কারণ স্ব স্ব কার্য্য উৎপাদনে ব্যাপৃত হয়, কার্য্যান্তরে জননে উদ্যত হয় না, সেই শক্তি কোথায় থাকে? শক্তি আশ্রয়কে পরিহার করতে পারে না। সুতরাং বলতে হবে— এ সকল কারণে থাকে কিংবা কোনো নির্দিষ্ট কারণে থাকে? যদি সর্বত্র থাকে, তাহলে সকল কারণ হতে বা যে কোনো কারণ হতে সকল কার্য্যের উৎপত্তিরূপ অব্যবস্থা স্বীকার করতে হবে। যদি বলা হয় যে, মৃক্তিকাতে শক্তিই আছে। তার ফলে মৃক্তিকা হতে ঘটই উৎপন্ন হয়, সুতরাং অব্যবস্থা হবে না। এতে জিজ্ঞাসা এই যে, মৃক্তিকাতে ঘট-জনক শক্তি আছে, তার সঙ্গে ঘটের সম্বন্ধ আছে কিনা? যদি সম্বন্ধ না থাকে, তাহলে তাকে ঘটজনিকা শক্তি বলা উচিত নয়। যদি ঘটের সহিত এ শক্তির সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহলে ঘটকে অসৎ বলা যায় না। ঘট অসৎ হলে শক্তির সহিত সম্বন্ধ হবে কিরূপে? সুতরাং বলতে হবে কার্য্য সৎ।

বলা যেতে পারে যে, মৃত্তিকাতে এমন একটি বিশেষ প্রকার শক্তি আছে, যে শক্তি ঘটকেই উৎপন্ন করে। বক্তব্য এই যে- শক্তি সংযোগাদির মতো অনুযোগি-প্রতিযোগি সাপেক্ষ পদার্থ। সংযোগস্থলে যেমন একপদার্থ অনুযোগী ও প্রতিযোগী হয়, শক্তিস্থলে ও সেইরূপ বুঝতে হবে । মৃত্তিকাস্থিত ঘটজননশক্তির অনুযোগী মৃত্তিকা,প্রতিযোগী ঘট । ঘটকে ঐ শক্তির প্রতিযোগী বললে ঘটকে উৎপত্তির পূর্বে অসৎ বলা চলে না। যেহেতুঘটের উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকায় স্থিত শক্তির প্রতিযোগী থাকবে না। এই জন্য যদি এমন কোনো শক্তিবিশেষ স্বীকার করা যায় যে শক্তির প্রতিযোগী অপেক্ষা করে না, তাহলে উৎপত্তির পূর্বে প্রতিযোগিরূপে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করা অপেক্ষিত হয় না। ঐ শক্তিবিশেষ এমন স্বভাববিশিষ্ট যে, যা হতে

কোনো একটি বিশেষ কার্য্যই উৎপন্ন হয়, সকল কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহলে পুবোক্ত অব্যবস্থা হবে না, অথচ কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্বে সৎ বলতে হয় না।

এই মতের বিরুদ্ধে বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন, কল্পিত ঐ শক্তিবিশেষ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ কিনা? যদি ঐ শক্তিবিশেষ কার্য্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত স্বীকার কর, তাহলে ঐ কার্য্যকে সৎ বলতে হবে, যেহেতু অসতের সহিত সতের সম্বন্ধ হতে পারে না। অন্য কোনো প্রকার কল্পিত সম্বন্ধ হলেও তাদাত্মসম্বন্ধ হতে পারে না। অতএব সম্বন্ধের অনুরোধে কার্য্যকে সৎ বলতে হবে। তা নাহলে বলতে হবে যে কোনো কারণ থেকে যে কোনো কার্য্য উৎপন্ন হয়। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যায় না। সুতরাং কার্য্য সৎ। পূর্বপক্ষী বলতে পারেন যে, কার্য্যকারণভাব অম্বয়-ব্যতিরেক দ্বারা সিদ্ধ হয়। যার সহিত যার অন্বয়ব্যতিরেক আছে, তাদের মধ্যে কার্য্যকারণভাব সিদ্ধ হয়। মৃত্তিকা থাকলে ঘট হয়, মৃত্তিকা না থাকলে ঘট হয় না। এইরূপ অন্বয়ব্যাতিরেকের দ্বারাই মৃত্তিকার কারণত্ব ও ঘটে কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয়। এর জন্য কার্য্যকারণের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ বা শক্তিবিশেষ স্বীকার ও তদনুরোধে উৎপত্তির পূর্বে কার্য্যের সত্ত্ব স্বীকার অনাবশ্যক বা গৌরবদোষগ্রস্ত হয়।

এইরূপ আক্ষেপের সমাধানে অপর একটি হেতুর দ্বারা সৎকার্য্যবাদ সাধিত হচ্ছে- কারণভাববাচ। এখানে ভাব শব্দের অর্থ তাদাত্য বা স্বরূপ। কার্য্যটি কারণতাদাত্ম্যাপন্ন হয়। এখানে বলা হল কার্য্য সর্বদা স্বীয় উপাদান কারণের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধে থাকে। এই জন্য কার্য্য সকল সময়ে কারণাত্মকই। কোনো কার্য্য স্বীয় উপাদান কারণ হতে ভিন্ন হয় না। এইরূপে বস্তুস্থিতি হলে কার্য্যকে অসৎ বলা যাবে না। যেহেতু ঐ কারণ সৎই হয়। সৎ কারণের সহিত অভিন্ন কার্য্য অসৎ হতে পারে না। সুতরাং সাংখ্য মতে কার্য্য সৎ।

তথ্যসূত্র নির্দেশ

১. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৮২, পৃ. ৯০,

২. শ্রীপূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১, পৃ. ৯,

৩. শ্রীপূর্ণচন্দ্র, সাংখ্যকারিকা, বেদান্তচুঞ্চু-সাংখ্যভূষণ, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১, পৃ. ৭৫,

৪. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৮২, পৃ. ৯৩,

৫. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৮২, পৃ. ৯৪,

৬. ঐ

৭. ঐ

৮. ঐ

৯. শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ১৯৮২, পৃ. ৯৫,

১০. ঐ

গ্রন্থপঞ্জী:

১. মিশ্র, বাচস্পতি, সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী, শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার,

১৯৮২.

২. ঈশ্বরকৃষ্ণ, সাংখ্যকারিকা, শ্রী পূর্ণচন্দ্র শর্মা সম্পাদিত, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯০১.

৩. ভট্টাচার্য, শ্রীবিধুভূষণ, সাংখ্যদর্শনের বিবরণ, কলিকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৮৪.

INDIA - BANGLADESH RELATIONS DURING COVID-19 PANDEMIC SITUATION: A PERSPECTIVE OF STUDY

Bishnu Pada Barman
Assistant Professor, Department of Political Science
Bagnan College, Bagnan, Howrah (W.B), 711303

Abstract: *Bangladesh and India are the two friendliest states in South Asia. So, this is why India and Bangladesh relations are very important nowadays. Bangladesh and India have many similarities, like – Geography, Economics, Cultural, etc. They have also close friendships with each other till now. It is also true that India contributed much to the liberation war of Bangladesh in 1971, which led to the birth of Bangladesh. However, there are a few issues against the relationship between India and Bangladesh like India - Bangladesh boundary problem, water sharing problem, refugee problem, smuggling, terrorism, etc. But in recent times India – Bangladesh relationship is now growing. In January 2019 Sheikh Hasina, the Prime Minister of Bangladesh visited India and on the other hand, Indian Prime Minister Narendra Modi also visited Bangladesh in the same year. Modi described the relationship between the two countries as a 'golden era' (Sonali Adhaya) (Bhattacharya Jayeeta 2021). India is the first country to recognize Bangladesh as an independent country and she also helped Bangladesh during the time of independence war and till now, especially during the COVID-19 pandemic situation in many ways. They also have smooth relationships through historical perspectives. But nowadays a large number of Bangladeshi people think that Bangladesh and India's relationship is going to be deteriorated. However, India is always ready to help Bangladesh in every dangerous situation like a 'Big Brother'.*

Keywords: *Background, Neighbourhood, Covid-19, Vaccine Diplomacy, South Asian Region.*

Introduction

In South Asia India and Bangladesh have been close friends and neighbours since the time of birth in Bangladesh and even now. But sometimes it was not going well. While geographically they have long borders and areas with some issues like- refugee problems, water sharing problems, etc. Still, they have kept their overall good relations for a half-century more. India and Bangladesh share bonds of history, language, and the cultural multitude of other commonalities. Basically, in COVID-19 situations India and Bangladesh relations stood like a question mark (?). Many pro-Pakistani Bangladeshis do like India, but in the Covid-19 situation, India helps Bangladesh in many ways. The year of 2020 on covid -19 pandemic situation witnessed intense high-level engagement at political and official levels beginning with the exchanges of New Year greetings between Narendra Damodardas Modi, Hon'ble Prime Minister of India and Sheikh Hasina, Prime Minister of Bangladesh on January 01, 2020. Prime Minister Narendra Modi participated in the birth centenary celebration of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman through a video conference on 17th March 2020 and his telephonic calls to PM Hasina on 29th April to convey greetings on the coactions of the holy months of Ramadan and to discuss the regional situations in the wake of the COVID-19 Pandemic and again on 25 May 2020 to convey the Eid greetings reflects the bonds of friendship between the two countries. The two Prime Ministers held a summit on a virtual platform on 17th December 2020 and discussed all aspects of bilateral relations and exchanged views on regional and international issues. On this occasion, both countries signed seven bilateral pacts in various sectors including hydrocarbons, agriculture, trade, development projects, and conversation of heritage. The two Prime Ministers also jointly unveiled a postal stamp issued by the government of India to commemorate the birth centenary of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. On these occasions, two bilateral projects over the beautification and city development projects in

Rajshahi City and the construction of Khalispur Collegiate Girl's School in Khulna were also inaugurated (SIRU 2021).

The External Affairs Minister (EAM) of India Dr S. Jaishankar along with the Foreign Affairs Minister of Bangladesh Dr A K Abdul Momin co-chaired the Joint Consultative Commission (JCC) a virtual platform on 29th September 2020 and the two Ministers jointly unveiled a commemorative postal stamp issued by the government of Bangladesh on the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. The EAM also visited Dhaka in March 2021. The visits of Foreign Secretary Harsh Vardhan Syringa to Dhaka in March and August and the foreign office consolations in New Delhi in January 2021 also energized bilateral relations.

In addition to the above high-level engagements between the two countries, there have also been several interactions at the senior official level in various bilateral mechanisms. The multidimensional cooperation between the two countries ranges from the traditional sectors of tourism, health, and education to frontier technologies of nuclear science, space, and informal technology.

Objectives

India-Bangladesh is the two most powerful friendship states in the South Asian region. As such their relations are to be closed to the starting of the South Asian region. Bangladesh is also a neighboring country and all over the friendship part of India. And India has a vital role in Bangladesh's independence. Sometimes it kept a need for good relations between those countries. Many other terrorists are hiding in Bangladesh in some places. Some issues between Bangladesh and India stand against them, like- border issues, water-sharing problems, etc. But in the COVID-19 Pandemic Situation, both countries are not doing well. They needed to help each other during the COVID-19 Pandemic situations. Both countries helped and cooperated with each other. If they would not help each other, it would not be easy to cover

the COVID-19 Pandemic Situation. Both the country's Leaders and other higher Government officers met each other to discuss how to tackle the situation. However, India played a big brother role.

India -Bangladesh relations are very important in South Asia. India and Bangladesh to both countries they are close friends and depend upon each other directly or indirectly. So, if we look here that there are some objectives of India-Bangladesh relations during the COVID-19 Pandemic (Situation Pattanaik, Smruti S. March 23, 2021)-

(i) To identify the problems and Cooperation between India and Bangladesh relations during the COVID-19 Pandemic Situation.

(ii)To identify the factors that influence India - Bangladesh relations during the COVID-19 Pandemic Situation.

(iii) To discuss the factors or things against India - Bangladesh relations during the COVID-19 Pandemic Situation?

Background

'Big Brother' India stretched her hand and dispatched 10 containers of liquid medical oxygen to Bangladesh to help Bangladesh during the COVID-19 Pandemic Situation. A train left for Bangladesh from Tatanagar, Jamshedpur carrying 200 tonnes of oxygen.

Neighbourhood first: India rushed to Bangladesh to fight COVID-19: After the country-wide lockdown was announced India was the first country to reach out to its trusted neighbour(s) Bangladesh in combating coronavirus. The first batch of humanitarian aid was dispatched to the neighbouring countries including Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan, and Maldives. India has always been a first responder to any crisis in the region and has always extended a helping hand. According to Bangladeshi expert Gautam Lahiri, India swiftly handed over 0.03 million surgical masks and 0.015 headcovers

to Bangladesh to prevent the spread of coronavirus. Riya Das Ganguly, Indian High Commissioner to Bangladesh handed over all these items to Bangladesh Foreign Minister A. K. Abdul Momin on March 25th. The Indian government decided to export Hydroxychloroquine medicine to its neighbouring countries including Bangladesh and India did it to help its neighbours. Not only this, India had announced a complete lockdown in the country and sealed the border and showed a special way to allow the Bangladesh Government to take back its citizens who were stranded in different cities of India. The Indian Government had to accept the unusual demand of Bangladesh to make special arrangements to help ferry stranded people from that country to the nearest airport. This was done in coordination with the Dhaka mission in New Delhi by the Minister of External Affairs (Siddiqui Huma, April 23, 2020). As a result, more than 400 Bangladeshi had to return to their Country by charter private flights. On the other hand, there were many Indians stranded in Bangladesh and they were also putting pressure on the Indian High Commissioner at Dhaka but the Indian Government was trying to convince them to stay there till the lockdown was lifted. Though it is necessary as a basic precaution, the Government of Bangladesh was putting a lot of pressure on urging New Delhi to take them back.

Indian Army sent teams to Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, and Afghanistan to fight COVID-19:

The Indian Army was readying separate teams to be deployed in Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, and Afghanistan to help those countries boost capabilities to deal with rising cases of coronavirus. Fourteen members of the Indian Army team were sent to Maldives to help the island nation in setting up coronavirus testing Laboratories and to train local medical professionals to fight the pandemic. India had also played a key role in pursuing a common framework in fighting the pandemic in the SAARC region through a video conference on March 15th and Prime Minister Narendra Modi pitched for formulating a joint strategy to fight COVID-19 in the SAARC region and proposed an

emergency fund with an initial offer $ 10 million from India. It is understood that India has/had always been ready to contribute and help. Hydroxychloroquine was identified by the US Food and Drug Administration as a possible treatment for COVID-19 and it is being tested on more than 0.015 million coronavirus patients in New York. In the neighbourhood, India had sent the drug to Bangladesh and neighbouring countries (Wikipedia April 2020).

Security and Border Management:

51st Director General level talks (DGLT) between Border Security Force (BSF) and Border Guard Bangladesh (BGB) were held on 22-26 December 2020 in Guwahati. In addition, border coordination conferences between regional commanders of BGB (Border Guard Bangladesh) and the frontier Inspector General of BSF (Border Security Force) were also held regularly to discuss the management and security of 4096.7 KM of the India – Bangladesh land Border.

Defence Cooperation:

High-level exchanges in 2020 included the Second edition of the India – Bangladesh Corpat 'Bangosagar' exercise held on 03.05.2020. Regional Commanders meeting of Coast Guards on 19 October 2020, and the third Annual Defence Dialogue on 02 November 2020 were held. The Indian Army gifted trained horses and dogs to the Bangladesh Army in November 2020. The Indian Air Chief visited Bangladesh on an official visit in February 2021.

Connectivity:

Both governments understood various measures to restore the prevailing links and other connectivity links existed between India and Bangladesh. During the visit of Sheikh Hasina to New Delhi in October 2019, the government decided to commence the Dhaka-

Siliguri, Gangtok- Dhaka, and Darjeeling-Dhaka Bus service to enhance people-to-people contacts between both the countries and the trial run of Dhaka-Siliguri, Gangtok -Dhaka was also held in December 2019. Both Prime Ministers jointly inaugurated the newly restored railway link between Chilahati (Bangladesh) and Haldibari (India) on 17th December 2020. To enhance people-to-people Contact it was the frequency of two passenger trains– Maitree Express and Bandhan Express increased from 4 days a week to 5 days a week and from one day a week to two days a week respectively from February 2020. Both countries also started using side door containers and parcel trains to maintain uninterrupted supply chains during the ongoing COVID-19 pandemic. The Indian government handed over 10 broad gauge diesel locomotives as a part of grant assistance to Bangladesh Railways on 27 July 2020. Fenni Bridge (Maitree Setu) connecting LCS (Land Custom Station) Sundarbans (Tripura) and LCS (Land Custom Station) Ramgarh (Bangladesh) has been jointly inaugurated on a virtual platform by both Prime Ministers in India in March 2021.

The second addendum to the Protocol on Inland Water Transit and Trade (PIWTT) was signed in May 2020 to include new India-Bangladesh protocol Routes (Sonamura-Daudkandi) on river Gomti and extension of Dhulia to Godagiri up to Aricha on river Padma, five new parts of calls and two extended parts of calls. Sonamura – Daudkhandi protocol routes were also operationalized in September 2020. The trial run of the transshipment of Indian goods from Kolkata to Agartala via Chattagram was successfully conducted in July 2020.

Economic and Commercial:

Bangladesh is India's biggest trade partner in South Asia and India is the second biggest trade partner of Bangladesh. Bilateral trade between India and Bangladesh has grown steadily over the last decade and the exports of Bangladesh have tripled over the last decade to cross $1bn in 2018-2019. In the Financial Year 2019-2020, India's exports to Bangladesh were $8.2 bn and imports were $1.26bn. Meetings of

various institutional mechanisms to promote bilateral trade including the secretary-level meeting of commerce and shipping ministries LCS (Land Custom Station) and ICP (Integrated Check Post) infrastructure and establishment of Indian economy zone etc. To promote cooperation on bilateral trade the India - Bangladesh CEO’s forum was launched in December 2020 to provide policy-level inputs in various areas of trade and investment and to facilitate exchanges among the business communities of both countries. The first meeting of the India-Bangladesh textile industry forum was held in February 2020 to enhance linkages and collaboration in the power sectors and has become one of the hallmarks of India-Bangladesh relations. Bangladesh was/is currently importing 1160 MW of power from India. The Joint Working Group (JWG) and Joint Steering Committee (JSC) on power provide an institutional framework to promote bilateral cooperation in cross border trade of electricity (Khatun E. Zannat at all, 2021).

Development of Partnership

Bangladesh and India are the biggest development partners today. India has today extended 3 lines of credit (LOC) to Bangladesh in the last 85 years amounting to $8 billion for the development of infrastructure in various sectors including roads, railways, shipping, and ports. In addition, the government of India has also been providing grant assistance to Bangladesh for various infrastructure projects including the construction of the Akhaura-Agartala Railway link, and the dredging of inland waterways construction in Bangladesh (India – Bangladesh pipeline). High-Impact Community Development Projects (HICDPs) constitute an active pillar of India’s development assistance. The government of India has founded 68 HICDPs including the construction of student hostels, academic buildings, skill development, training institution cultural centers, etc. in Bangladesh.

Capacity Building and Human Resource Development

Human resources development is a key component of India’s development cooperating efforts in Bangladesh through its several on-trained programs and scholarships. The government of India has trained 1800 Bangladeshi Civil service officials since 2019 at the National Centre for Good Governance (NCGG), Mussoorie. Bangladeshi Police officials are also being trained at various premier training institutes in India on various modern policing and new investigative techniques of this information age. Similarly, the government of India has extended training for 1,500 Bangladeshi Judicial officials since 2017 at the National Judicial Academy Bhopal and various state judicial Academics in India. Bangladesh is also an important ITEC partner country and annually around 800 participants from Bangladeshi avail of the ITEC training Courses. In addition, 200 scholars are awarded by ICCR (Indian Council for Cultural Relations) every year to students from Bangladesh for Pursuing Undergraduate, and M.Phil/Ph.D. courses in the IITs and NIITs.

Cultural Cooperation

The year 2021 was historic in India-Bangladesh relations as both countries commemorated the fiftieth anniversary of the liberation war of Bangladesh over Pakistan and the establishment of diplomatic relations between India and Bangladesh. Both countries have made efforts to jointly organise several activities to commemorate these two types of epochal events in India, Bangladesh, and other countries. The Indira Gandhi Cultural Events (IGCE) in Dhaka play an important role in celebrating common cultural links between the two countries. Its training programs including Yoga, kathak, Manipuri dance, Hindi language, Hindustani classical music, and the cultural programs of the renowned artists of India and Bangladesh contribute to the promotion of people-to-people contacts.

Visas

In pursuance of the policy of the government of India to further liberate the Indian visa application process and to strengthen people-to-people contacts between India and Bangladesh. Six new Indian visa application centres (IVACs) were opened in Camilla, Noakhali, Thakurgaon, and Bagura of Bangladesh in 2019 raising the total number of IVCs to 15. In 2019 the number of visas issued to Bangladeshi citizens crossed the rank of 1.6 million. Opening two new Assistance High Commissions in Khulna and Sylhet in 2019 has also helped in facilitating efficient and quick visa processing for Bangladeshi Nationals. Both countries have commenced a temporary air travel bubble to facilitate the urgent requirements of travellers from India and Bangladesh during the COVID-19 pandemic situation.

Cooperation to Tackle the Challenge of the COVID-19 Pandemic situation

Prime Minister Sheikh Hasina participated in the video conference of leaders of SAARC countries on 15th March 2020 at the invitation of Prime Minister Modi to share assessments of the minimise and mitigate the spread of diesel. As part of bilateral assistance, the government of India has extended three tranches of medical assistance including 0.03 million surgical masks, 0.0015 million head covers, 0.05 million surgical latex gloves, 0.1 million hydroxychloroquine medicines tablets, and RT-PCR test kits capable of running, 0.03 million tests in March -April 2020 to Bangladesh assist in its efforts to fight against the COVID-19 Pandemic. The government of India has also conducted various online training modules to train the health professionals of Bangladesh on the treatment and care of COVID-19 patients. In January 2021 the government of India gifted 2 million Covid Shield (Oxford-Astrazeneca Vaccines) to Bangladesh to assist in its efforts to fight against the pandemic. The Government of Bangladesh BEXIMCO Pharmaceuticals Limited of Bangladesh and

the Serum Institute of India (SII) have signed a trilateral MOU to procure 3 core doses of COVID-19 vaccines from the SII (Islam, Md. Shariful 30 May 2022).

COVID-19 pandemic cooperation

Bangladesh started mass COVID-19 vaccinations with India's Serum Institute Covid Shield vaccines. Bangladesh procured 7 million doses and India had meant to gift a further 3.3 million doses. Due to a second wave of COVID-19 in India, the vaccine export was halted. It hampered the vaccination program in Bangladesh.

Bangladesh sent medicines and medical equipment to India following the deteriorating COVID-19 situation in India. The relief package consisted of approximately 0.01 million vials of_Ramdev Sivir, (produced in Bangladesh by Beximco) for anti-viral infections, oral antiviral, 0.03 million PPE kits, and several thousand zinc, calcium, vitamin C, and other necessary tablets. In May 2021, the government of Bangladesh sent a second consignment of COVID-19 relief consisting of antibiotics, paracetamol, protective equipment, and hand sanitizer (Bawa, Singh, and all. 2022).

The Partnership of Hope: Bangladesh Contributes to Supporting to Fight COVID-19

During the COVID-19 situation, India helped Bangladesh in many ways in the fight Against the Coronavirus. As a neighboring friend India helps Bangladesh and Bangladesh was one of the countries which received Indian COVID-19 Vaccines under the ‘’Vaccine Maitri Mission”. India supplied Bangladesh with Antibiotics, Paracetamol, different kinds of injections, Vias, hand sanitizer, etc. which also might face shortages due to increased raw materials prices (SIRU 2021).

Vaccines received by Bangladesh from India and China (in million doses)

Country	Grant	Commercial	Total
India	3.3	7	10.3
China	0.5	0	0.5

(Bose Sohini June, 2021)

The support from India, Bangladesh has declared that Relations with India suggests stronger relations in the future. And, Indian Prime Minister Narendra Modi states that Bangladesh is a major pillar of India's neighbourhood first policy and so the gesture apart from being gladly received on humanitarian grounds also gives an affirmation to India's diplomatic Policies" (Bhattacherjee Kallol, December 17, 2020).

This paper explores the impact of COVID-19 on shopping behaviour in two neighbouring developing economies: Bangladesh and India. While the previous studies investigating the impact of COVID-19 on shopping behaviour have relied on Revealed Preference (RP) data, this paper combines RP and Stated Preference (SP) data to develop joint RP-SP discrete choice models. This makes it possible to quantify the relative impact of the situational contexts on the choice of shopping modes of households and to capture the associated heterogeneity arising from the characteristics of the households. Further, a comparison of the data and the estimated model parameters of the two countries with substantial socio-cultural similarities provide insights into how differences in the state of e-commerce can lead to different levels of inertia in continuing the pre-COVID behaviour. The results will be useful to planners and policymakers for predicting shopping modes in different future scenarios and formulating effective restriction measures.

Conclusion

In the COVID-19 pandemic situation, India and Bangladesh relations played a new role in the South Asia region. India played a big role during the COVID-19 pandemic situation in South Asian regional countries and helped many countries, specially on priority basis India helped Bangladesh. During COVID -19 India's COVID policy was that 'neighbourhood first' and India observed her responsibilities in all manners in the COVID-19 situation.

References

1. Bhattacharjee, Joyeeta. "Migration, river management, Radicalisation: What does the future hold for India-Bangladesh relations?" *OBSERVER RESEARCH FOUNDATION* (2021): 34.

2. (SIRU), Strategic Investment Research Unit. *Wikipedia*. MAY 21, 2021. <https://www.investindia.gov.in/team-india-blogs/partnerships-hope-bangladesh-contributes-supporting-india-fight-covid-19>.

3. (India), Ministry of External Affairs. *Wikipedia*. 2021. <https://mea.gov.in/Portal/ForeignRelation/India_Bangladesh_bilateral_brief.pdf>.

4. Siddiqui, Huma. "Neighbourhood first: India rushed help to Bangladesh to fight COVID-19." April 23, 2020. <https://www.financialexpress.com/business/defence-neighbourhood-first-india-rushed-help-to-bangladesh-to-fight-covid-19-1937353/>.

5. PTI. *Wikipedia*. April, 2020. <https://theprint.in/defence/indian-army-to-send-teams-to-

sri-lanka-bangladesh-bhutan-afghanistan-to-fight-covid-19/406226/>.

6. Bose, Sohini. "Bangladesh: Navigating Diplomacy Challenges in Search for Vaccines." *Observer Research Foundation* (June 2021). <https://www.orfonline.org/research/the-dynamics-of-vaccine-diplomacy-in-indias-neighbourhood/>.

7. Pattanaik, Smruti S. "COVID-19 Pandemic and India's Regional Diplomacy." *South Asian Survey,* Volume 28. Issue 1, (March 23, 2021).

8. Islam, Md. Shariful. *Fifty Years of Bangladesh-India Relations: Issues, Challenges and Possibilities*. Pentagon Press, 30 May 2022.

9. Bawa, Singh, et al. "India's Neighbourhood Vaccine." *Journal of Asian and African Studies* (2022): 18.

10. Chakraborty Prosenjit, C. *Covid-19 India & The World*. 1st edition. India: Notion Press, 2 February 2022.

11. Bhattacherjee, Kallol. "Bangladesh is a major pillar of 'neighbourhood first' policy, says PM Modi." December 17, 2020. <https://www.thehindu.com/news/national/bangladesh-pillar-of-neighbourhood-first-policy-pm-modi/article33353610.ece>.

12. Zannat Khatun E, Bhaduri Eeshan, Goswami Arkopal K, Choudhury Charisma F. "The tale of two countries: modeling the effects of....." *The International Journal of Transportation Research* Vol 13 (2021): 11.

পরিশিষ্ট

ক্ষত্রিয় পত্রিকা, ৭ম সংখ্যা, ৪র্থ বর্ষ,-র পুনর্মুদ্রণ

ক্ষত্রিয়।

(ক্ষত্রিয় সমিতির মুখপাত্র)

৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক,

৭ম সংখ্যা ১৩৩১।

সর্ব্বমাত্মা বশং সুখং।

সর্ব্বং পর বশং দুঃখং।।

সম্পাদক— শ্রীযোগেন্দ্রনাথ রায় বি. এ.

শ্রীপ্রসন্নকুমার বর্ম্মা।

রঙ্গপুর, রত্নাকর প্রেস।

প্রিন্টার—শ্রীকিশোরীমোহন দাস দ্বারা মুদ্রিত

ও

রঙ্গপুর ক্ষত্রিয়-সমিতি হইতে

শ্রীকামিনীকুমার সিংহরায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৩৩১

প্রতি সংখ্যা ১০ আনা । বার্ষিক মূল্য সডাক ২ টাকা

বিজয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্।

গাইবান্ধা।

আমাদের বিজয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ নামক ছাপাখানায় সর্ব্বপ্রকার ইংরেজি ও বাঙ্গালা পুস্তক, চেক, দাখিলা, নিমন্ত্রণ পত্র, প্রীতি-উপহার পরীক্ষার প্রশ্ন প্রভৃতি যথাসম্ভব সুলভ মূল্যে ও অল্প সময়ে ছাপাইরা দেওয়া হয়। নবঃস্বলের কাজ যত্নের সহিত নির্দিষ্ট সময়ে সুলভে করিয়া দেওয়া হয়। সর্বসাধারণের সহানুভূতি ও পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

আমাদের স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ন নামক পুস্তকের দোকানে স্কুলপাঠ্য ও অন্যান্য সর্বপ্রকার পুস্তক সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

ম্যানেজার—বিজয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,

গাইবান্ধা।

সূচী

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সুদর্শন সিদ্ধি বা অগ্নিবর্ণ পরিনাম নাটক	শ্রীপূর্ণানন্দ রায় বিরচিত	১২১-১২৫
সংসর্গ	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র রায়	১২৬-১২৮
দুটা ধারা	শ্রীঅমৃতলাল রায়	১২৯
শ্রীবৎস-চিন্তা	শ্রীমহাদেবচন্দ্র রায়	১২৯-১৩২
বঞ্চিতা	শ্রীমতী তরুবালা দেবী	১৩৩-১৩৫
নারীর রূপ		১৩৬-১৩৯
গঙ্গাযাত্রী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য	শ্রীবাবুরাম রায় বর্ম্মা	১৪০-১৪২
বিবিধ প্রসঙ্গ	সম্পাদক	১৪২-১৪৪

ওঁ পরমাস্মনে নমঃ।

৪র্থ বর্ষ, কার্ত্তিক,

ক্ষত্রিয়।

৭ম সংখ্যা ১৩৩১।

ন শ্রীকুল ক্রমাগতা ভূষণোল্লিখিতাপি বা
খড়্‌গরাক্রম্য ভূঞ্জিত বীরভোগ্যাবসুন্ধরা।।

সুদর্শন সিদ্ধি

বা

অগ্নিবর্ণ পরিণাম।

প্রথম অঙ্ক।

চতুর্থ দৃশ্য।

অগ্নিবর্ণ—কোশলের নবীন রাজা, মুঞ্জরা—অগ্নিবর্ণ পত্নী, শীঘ্রগ—অগ্নিবর্ণ পুত্র, সরল—মন্ত্রীপুত্র।

রাজান্তঃপুরস্থ উদ্যান।

শীঘ্রগ ও মুঞ্জরার প্রবেশ।

মুঞ্জরা। (অৰ্দ্ধ স্বগতঃ) ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠেই পাগল ছেলে সেই এক গোঁ ধরেছে—

"চল্ মা বাগানে যাই—চল্ মা বাগানে যাই।" কত কর্‌লুম কিছুতেই থামাতে পার্‌লুম না।

(শীঘ্রগের প্রতি) বল ত বাবা এখন, বাগানে কি দেখ্‌তে এলে?

শীঘ্রগ। বাগানে আর কি দেখ্‌তে আসবো মা, এই বাগানই দেখ্‌তে এলুম। বাগানের গাছগুলো দেখ্‌তে এলুম, গাছের ফুলগুলো দেখ্‌তে এলুম, আর দেখ্‌তে এলুম ফুলের বাহার। কেন মা, সকাল বেলাটা বাগানে বেড়া'লে মনটা বেশ ভালো লাগে।

মুঞ্জরা। (অৰ্দ্ধ স্বগতঃ) কথায় পারবার যো নাই।

শীঘ্রগ। হ্যাঁ মা, ঠাকুর দাদা সে দিন সাধুদের মতন রঙ্গিন কাপড় পরে কোথায় গেলেন মা ?

মুঞ্জরা। ঠাকুর দাদা তোমার সন্ন্যাসী হ'য়ে বনে গেলেন বাবা।

শীঘ্রগ। বনে কি করতে যায় মা ?

মুঞ্জরা। বনে যায় বাবা তপস্যা করতে।

শীঘ্রগ। তপস্যা করতে! তপস্যা কি মা ?

মুঞ্জরা। (স্বগতঃ) পাগল ছেলে যা ধরবে তা শেষ না ক'রে কিছুতেই ছাড়বে না। তপস্যা যে কি তা' একে আমি কি ক'রে বুঝাই। (প্রকাশ্যে) বাবা! তুই ছেলে মানুষ—তুই তপস্যার কথা শুনে কি করবি বাপ?

শীঘ্রগ। কেন মা—ছেলে মানুষ ব'লে কি তপস্যার কথা শুন্‌তে নেই? এ আবার কেমন ধারা কথা মা, ছেলে মানুষ শুন্‌তে পারে না?

মুঞ্জরা। (স্বগতঃ) পাগল ছেলে কিছুতেই ছাড়বে না। (প্রকাশ্যে) তপস্যা বাবা, ভগবানকে পাওয়ার জন্য সাধনা। তপস্যা ক'রে মানুষ ভগবানকে পায়।

শীঘ্রগ। ঠাকুর দাদা তাহ'লে মা, ভগবানকে পাবেন? তা বেশ হবে। হ্যাঁ মা তুই সেদিন বলেছিস্ আমাদের পূর্ববংশের ভগীরথ নামে একজন রাজা ছিলেন।—তিনি স্বর্গ হ'তে গঙ্গাদেবীকে এনেছিলেন। তিনি গঙ্গাদেবীকে কেন এনেছিলেন মা?

মুঞ্জরা। গঙ্গাদেবীকে এনেছিলেন বাবা,—পিতৃগণের উদ্ধারের জন্যে।

শীঘ্রগ। কেন মা, গঙ্গাদেবী ছাড়া কি আর কেউ পিতৃগণের উদ্ধার করতে পারেন না?

মুঞ্জরা। পারে বৈ কি বাবা, প্রাণ মন দিয়ে সেই সর্ব্বব্যথাহারী ভগবানকে ডাকলে, তিনি মনের পাপ তাপ সমস্ত দূর ক'রে উদ্ধারের পথে নিয়ে যান। তবে বাবা! গঙ্গাদেবীর মাহাত্মাও কম নয়। তাঁর পবিত্র জল স্পর্শ করা মাত্রেই সমস্ত পাপা তাপ দূর হয়ে যায়।

শীঘ্রগ। তা'হ'লে গঙ্গাদেবী খুব মহাত্মা মা?

মুঞ্জরা। হ্যাঁ বাবা।

শীঘ্রগ। আচ্ছা মা! ঠাকুর দাদা তা'হ'লে বনে কষ্ট করতে গেলেন কেন মা? বনে ত সেই গাছের ফল মুল খেয়ে থাকতে হয়? তার চেয়ে তিনি গঙ্গাদেবীর জলে সমস্ত পাপ ধুয়ে ফেলে সেই ব্যথাহারী ভগবানকে ডাক্‌লেই ত পার্‌তেন মা?

মুঞ্জরা। পারতেন বৈ কি বাবা? তবে তোমার ঠাকুরদাদা যে পথে গেছেন, তাহাও সেই ভাগবান লাভের একটা পথ। ও পথে গেলেও তাঁকে পাওয়া যায়। (স্বগতঃ) এই স্বভাবসরল পুত্র-রত্নকে পেয়ে যথার্থই আমি সুখে আছি। হে দয়াময় প্রভু। আমার এই প্রার্থনা—সুখের এই অমূল্য রত্নটি হ'তে এ হতভাগিনী যেন বঞ্চিত না হয়।

শীঘ্রগ। আমি কিন্তু মা, ও-পথে যাব না। আমি খুব ক'রে গঙ্গাজলে স্নান কর্‌বো আর সেই সর্বব্যথাহারী ভগবানকে ডাক্‌বো। কেমন, তা' হ'লে হবে না মা?

মুঞ্জরা। কেন, হবে না বাবা? (স্বগতঃ) সরলস্বভাব শিশুর হৃদয়ে কি সরল বিশ্বাস! এই রত্নটিকে পেয়ে যথার্থই আমি ভাগ্যবতী।

শীঘ্রগ। হ্যাঁ মা! বাবা রাজা হয়েছে, তুই রাণী হয়েছিস্, আমি তবে কি হব মা?

মুঞ্জরা। কেন বাবা তুই রাজপুত্র হয়েছিস্।

শীঘ্রগ। আমি রাজপুত্র হয়েছি! আমি যদি রাজপুত্র হ'য়েছি মা, তবে তুই কেন খালি রাণী হলি, বাবা কেন খালি রাজা হ'লেন?

মুঞ্জরা। তা' নয় ত কি বাবা?

শীঘ্রগ। তা' কেন হবে মা! আমি যদি রাজপুত্র, তবে তুই রাজরাণী, বাবা রাজ-রাজা। কেমন তাই নয় মা?

মুঞ্জরা। (হাসিয়া) হ্যাঁ বাবা তাই।

শীঘ্রগ। আচ্ছা মা রাজা হয় কেন? রাজা হ'লে কি সুখ হয়? সুখের জন্যই কি মানুষ রাজা হয়?

মুঞ্জরা। সুখের জন্য রাজা হয় না ত কি দুঃখের জন্য হয় বাপ?

শীঘ্রগ। হ্যাঁ, মা, সরল কাকা তো তাই বলেন। সরল কাকা আমাকে বড্ড ভালোবাসেন, তিনি কি আর আমাকে মিছে কথা বল্‌বেন। মা! সরল কাকা বলেন, রাজা হ'লে সুখের চেয়ে দুঃখেই বেশী। তবে মা, বাবার ত রাজা হওয়া ঠিক হয় নাই? রাজা হলে যদি বড্ড দুঃখ পেতে হয়, তবে বাবা রাজা হলেন কেন? আমি কিন্তু রাজা-টাজা হব না! সরল কাকা বলেন, ভগবানকে ডাকলে খুব সুখ পাওয়া যায়। আমিও মা রাজা টাজা না হয়ে ভগবান কে ডাক্‌বো।

মুঞ্জরা। মন্ত্রী মহাশয়ের পুত্র সরল, বাস্তবিকই যেন সরলতার প্রতিমূর্তি। তাঁর মনে কুটীলতার লেশ মাত্রও নাই। আমাকেও সে যার পর নাই ভক্তি করে। বাবা আমার তাঁর কাছে থেকে থেকে যেন যেন তারই মত হ'তে যাচ্ছে।

(শিকার-সজ্জায় সজ্জিত অগ্নিবর্ণের প্রবেশ।)

অগ্নিবর্ণ। কি মুঞ্জরা! আজ যে অতি প্রত্যুষেই উদ্যানে বেড়াতে এসেছ? নূতন রাণী হয়েছ—তাই বুঝি আদব কায়দা বদ্‌লে নিচ্ছ?

মুঞ্জরা। হ্যাঁ, তাই। আর তুমি বুঝি, নূতন রাজা হয়ে দিগ্বিজয়ে যাচ্ছ তাই এ বেশে?

অগ্নিবর্ণ। কতকটা অনুমান ক'রেছ বটে, তবে দিগ্বিজয়ে নয়—পশু বিজয়ে।

মুঞ্জরা। ও—পশু বিজয়ে! অনেকটা আশ্বস্ত কর্‌লে। আমি ভাবছিলুম বুঝি দিগ্বিজয়েই যাচ্ছ? তা প্রভু! হঠাৎ পশু বিজয়ের সখটা উঠলো কেন? রাজাগিরির আদব কায়দা শিখ্‌তে বোধ হয়?

অগ্নিবর্ণ। বটে মুঞ্জরা! আজ বাগানে এসে বুঝি প্রকৃতি সুন্দরীর সব রসটুকু পেতে ভরে নিয়েছ।

মুঞ্জরা। হ্যাঁ সবটুকু নিয়েছি তোমার জন্য কিছুই রাখি নি।

অগ্নিবর্ণ। তাই দেখ্‌ছি।

শীঘ্রগ। হ্যাঁ বাবা, তুমি পশু বিজয়ে যাচ্ছ। পশু কি বাবা?

মুঞ্জরা। পশু বিজয় জান না বাবা? বনের মধ্যে যত বাঘ শূকর আছে, তাদের তাদের দেখাতে চায়—নূতন রাজার কত শক্তি? (অগ্নিবর্ণের প্রতি) তা' সত্যই কি তুমি শিকারে যাচ্ছ?

অগ্নিবর্ণ। সত্যি না ত কি এ সব সাজ পোশাক শুধু তোমাকেই দেখাবার জন্য পরিধান ক'রে এসেছি?

মুঞ্জরা। শিকারে যাচ্ছ— তা' আমার একটা আবদার রাখবে কি?

অগ্নিবর্ণ। বল না কি? কোন্ দিন তোমার আবদার রাখিনি?

মুঞ্জরা। আবদার আর কিছু নয়—শুনলে হাসবে না ত ?— একটা হরিণশাবক।

অগ্নিবর্ণ। হরিণশাবক! কেন হরিণশাবকের যে এত সখ? ও দিয়ে কি হবে?

মুঞ্জরা। আগে আনই না। তারপর শুনবে কি হবে। (অগ্নিবর্ণের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টি পূর্বক ঈষৎ হাসিয়া) হরিণশাবক দিয়ে আর কি হবে—ওকে পুষবো।

অগ্নিবর্ণ। বলিহারী সখ! আচ্ছা, যখন বলেছ—চেষ্টা করা যাবে।

শীঘ্রগ। হ্যাঁ বাবা! মার জন্য হরিণ আন্‌বে, আর আমার জন্য বুঝি কিছু আন্‌বে না? (অভিমানে) মা ছেলে মানুষ কি না—আর আমি বড় হয়েছি।

মুঞ্জরা। না বাবা, রাগ করিস্‌নে তোমার জন্যও আন্‌বে।

অগ্নিবর্ণ। তোমার জন্য কি আন্‌বো বাবা, বল ত?

শীঘ্রগ। আন্‌বে ত বাবা?

অগ্নিবর্ণ। কেন আন্‌বো না, বাবা?

শীঘ্রগ। আচ্ছা, তা' হ'লে আমার জন্য একটা হরিণের বাচ্ছা আন্‌বে। দুটোই একখানে রেখে পুষবো।

অগ্নিবর্ণ। আচ্ছা বাবা, তোমার জন্যও একটা আন্‌বে। এখন যাও বাবা, তোমার মায়ের সঙ্গে অন্তঃপুরে যাও।

মুঞ্জরা। তুমি কি একাই যাবে?

অগ্নিবর্ণ। না, সরলও সঙ্গে যাবে।

মুঞ্জরা। এস বাবা, এখন আমরা যাই।

(শীঘ্রগকে লইয়া প্রস্থান।)

অগ্নিবর্ণ। প্রাণাধিক ভালোবাসে মুঞ্জরা আমায়।

আমিও হৃদয় মাঝে,

আঁকিয়াছি মনোরমা প্রতিমা তাহার।

তার হৃদি সনে,

হৃদি মোর এক সুরে বাঁধা।

হাসিলে মুঞ্জরা—

হাস্যময়ী হেরি বিশ্বভূমি,

কাঁদে যবে—

সব যেন বিষাদে মলিন।

থাক্—

অবসর নাহি আজ

অত কথা ভাবিবার মোর,

শিকার সন্ধান তরে

অবিলম্বে যাব আমি গভীর কাননে।

প্রতীক্ষায় আছি সরলের—

কিন্তু কই,

এখন ত এলো না সে পূর্ব কথা মত?

(সরলের প্রবেশ)

সরল। মহারাজা ! বহুক্ষণে আসিয়াছি আমি—

শুনিলাম—

রাণী সনে রাজা,

বিলম্ব হইল তাই ক্ষমা দোষ মোর।

অগ্নিবর্ণ। সরল! তোমার পিতা মন্ত্রী মহাশয়কে আমি পিতৃব্য-জ্ঞানেই সম্মান করি। অতএব তুমি আমার প্রতি 'মাহারাজা' প্রভৃতি সম্ভ্রমসূচক শব্দ প্রয়োগ না ক'রে পূর্বের মতন আমাকে 'দাদা' বলেই ডেকো ভাই। হ্যাঁ তারপর সব ঠিক করেছ ত?

সরল। হ্যাঁ দাদা সব ঠিক হয়েছে।

অগ্নিবর্ণ। সঙ্গে আর কাকে নিয়েছ?

সরল। আপনার কথা মত ভোজন সিং আর শোভন সিংকেই নেওয়া হয়েছে।

অগ্নিবর্ণ। আচ্ছা বেশ। তবে চল, আর বিলম্বের প্রয়োজন কি? বেলা ক্রমে বে'ড়ে উঠেছে।

সরল। হ্যাঁ, চলুন।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত।)

ঐক্যতান বাদন।

ক্রমশঃ।

সৎসর্গ।

(গল্প)।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩)

১০ই মাঘ বুধবার সরস্বতী পুজোপলক্ষে নবগ্রামে মহাধূম পড়িয়া গেল। স্কুলের ছাত্রমহলে বিদ্যাদাত্রী বাগ্‌দেবী বীণাপাণির প্রতি ভক্তির উদ্বেল উচ্ছ্বাস উত্থিত হইল। ছাত্রগণ তাহাদের হৃদয়ারাধ্যা দেবীর চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি প্রদান মানসে, বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হইল। উক্ত স্থানে তাহারা প্রতি বৎসর স্থানীয় লোকদিগের নিকট হইতে চাঁদা তুলিয়া সমারোহের সহিত সরস্বতী দেবীর অর্চনা, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ ও দরিদ্র ভোজনাদি সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিত। বিদ্যাধর বাবুর বাড়ীতেও পূজায় খুব ধূমধাম হইত। তিনি তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়া নির্বাহের জন্য সকাল বেলা গদাধরকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। কিন্তু গদার আর আজ অবসর ছিল না। গ্রামের চার পাঁচ বাড়ী হইতে তাহার ডাক পড়িয়াছিল বিশেষতঃ তাহার সহচর স্কুলের বালকেরা, অদ্য রাত্রি শেষে, তাহার আলয়ে উপস্থিত হইয়া, তাহার সঙ্গে উদ্যান পুষ্পসকল বা পুষ্পোদ্যান লুণ্ঠন করিতে চলিল। গদাধর এ সব বিষয়ে পালের গোদা। তাহার উদ্যোগেই সকলের উদ্যোগ, তাহার সাহসেই সকলের সাহস। গদাধর পুষ্প সংগ্রহের পর গৃহসজ্জা, তোরণ নির্মাণ ও পূজার অন্যান্য কাজকর্ম সম্পন্ন করিল এবং অবশিষ্ট কার্যের ভার সঙ্গীদিগের উপর সমর্পণ করিয়া বিদ্যাধর বাবুর অনুরোধ রক্ষার জন্য তাঁহার বাটীতে গমন করিল।

বিদ্যাধর বাবু তাহাকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন। বিনয় আজ গদাধরের দিকে প্রসন্ন নয়নে চাহিয়া বলিল "কিহে গদা দাদা, আজ যে এত বেলায় এসেছ?"

গদা—আগে আমাদের স্কুলের কাজ না করে কি অন্য কোথাও যাবার যো আছে?

বিনয়—হ্যাঁ, তুমি ভাই বড় কাজী লোক। তোমার সঙ্গে তুলনা কার? এস, দাদা, আজ আমাকে কাগজের ফুল কাটা শিখাবে কি? এই দেখ নানাবর্ণের কাগজ এনেছি।

গদা—আচ্ছা, নিয়ে এস। আমি তোমাকে অবশ্যই ফুল কাটা শিখাব। তারপর সেই ফুলের মালা দিয়ে গেট সাজাব। দেখ্‌বে আমি নানাবর্ণের প্রজাপতি, পাখী, নৌকা, জাহাজ ও আরো২ অনেক জিনিস ঐ কাগজ দিয়ে গড়ে উঠাব।

বিনয় কাগজ আনিয়া দিল। গদাধর তাহার কাছে বসিয়া নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর কাগজের কৃত্রিম ফুল কাটিয়া তাহাকে বিস্মিত করিল। বিনয়ের তখন গদাধরের ন্যায় ফুল কাটিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু অভ্যাস না থাকাতে সে তাহাতে সমর্থ হইল না দেখিয়া, গদাধর হাসিয়া বলিল "তুই বিভূতির সঙ্গে সঙ্গে থেকে একবারে book worm হয়ে গিয়েছিস। এ বইয়ের বিদ্যা নয়—এতে বাহিরের বুদ্ধি চাই।"

বিনয় নম্রভাবে বলিল, "আচ্ছা ভাই, তুমি আমাকে শিখাও না কেন? গদাধর তখন বিনয়ের হাত ধরিয়া তাহাকে ফুল কাটা শিক্ষা দিতে লাগিল । বিনয়ও সংকেত বুঝিয়া নিজেও কতকগুলি ফুল কাটিল। যদিও তাহা গদাধরের ফুলের ন্যায় তত ভালো হইল না, তথাপি সে বিনয়কে উৎসাহিত করি করিয়া বলিল, "আচ্ছা মন্দ হয় নাই, শিখ ক্রমেই হাত আস্‌বে"।

গদাধর আরো অনেক প্রকার কাগজের জিনিস গড়িয়া বিনয়কে দেখাইল। সে তাহাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বার সজ্জিত করিল, গৃহপ্রাঙ্গণ নানাবিধ লতাপাতা ও ফুল দ্বারা শোভিত করিল এবং প্রতিমার অঙ্গাভরণ যথাস্থানে বিন্যস্ত করিল। বিনয় আজ গদাধরের ব্যবহারে বড় খুশি হইল। বিনয়ের পিতা বিদ্যাধর বাবুও পুত্রকে গদাধরের সঙ্গে বাড়ী ঘর সজ্জিত করিতে দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন।

পূজা শেষে বিনয় গদাধরকে বলিল, "গদা দাদা তোমার সরস্বতী পূজায় যে পরিমাণ উৎসাহ, দেবীর কিন্তু সে পরিমাণ কৃপা তোমার উপর নাই। তুমি কেবল দেবীর বাহিরের সাজ সজ্জায় মন না দিয়ে তাঁহার সেবায় প্রাণপণে লেগে পড় দেখি"।

গদাধর প্রত্যুত্তরে বলিলে "আরে আমি মন দিলে কি তোরা আমার সঙ্গে পারিস্, আর বিভূতি কি আমার সঙ্গে পারতো? দেখ্‌লিত আমি যে সব কাজ কর্‌লেম—এতে বিভূতি কি আমার সঙ্গে আটিয়া উঠ্‌তে পারে?"

বিনয়—আচ্ছা ভাই, তুমি একটু লিখা-পড়ায় মন দেও না দেখি, তাহলে তুমি বোধ হয় সকলকে book down কর্‌তে পার।

গদা— আমি অত book worm হতে চাই না। যারা পোকার মত কেবল দিন রাত বসে বসে পুথি খুঁটে তাদের দ্বারা সংসারে কোন কাজ হয়? তুমি আমার সঙ্গে কিছুদিন ঘুর্‌লে ফির্‌লে বুঝতে পারতিস্ পড়ার চেয়ে কাজকর্মে কেমন বুদ্ধি খেলে, কেমন মাথা বাড়ে।

বিনয় বলিল "আমি দু'দিকেই মন রাখব। গদাধর অতঃপর বিনয়ের নিকট বিদায় লইল। তাহার মনে মনে ইচ্ছা রহিল সে কিরূপে বিনয়কে বশ করিবে, আর বিনয়েরও ইচ্ছা যাহাতে গদাধর পড়াশুনায় মন দিয়া একটু ভালো হয়"।

(৪)

এখন বিনয় ও গদাধর উভয়ের মধ্যে কাহার জয়লাভ হয়, কে কাহাকে টানিয়া আপনার বশে আনিতে পারে, তাহাই আমাদের আলোচ্য। কিন্তু প্রায়শঃই দেখা যায় ভালকে মন্দ করা যত সহজ; মন্দকে ভাল করা তত সহজ নয়; বরং মন্দকে ভাল করিতে গিয়ে, অনেক অজ্ঞাতসারে মন্দ পথেরই পথিক হইয়া দাঁড়ায়। বিনয় গদাধরকে ভাল করিতে গিয়ে, তাহার অদৃষ্টেও এই দুর্দশা ঘটিল। গদার সঙ্গে মিশিতে গিয়া সে মানব মনের স্বাভাবিকী নিম্নাভিমুখিনী গতি রোধ করিতে পারিল না বরং তাহাতে আরো ভাসিয়া চলিল। গদা দিন কয়েকের মধ্যেই তাহাকে কাগজের ফুল কাটা, নৌকা গড়া, ঘুরি তৈয়ার করা প্রভৃতি কার্য উত্তমরূপে শিক্ষা দিল। বিনয় এই সব কার্যে গদাধরকে গুরুস্থানীয় মনে করিয়া তাহার সহিত বন্ধুভাবে মিশিল। ঘুরি প্রস্তুত ও ঘুরি উড়ান কার্যে গদাধর বাস্তবিকই সিদ্ধহস্ত ছিল। বিনয়ও এখন গদাধরের সঙ্গে ঘুরি লইয়া মাঠে মাঠে ঘুরিতে লাগিল। স্কুলের পর অপরাহ্ণেই ঘুরি উড়ানের প্রশস্ত সময়। গদাধর সেই সময় বিনয়কে লইয়া খোলা মাঠে ঘুরি হস্তে

উপস্থিত হইত। ঘুরি যখন বিহঙ্গমগতিকে তুচ্ছ করিয়া অপরাহ্ণের রক্তিম-সুদূর আকাশে প্রান্তে ক্রমশ সূক্ষ্মায়তন লাভ করিয়া উড্ডয়ন করিতে থাকিত, তখন বিনয় উল্লাসে চিৎকার করিয়া বলিত, "দেখ দাদা, দেখ, আমাদের ঘুরি যে স্বর্গ ধর্ ধর্ কর্ ছে।"

গদাধর বড়াই করিয়া বলিত, "আরে ভাবছিস কি বিনয়, আমি ওকে দিয়ে চাঁদ ধরাব তবে ছাড়বো"। বাস্তবিক চন্দ্র না উঠা পর্যন্ত তাহারা উভয়েই সেই মাঠে ঘুরি খেলার মত্ত থাকিত। তার পর খেলার নেশা এমন যে, বিনয় স্কুলের পর বাড়ি গিয়ে, পুথি রাখার সময়ও পাইত না। সে স্কুল ছুটি হওয়া মাত্রই গদাধরে সঙ্গে ঘুরি খেলিতে রওনা হইত। এই ঘুরি খেলাতে গদাধরের সঙ্গে বিনয়ের এমনি ভাব হইয়া উঠিল যে, বিনয় আর গদাধরকে "গদা" বলিয়া ডাকিত না। সে তাহার ডাক নাম "গদা" এখন "দাদাতে" পরিবর্তিত করিল। দাদা ভাই এখন এককালে হরিহরাত্মা। গদাধর সুযোগ বুঝিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত তাসের খেলা দেখাইয়া বিনয়কে বিস্মিত করিতে লাগিল। বিনয় কিছুদিন যাইতে না যাইতেই তাস, পাশা দাবা প্রভৃতি হরেক রকমের খেলায় প্রাজ্ঞ হইয়া উঠিল। সে ঘুরি খেলার রোক্ ছাড়িয়া তাহার গদা দাদার সঙ্গে তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় মাতিয়া উঠিল। লেখাপড়ার প্রতি তাহার ক্রমশঃ অবহেলা জন্মিতে লাগিল। শেষে অবহেলা বিরক্তিতে পরিণত হইল এবং দিনান্তেও একবার পুস্তক স্পর্শ করিতে তাহার প্রবৃত্তি হইত না।

এমনকি স্কুলে না গিয়ে অনেক দিন বিরলে গৃহকোণে সে গদা দাদার সঙ্গে তাস পাশা খেলায় ব্যস্ত থাকিত ও সিগারেটের ধূমে গৃহ অন্ধকার করিয়া তুলিত।

বিনয়ের পিতা পুত্রের এই নবশিক্ষাপ্রণালীর কোনরূপ তত্ত্ব রাখিতেন না। তিনি মাঝে ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "বিনয় স্কুলে গিয়েছে?" তারা 'হ্যাঁ' কি 'না' যাহা উত্তর করিত, তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিতেন, কারণ সে প্রশ্নের উত্তরের প্রতীক্ষা করাও তাঁহার স্বভাবের রীতিবিরুদ্ধ ছিল। এইরূপ অভিভাবকের তাচ্ছিল্যে ও অসৎসঙ্গের দোষে, হায়, বলিতে দুঃখ হয়, বিনয়ের বালারুণরাগদীপ্ত নবোদ্ভিন্ন রাজত্ব কুসুমিত জীবন অচিরেই কীটের আবাসক্ষেত্র হইয়া উঠিল।

দু'টি ধারা!

ভাবি এ জীবন, "অসার স্বপন,"

তাই--বিশ্বে প্রজাপতি ;--

হইয়ে উদাসী, চির পরবাসী,

যথা ইচ্ছা করে গতি।

কিন্তু মধুকর, জেনে দৃঢ়তর,—

"জীবন কর্তব্যময়"।

তাই মনোসুখে, বাঁধি মধূচাকে-

নিত্য করিছে সঞ্চয়।

শ্রীঅমৃতলাল রায়।

শ্রীবৎস-চিন্তা।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শনি যেন রাজার কাতরাহ্বান শ্রবণ করিয়া অতি তাড়াতাড়ি নৌকাখানি কূলাভিমুখে আনিতে লাগিলেন। নিদাঘপীড়িত শুষ্ক মরুভূমিতে যেন গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত

হইল। ভূপতি শনিকে যেন সমব্যথার ব্যথী পাইয়া তাহাঁদের দুর্দশার কারণ তাহার নিকট সবিশেষ ব্যক্ত করিলেন। ছদ্দবেশী শনি নৃপতির এতাদৃশ্য সকরুণ প্রার্থনা শ্রবণে বাহ্যিক কষ্ট সহানুভূতি দেখাইয়া এবং অন্তরে ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "হে মহারাজ! দেখুন আমার তরী অর্ধভগ্ন প্রায়; তিনজনের অতিরিক্ত ভারবহনে অসমর্থ। অতএব আপনারা যদি আমার কথানুযায়ী পার হইতে পারেন তবে আমি পার করিতে পারি, হয়, আপনি আপনার পত্নীসহ প্রথমে পার হউন, না হয়, এই যেন আপনার পুঁটলিটি দেখিতেছি, এইটিই আগে রাখিয়া আসুন"। শনির একান্ত অভিপ্রায় ছিল যে, তাহাঁদের যে অর্থ আছে তাহা যে কোন প্রকারে হউক অপহরণ করিয়া তাহাঁদিগকে আরও অধিকতর কষ্ট ভোগ করান। শ্রীবৎসরাজ চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, প্রথমে যদি চিন্তারে পাঠাইয়া দিয়া এই ধনের আশায় থাকি, তবে আমি যেরূপ দুর্দশায় পতিত হইয়াছি, তাহাতে চিন্তাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা দুরাশা মাত্র, অন্যথা চিন্তাকে একাকী রাখিয়া যাওয়াও অনুচিত। অতএব আমাদের যে কাঁথাখানি আছে, তাহাই প্রথমে পার করা যাক। এই ভাবিয়া উভয়ে কন্থাবেষ্টিত রত্নরাজি নৌকায় তুলিয়া দিলেন। সফলকাম সূর্যাপুত্র নৌকা বাহিয়া যেই নদির মধ্যভাগে আসিলেন, অমনি শনিসৃষ্ট মায়ানদী বালুকারাশিতে পরিণত হইল। অসহায়ের সহায় যা ছিল, সব গেল। এখন কেবল রাজা ও রাণী। তাঁহারা শনির চাতুরী বুঝিতে পারিয়া দুঃখিত অন্তঃকরণে সে স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ক্ষণকাল পরে চিত্রধ্বজ নামক বনে প্রবেশ করিলেন। এমন সময় সূর্য্যদেব তাঁহার সমুজ্জল কিরণমালা বিস্তার করিয়া উদয়গিরির শিখরদেশে আরোহণ করিলেন। ঘোর তমসাচ্ছন্ন জগৎ সূর্য্যকিরণে আলোকিত হওয়ায় যাবতীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রফুল্ল ও সমুজ্জল বোধ হইল। বিহঙ্গমকুলের সুমধুর কুজনে বনস্থলী মুখরিত হইল। নবোদিত সূর্য্যের কিরণমালা বৃক্ষশ্রেণীর শ্যামল পত্ররাজি ভেদ করিয়া বনভূমি আলোকিত করিল। সবই আনন্দময়। প্রকৃতি-দেবী যেন সূর্য্যদেবের আগমনে দন্ত বিকাশ পূর্ব্বক হাস্য করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির এই সুবিনল সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবে কে? দুর্দশা-পীড়িত অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি? তার আবার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে কি অধিকার? তাহার হৃদয়পটে যে দুঃখ চিন্তার জলন্ত প্রতিমূর্তি সকল সময়ের জন্য সমুজ্জনভাবে অঙ্কিত। সেই প্রতিমূর্ত্তিই তাহার আরাধনার একমাত্র বস্তু। তাহার কাছে বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অতীব নগণ্য। তাই দুর্দশাগ্রস্ত ও ক্ষুধাপীড়িত শ্রীবৎস এই রমণীয় প্রাকৃতিক

সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য গ্রহণে অসমর্থ হইলেন। তাঁহারা এই চিত্রধ্বজ বনে ফলমূলাদি ভক্ষণ ও কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আবার অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

তাঁহারা এইভাবে অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ ও অরণ্যজ ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীবৎস অরণ্য মধ্যে কতকগুলি মৎস্যজীবিকে দেখিতে পাইলেন। ফলমূলাহারী প্রাগ্‌দেশাধিপতি মৎস্য ভক্ষণে ইচ্ছুক হইয়া তাহাদের কাছে একটি মৎস্য চাহিলেন। কিন্তু ভাগ্যদেবী তাঁহার প্রতি এত বিমুখা হইয়াছিলেন যে, এমন কি, ধীবরেরাও তাঁহার ভোজনের নিমিত্ত একটি মৎস্য দিতে পারিল না। তার পর তিনি স্বীয় অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া তাল বেতালকে স্মরণ করিলেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে, তিনি স্বীয় প্রভাবে শিবদূত তাল বেতালকে বশীভূত করিয়াছিলেন। তিনি তাল বেতালকে স্বরণ করিয়া জালজীবিদিগকে পুনরায় জাল ফেলিতে আদেশ করিলেন। ধীবরেরা তাঁহার আদেশানুয়ায়ী পুনরায় জাল ফেলিল, এইবার অসংখ্য মৎস্য জালবদ্ধ হইল। তাহাদের আনন্দ আর দেখে কে? তাহারা মৎস্যপূর্ণ জালখানি সানন্দে তীরভূমিতে উত্তোলন করিয়া আশাতীত পরিমাণ মৎস্য প্রাপ্তির দরুণ তাঁহাকে মহাপুরুষ জ্ঞানে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। তারপর তাঁহার আহারের নিমিত্ত একটি শকুল মৎস্য প্রদান করিয়া প্রস্থান করিল। শ্রীবৎসরাজ মৎস্য পাইয়া সানন্দে চিন্তাদেবীর হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক বলিলেন, "আমাকে এই মৎস্যটি আগুণে পোড়াইয়া দাও, আমি ইহা ভক্ষণ করিব।"

চিন্তাদেবী পতির এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "একদিন যিনি সসাগরা সদ্বীপা ধরিত্রীর একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন, অভ্রভেদী সুরম্য রাজপ্রাসাদ যাঁহার বাসস্থান ছিল, যিনি প্রত্যহ ক্ষীর, ননী, দধি, দুগ্ধ ও ছানা প্রভৃতি সুমিষ্টকর খাদ্য ভক্ষণ করিয়া রসনার তৃপ্তিসাধন করিতেন,—শতব্যঞ্জন না হইলে আহারে যাঁহার তৃপ্তি হইত না,—সকল সময়ের জন্য দাস দাসী যাঁহার সঙ্গের সাথী ছিল; সেই ব্যক্তি অদৃষ্ট দোষে ইন্দ্রত্ব ও সুখ ভোগে জলাঞ্জলি দিয়া আজ সপত্নীক বনবাসী। এক্ষণে শতব্যঞ্জন দূরের কথা শুধু একমুষ্টি চা'লসিদ্ধও ভাগ্যে জুটে না। শেষে উদরপূরণের নিমিত্ত এমন কি, মীনদগ্ধ পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিতে ইচ্ছুক। হায়রে অদৃষ্ট! তুই কি এত নিষ্ঠুর যে, একজন ইন্দ্রতুল্য ব্যক্তির প্রতিও অনুকম্প। প্রদর্শনে বিমুখ! তোর কুদৃষ্টিতে পড়িয়া তাঁকে আজ

মীনদগ্ধ পর্য্যন্ত খাইতে হয়! তোকে শত ধিক্! জগতে তোর মত নিষ্ঠুর আর দ্বিতীয় নাই! তুই যার প্রতি বিমুখ হ'স তাকে সর্ব্বস্বান্ত না ক'রে ছাড়িস্ না।"

তারপর চিন্তাদেবী প্রত্যাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া পোড়া মৎস্য সরোবরের জলে ধুইতে গেলেন, সত্যই, অদৃষ্ট যখন বিমুখ হয়, তখন হস্তস্থিত গ্রাসের আশাও কোন সময়ের জন্য পরিত্যাগ করিতে হয়। দুরদৃষ্ট শ্রীবৎসেরও ভাগ্যে তাহাই ঘটিল। তাঁহার পত্নী মৎস্যটি ধুইবার জন্য যেই জলে রাখিলেন, অমনি পোড়া মৎস্য শনির কোপ দৃষ্টিতে পুনর্জীবন লাভ করিয়া পলায়ন করিল। তখন চিন্তাদেবী এই অপূর্ব্ব ঘটনা পতির নিকট দুঃখিতভাবে জ্ঞাপন করিলে, তিনি ইহা শনির চাতুরী জানিতে পারিয়া স্বীয় পত্নীকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

কিছু দিবস অতীত হইলে পর অরণ্য মধ্যে ফলমূলাদির অভাব এবং খাদ্যপযুক্ত কোনো বস্তু সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় তাঁহারা বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া মানবের আবাস স্থলে আসিতে বাধ্য হইলেন। শ্রীবৎস চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা যদি উচ্চকূলসম্ভূত মানব সমাজে আশ্রয় গ্রহণ করিতে যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের যেরূপ দূরবস্থা তাহাতে যে তাঁহারা: সম্মান ও আশ্রয় লাভ করিবেন, সে আশা দুরাশ মাত্র। অতএব তিনি সপত্নীক নগরবাসী কতিপয় কাঠুরিয়ার আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। কাঠুরিয়াগণ দীনবেশী শ্রীবৎসরাজের অনুপম্ রূপলাবণ্য, ভাষার লালিত্য ও হৃদয়ের কমণীয়তা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী সন্দর্শনে তাঁহাকে ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ জ্ঞানে সাগ্রহে আশ্রয় প্রদান করিল। তিনি সপত্নীক কাঠুরিয়া আলয়ে অবস্থান পূর্ব্বক তাহাদের সঙ্গে অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহে নিযুক্ত হইলেন এবং সংগৃহীত কাষ্ঠ বাজারে বিক্রয় করিয়া যে অর্থ পাইতেন তদ্বারা ভরণপোষণ চালাইতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে তাঁহাকে দূরবস্থার আর একটি ফলভোগ করিতে হইল। একদিন এক সদাগর তাঁহার পণ্যদ্রব্যপূর্ণ বাণিজ্যতরী লইয়া কাঠুরিয়া ভবনের পার্শ্ববর্তী নদী দিয়া বাণিজ্য করিতে যাইতেছিলেন। দৈবের দুর্ঘটনা তাঁহার তরী সেই স্থানে চরভূমিতে আটকাইয়া যায়। তিনি অনেক চেষ্টার পরেও তরীগুলিকে উদ্ধার করিতে না পারিয়া নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এমন সময় সূর্য্যপুত্র শনি দৈবজ্ঞবেশে সেই বণিকের নিকট আসিয়া বলিলেন, "ওহে বণিক! এখানে তোমার তরী কেন আবদ্ধ

হইয়া রহিয়াছে তাহার কারণ আমার কাছে শুন,—তুমি যাত্রা কালে তোমার স্ত্রী অর্জিত নবগ্রহের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছ, তজ্জন্য তুমি এই দুর্দশা ভোগ করিতেছ। যদি উদ্ধার লাভ করিতে চাও, তবে এই যে কাঠুরিয়া ভবন দেখিতেছ, তাহাদের পরিবারের মধ্যে এক সাধ্বী রমণী আছে; একমাত্র সে তোমার তরণী স্পর্শ করিলে বাণিজ্য-তরী উদ্ধার করিতে পারিবে। সদাগর দৈবজ্ঞের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কাঠুরিয়া পরিবারস্থ সকল রমণীকে এমন কি চিন্তাদেবীকে পর্য্যন্ত সে স্থানে ডাকিয়া আনিলেন। কাঠুরিয়া রমণীরা একে একে সকলেই তরী স্পর্শ করিল, কিন্তু তরী আর নড়িল না। অবশেষে চিন্তাদেবী স্পর্শ করিবা মাত্র চলচ্ছক্তিহীন তরণী গতি প্রাপ্ত হইল।

সদাগর দেখিলেন যে, এই নারী সামান্যা নহেন। ইহাকে সঙ্গে লইতে পারিলে আমাকে ভবিষ্যতে আর বিপদগ্রস্ত হইতে হইবে না। এই ভাবিয়া বণিক্ চিন্তাদেবীকে বলপূর্ব্বক নৌকাপরি তুলিয়া লইলেন। এইস্থানে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি একটি নিরপরাধিণী পতিব্রতা সাধ্বী রমণীর সতীত্ব বিনাশে উদ্যত, এমন সময় কেহই কি তাঁহার উদ্ধার সঙ্কল্পে যত্নবান হইল না? তার উত্তরে বলিব,— কে তাঁকে উদ্ধার করিবে? তাঁর প্রাণের দেবতা শ্রীবৎস? তিনিও তখন সে স্থানে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি সে সময় তাঁহার কাঠুরিয়া বন্ধুদের সহিত অরণ্য মধ্যে কাষ্ঠ সংগ্রহে নিযুক্ত। তবে কে, তবে কে দৈবজ্ঞবেশী শনি? তিনিত শ্রীবৎসরাজের বিপক্ষে এবং তিনিই এই পৈশাচিক ব্যাপারের মূলীভূত কারণ। আর ছিল কাঠুরিয়া রমণীগণ। তারা আবার অন্যকে উদ্ধার করিতে যাবে? তাহারা কেবল বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিল আর সহানুভূতির চিহ্ন স্বরূপ দুই একবিন্দু অশ্রু বিসর্জন করিল। এ ছাড়া নারীজাতির কাছে সাহয্যের আশা আর কি থাকিতে পারে? হাঁ তবে স্বীকার করি রাজপুতনার ইতিহাস প্রসিদ্ধ রমণীবৃন্দের ন্যায় দুই একজন থাকিত, তবে এ কথা সম্ভবপর হইত। হায়! এই সময় যদি মহারাজ শ্রীবৎস উপস্থিত থাকিতেন, তবে কি আর এই অমানুষিক ব্যাপার ঘাটতে পারিত। সদাগর চিন্তাকে নৌকোপরি তুলিয়া লইয়া নির্ভীকচিত্তে নৌকা বাহিয়া চলিলেন।

শ্রীবৎসরাজ গৃহে প্রত্যাগমন করিরা দেখিলেন, ঘরে চিন্তা নাই। তিনি ব্যাকুলভাবে প্রতিবাসিনীগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "চিন্তা কোথায়? কিন্তু যখন অবগত হইলেন যে, চিন্তাদেবী জনৈক সদাগরকর্তৃক অপহৃত হইয়াছেন, তিনি সমূলোৎপাটিত কদলী বৃক্ষের ন্যায় ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পত্নীর উদ্দেশে পুনরায় বনবাসী হইলেন। তিনি অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন সাগর তীরস্থিত চিত্তানন্দ নামক বনে সুরভি আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। সুরভি তাঁহার দুর্দশা বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তদীয় আশ্রমে তাঁহাকে আশ্রয় দান করিলেন।

তিনি সুরভি আশ্রমে অবস্থান কালে জীবনোপযোগী অর্থ সংস্থানের নিমিত্ত তাল বেতালকে সহায় করিয়া স্বর্ণপাট প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। কয়েক দিবসের মধ্যেই তিনি বহুসংখ্যক পাট নির্ম্মাণ করিলেন। তারপর চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এইগুলি যদি মানবের আবাসে অথবা কোন নগরে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি অনায়াসে অর্থ লাভের ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু কি প্রকারে লইয়া যাইবেন তাই ভাবিতে লাগিলেন। একদিন দৈবক্রমে তিনি সেই সদাগরকে তরণী বাহিয়া যাইতে দেখিলেন। তিনি সদাগরকে দেখিয়া ডাকিতে লাগিলেন। সদাগর তাঁহার উচ্চাহ্বানে তরণী তীরে আনিলে, পর তিনি তাঁহার আন্তরিক অভিসন্ধি সদাগর সমীপে ব্যক্ত করিলেন। সদাগর 'স্বর্ণ' শব্দ শ্রবণ করিবা মাত্র তাঁহাকে সসম্ভ্রমে নৌকোপরি লইয়া আসিলেন এবং ভৃত্যের দ্বারা স্বর্ণপাটগুলি নৌকায় উঠাইয়া পুনরায় নৌকা বাহিয়া চলিলেন। সে স্থান হইতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলে দুষ্টমতি সদাগর তাঁহার পাপ বাসনা চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত নিরপরাধ শ্রীবৎসের হস্তপদাদি বন্ধন করিয়া অতলসমুদ্র জলে নিক্ষেপ করিলেন। অনন্যোপায় শ্রীবৎস তাল বেতালকে স্মরণ করিয়া সলিলোপরি ভাসিয়া চলিলেন।

(ক্রমশঃ।)

বঞ্চিতা।

(১)

বিভা ও অণুর সখীত্ব আজকের নয়, বছর তিনেক আগে শরতের এক স্বর্ণরঞ্জিত প্রভাতে হঠাৎ সে ভাব গ'ড়ে উঠেছিল আজ যৌবনের উত্থাম ভরা নূতন স্বপন পোড়া চোখেও দু'জনে ঠিক তেমনি আছে।

এ বন্ধুত্বের একটু বিশেষত্ব আছে। বিভা ধনীর কন্যা, কলিকাতার হ্যারিসন রোডের প্রকাণ্ড তেতালা বাড়ীখানায় তাদের বাস। নব্যতন্ত্রের আবহাওয়ায় আধুনিক ফ্যাসানে বাড়ীখানা সজ্জিত। পিতামাতার সাধের মেয়ে, ভাই তিনটির আদরের বোন ও বেথুন কলেজের বিদ্যাবতি ছাত্রী। কিন্তু অণুর জীবনযাত্রা এ সবের বিপরীত ছিল, সে আজন্ম ব্যথার কোলেই বেড়ে উঠেছে! জ্ঞান হবার কত আগেই সে মা হারা সংসারে একটি সৎ ভাই আর বাবাকে অবলম্বন করেই তার সতের বছর কেটে গেল। অণুর বাবা দীনেশ ** আর্থিক উন্নতি কেরাণীগিরিতেই নির্ভর করেছিল। সেই কবে কুড়ি টাকা বেতনে আরম্ভ হয়ে আজ পঁয়ত্রিশ টাকায় দাঁড়িয়েছে। শ্বশুরের যৌতুক পাওয়া ক্ষুদ্র দ্বিতলখানিতে তাদের তিনটি প্রাণ কোন প্রকারে কেটে যাচ্ছে। দীনেশ বাবুর পিতা প্রপিতামহদের ভিটে বোধ হয় কোন সুদূর পল্লীতেই ছিল, অবশ্য আজ আর তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। কলিকাতার এক পল্লীতে ধরাবাঁধা ধর্ম্মের বাইরে থেকে দুঃখ দারিদ্র্যের যাতনা বয়ে দিন এক রকম চলছেই। প্রভাতের সূচনা হ'তেই অণু বাসন মাজা, ঘর পরিষ্কার করা, রান্না করা হ'তে সংসারের প্রত্যেক খুঁটিনাটী কাজ সমাপন ক'রে অবসরমত লেখাপড়ার চর্চ্চা করে। আর যাবতীয় একঘেয়ে কাজের মাঝে মাঝে বিভার সঙ্গটুকুই একটা সুখের পরশ বুলিয়ে অণুকে সজীব রাখে। ভবিষ্যতের কল্পনাকেও সে অতীত এবং বর্তমানের চেয়ে আলাদা ক'রে গড়তে সাহস পায় না। সাধারণ মেয়েদের মত সে ভবিষ্যতের কল্প-কুঞ্জে আশালতার মৌহিণী মায়ার চেনা, নিজের সম্বন্ধে ধারণাও ছিল তার খুব ছোট। সে ভাবতো, নিজস্ব সম্পত্তি যে রূপ গুণ তাতেও গৌরব করবার তাঁর কিছুই নেই, যদিও প্রকৃতপক্ষে কুরূপা নাম পাবার মতন তার চেহারা ছিল না। রং তত ফরসা না হলেও নিবিড় চোখের উজ্জ্বল তারা দুটো আর পাতলা ঠোটের মৃদু হাসিটুকু বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্য নিঙরে যেন তৈরী হয়েছিল; লম্বা ছিপছিপে একহারা চেহারার ওপর ঢেউ ছড়ান ঘন কৃষ্ণ সুদীর্ঘ চুলগুলো বিধাতার অপরূপ সৃষ্টি মনে করিয়ে দেয়। অণু নিজে কিন্তু তার সৌন্দর্য্য অস্বীকার করে। বিভা কোনদিন বিয়ে টিয়ের গল্পে 'সুন্দরী

শোভাময়ীর কত আদর হবে' বল্লেই অণু, রেগে বলে, 'না ভাই আমি এ রকম ঠাট্টা মোটেই সহ্য করতে পারিনে, দেখো, এই রূপ গুণহীন জীবনে আমায় কেউ পুছবেও না আমি সে স্পর্দ্ধাও রাখি না।

দীনেশ বাবুর স্বভাবটাও কিছু অদ্ভূত হয়ে পড়েছিল। বাবার আদর যত্ন কোনদিনই অণুর হৃদয় স্পর্শ করে নাই, দারিদ্র্য নিষ্পেষিত গুরু গম্ভীর মুখ হ'তে দুটো স্নেহের বাণী কি আদর-আব্দারের হাসি অণু শোনে নাই। শুধু আফিসের কাজ ও অমলের পড়াশুনার দৃষ্টি নিয়েই তার দিনের পর দিন চলে যাচ্ছিল। অণু বড় হয়ে অবধি অন্দরের সমস্ত সুশৃঙ্খলার ভার ওর উপরেই অর্পিত হ'য়েছিল। এইখানেই মাঝে মাঝে-পিতাপুত্রীর সম্পর্ক দেখা যেত।

(২)

বিভা, শিক্ষিতা ধনী কন্যাদের বাদ দিয়ে অণুকেই কেন বড় করে দেখলো, কি এমন আকর্ষণে এ ভালবাসা শিথিল হচ্ছে না, অন্য মেয়েরা তার কারণ খুঁজে খুঁজে আজ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বিভা সেবার ফাষ্ট আর্ট ক্লাসে উঠলো, সেইবারেই পূজার সময়ে একদল মেয়ে নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ অণুদের বাড়ী এসে প'ড়েছিল।

শীর্ণকায়া মলিনমাথা লম্বা মেয়েটাকে দেখেই বিভার কেমন বিস্ময় জেগে উঠলো। স্কুল কলেজেও পড়েনা, বিয়েও হয়নি, মেয়েটা তাদের বাড়ীর এত কাছে থেকেও পথে ঘাটে কোথাও চোখে পড়েনা, উচ্ছ্বাস-চাঞ্চল্য-বর্জিত অকাল-গাম্ভীর্য্যে লুকান অণুকে সেই দিনে বিভার মনে টেনে নিলে। আর সেই দিন থেকেই প্রত্যহ দু-একবার এসে এসে অণুর সঙ্গীহীন প্রাণে বন্ধুত্বের একটি উজ্জ্বল রেখা এঁকে দিলে। বিভার অন্য শিক্ষিতা সখীরা এমন অদ্ভুত মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্বে ডুবে থাকতে দেখে বিস্মিত হয়ে পড়লো।

অণু ও প্রথমটি এই রূপবতী, শিক্ষিতা ধনী কন্যার সাহচর্য্যে কুণ্ঠিতা হয়েই থাকতো। কিন্তু বিভার উৎপীড়নে সেটা স্থায়ী হতে পারে নাই। বিভা এবার আই, এ পাশ ক'রে বি. এ. পড়বার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তার আননখানি সদাই হাসিভরা ছোটাছোটি লুটালুটিতে এখনও সে বালিকাকে হার মানিয়ে দেয়। হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল গৌর দেহখানা গঠনের সৌন্দর্য্যে সজ্জার গৌরবে সর্বদাই উদ্ভাসিত এবং আলোকিত তদুপরি কালের হাওয়ার যে বিচিত্র মাধুর্য্যখানি বিভার সর্ব্বদেহে লেপিয়া দিতেছিল

সেই নবযৌবনের গোলাপী, আভা তার, দেহে ও মনে রাঙা ছোপ ফেলিয়াছিল। বিভার বন্ধুও ছিল যথেষ্ট, কিন্তু অণুর মত কাউকে মনের দুয়ার খুলে সমস্ত উচ্ছ্বাস কল্পনা জানায় নি। অণুও একমাত্র বিভার কাছেই মনের পর্দাখানা একটু তুলেছিল। বিভা অন্তরে অন্তরে অণুর জন্য খুব ব্যথা অনুভব করতো। সংসারের অনেকখানি বঞ্চিত এই বৈচিত্রহীন আড়ম্বরশূন্য জীবটির পানে চেয়ে বিভার বুকে গভীর বেদনা জেগে উঠতো। অণু কুণ্ঠিতা হবার ভয়ে কোন কিছু উপহার দেবারও বাসনা থামিয়ে রাখতো, শুধু মাঝে মাঝে বইএর এক একটি বোঝা অণুর কোলে ফেলে দিত। অণু আপত্তি তুললে অমনি বিভা তার গলা জড়িয়ে বলতো, 'এই বুঝি তোমার ভালবাসা, তুচ্ছ দু'খানা বই আনার চিহ্ন বলেও নেবে না? তবে থাক্।' অগত্যা অণুর আপত্তি টিকতে পারত না। আর পুস্তকের ওপর অনুরাগ থাকায় যত্ন ক'রে তার সদ্ব্যবহার করতো। বিভা এক একদিন ওর দাদার কাছে বলতো, 'দাদা অণু একদিন বলেছিল যদি তোমাদের মতন পড়াশুনায় দিনগুলো কাটাতে পারতুম তবে কোন দুঃখই আমায় বিচলিত করতে পারত না। দাদা এই কথা টুকুতেই কেমন দুঃখ লাগে আহা বেচারীর কি অদৃষ্ট! দেখনা সংসারে কেউ একটু আদর যত্ন করবে তাও না। সত্যি সংসারে মা না থাকূলে দেখছি বাবাও পর হয়ে যায়। ওর ভাই বিমলও ঠিক বাবার স্বভাব পেয়েছে। একটি মাত্র দিদি; তার সঙ্গে যেন কোন সম্বন্ধই নাই, এমনি ওর ভাব।

বিভা অণুর নিষ্পন্দ মনের কাছে আর একটি দিক উন্মোচন করে দেখাত,—একটি শান্তিময় সংসারের উজ্জ্বল ঝক্‌ঝকে চিত্র রংচঙে ভাবে তুলে ধরতো। ওর কোন বন্ধু ভালবাসার পবিত্র হিল্লোলে গা ভাসিয়ে এমন কি সুখের সংসার পেতেছে এমনি এমনি অনেক প্রণয় রাজ্যের ফুটন্ত জোৎস্না অণুর চোখের ওপর মেলে ধরত। অণু একটু মৃদু হেসে বলতো হ্যাঁ ভাই তোমার একটা হোক্, তুমি সেই জ্যোতির্ম্ময় রাজ্যে সুখের উৎসে ভেসে যাও আমিও তাই দেখে— সুখী হই।' তখন বিভা বল্‌তো, আগে বি. এ. টি পাশ করে নি তারপর। এখন ওসব ফাঁদে পড়লে লেখাপড়া কিছু হবে না ভাই অণু।' বলেই খিল্ খিল্ ক'রে হেসে উঠতো।

ক্রমশঃ

শ্রীমতি তরুবালা দেবী।

নারীর রূপ।

নারীর রূপের রহস্যের কথা কেমন করিয়া বলিব? সে রূপ কি? কি সূক্ষ্ম! কি মধুর! নারীর রূপের আকর্ষণ ! বিশ্বের প্রথম প্রভাতে নারী কেমন করিয়া নরকে আকর্ষণ করিল? প্রতি অঙ্গে রূপের কি মোহিনী সম্ভার গোপন রাখিয়া নরকে সারাজীবন সে রূপ খুঁজিতে নিয়োজিত করিল। কৈ নর তো সে রূপের অন্ত পাইল না। নারীকে রূপের ভাণ্ডার কে দিল, কে শিখাইল সে রূপ লুকাইবার কৌশল? কেন নর নারীর রূপে পাগল হইল? রূপ ও রূপের কাঙ্গালে বিশ্ব ভরিয়া গিয়াছে। ঘরে ঘরে রূপের কাঙ্গাল রূপের রাণীকে বলিতেছে "ওগো রূপ দাও চাই শুধু রূপ, যে সৌন্দর্য অফুরন্ত, নিয়ত প্রাণ মনকে তৃপ্ত করে, সংসারের সকল জ্বালা ভুলাইয়া দেয় সেই রূপ চাই, সে রূপের বিনিময়ে সব দিব।" ধন-মান-প্রাণ সব দিব শুধু রূপ দিয়েম রূপের আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তি কর। রূপের পিপাসা মিটাইয়া শান্তি দাও। কিন্তু কৈ রূপের পিপাসা তো মিটে না। রূপের জন্য পাগল নর আজ বলপূর্বক নারীর রূপের ভাণ্ডার লুটিয়ে নিতে উদ্যত কিন্তু আশা মিটে কই? এ যে অমৃতের কাঁচা ভাণ্ড, জোর করিয়া নিতে গেলে মিটে না, সব আশা নষ্ট হয়, রূপের ভাণ্ড নষ্ট হইয়া যায়, নারীকে পথের কাঙ্গাল করা হয়। কোমল উদ্যানলতাকে মরুভূমিতে নিক্ষেপ করিলে তার কি রূপ থাকে?

নারীর রূপের ভাণ্ডার লুটিয়া লইয়া সুখী হইতে পারিবে না, নর দয়া মায়া স্নেহ-মমতা, ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিলে, তোমার নরের ধর্ম বিসর্জন দিলে, অনন্ত নরভোগ ছাড়া আর কিছুই লাভ নাই। কিন্তু যাক্, নারীর রূপ কোথায় লুকান থাকে আজ তাই দেখি। আজ বিশ্বের নারীর অঞ্চলে, বসনে, নয়নে, প্রতি অঙ্গে, অন্তরে বাহিরে নারীর রূপের সন্ধান লইব। আজ নিত্যশুদ্ধ আত্মারূপে অনন্তের সহিত মিশিয়া অনন্ত রূপের সন্ধানে প্রত্যেক রূপের ভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। তোমরা কি বলিবে নারী তোমাদের রূপের ভাণ্ডারের সন্ধান? বুঝাইতে পারিবে কি রূপের দস্যুরে, যে এ অদ্ভূত ভাণ্ডার লুট করিলে বিধাতার দণ্ড নরক, নিন্দা, গ্লানি, কারাক্লেশ ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু কস্তুরী মৃগসম আপনার গন্ধে আপনি পাগল মত, রূপের রাণী তোমরা রূপ রাজ্যের খবর কি জানিবে। জানতে না পেরেই তো কেহ বাজারে রূপের পসরা খুলিয়া বসিয়াছ। কিন্তু দোকান খুলিতে না খুলিতে সে

রূপ তোমার কোথায় মিশিয়া গেল? শৃগাল, কুকুর ব্যতীত কে তাকায় তোমার রূপের পানে? পিশাচেরা তোমার রক্ত মাংস লইয়া কাড়াকাড়ি করে, কোথায় তোমার সুখ শান্তি ? কে চায় তোমার রূপ ?

শুধু রূপের উপাসক জানে কোনরূপে প্রতি সঙ্গে সুধা ক্ষরে তব। অতি কুরূপা নারীরও অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মনোহর সন্নিবেশ ও গতির ললিত ভঙ্গী নরকে মোহিত করে। ওস্তাদের হাতে তাল লয় বাঁধা বীণা যন্ত্রটার ন্যায় এইযে ভগবানের হাতে সৌন্দর্য সৃষ্ট। ধীরে ধীরে জগতের সুখ না কুড়ায়ে ফুলটা যেমন দেবতার সেবার উদ্দেশ্যে ফুটিয়া উঠে, এ সৌন্দর্যও সেই আভাস দেয়। ইহাকে জড়ের সৌন্দর্য না আত্মার সৌন্দর্যের অভাব বলিব? সুন্দর আত্মাটা মনোহর সঙ্গীতের মত, ফুলের সুষমার মত আপন মনে আপনার ভাবে জড়ের আশ্রয়ে ফুটিয়া উঠিল ইহা তো অতিরঞ্জিত কথা নয়। ভ্রান্ত বিপদগামী আত্মার পক্ষে ইহা ছলনার আবরণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা হইলেও জড়ের আত্মার বিকাশ এ কথা ভিত্তিহীন নয়। চোর হও, সাধু হও তোমার স্বরূপ তোমার মুখে ফুটয়া উঠিবেই। তাই মনে হয় কত সুদীর্ঘ কঠোর তপস্যায় নারী রূপের রাণী হয়। রূপের ধ্যানে নারীর রূপ ফুটিয়া উঠে, পূজার ফুলটার মত আপন সুষমায় নারী আপনি বিকশিত হইয়া উঠে। পুষ্পদলের মত প্রতি অঙ্গ-কোমলতাও মাধুর্যে মণ্ডিত হয়, বচনে বীণার ঝঙ্কার বাজিয়া উঠে।

ওস্তাদ উপাসক যেমন দেবতার পায়ে পূজার উপহার রাখিরা সুমধুর গীতবাদ্যে দেবতার উপাসনা করে, মনে হয় এ যেন সেই উপাসনার আয়োজন। কিন্তু তথাপি ইহাকে বাহিরের রূপ বলা যায়। প্রথম মিলনেই এইরূপ প্রধান সহায় হয়। এই মায়ালাবণ্য প্রথমে নরকে আকর্ষণ করে ও প্রথম মিলনকে মদিরতায় পূর্ণ করে। বাসনাবিকাশিনী, আকর্ষণকারিণী ও অনুরাগবর্দ্ধিনী এই সৌন্দর্যেরও আবশ্যকতা আছে কারণ—

"আপনার পরিচয় দেওয়া বহু ধৈর্যে
বহুদিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ,
জন্মজন্মান্তরের ব্রত।"

কিন্তু প্রথম নিলনের পরে—

"স চিরদুর্লভ মিলনের সুখস্মৃতি—
সঙ্গে ক'রে ঝ'রে পড়ে যাবে অতিস্ফুট—

পুষ্পদলসম এ মায়া লাবণ্য”

রূপের সাধক তারপর তার সে রূপে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না। কারণ এ যে কেবল মরীচিকা ভ্রান্তি মাত্র দু’দিনেই শেষ হইয়া যাইবে। তখন তাহাকে কোন রূপে ভুলাইয়া রাখিবে? সে রূপের সন্ধান যদি না জান নারী তাহা হইলে তোমাকে রূপের রাণী কেমন করিয়া বলিব? এ সৌন্দর্য অন্তরের সৌন্দর্য। ধীরে ধীরে অন্তরের সৌন্দর্য হৃদয়কে মুগ্ধ করে, যতই নর ও নারী পরস্পর পরিচিত হয় ততই উভয়ে উভয়ের অন্তরের সৌর্ন্দযে মুগ্ধ হয়।

“সাধকের কাছে প্রথমেতে ভ্রান্তি আসে
মনোহর মায়া কায়া ধরি, তার পরে—
সত্য দেখা দেয় ভূষণবিহীনরূপে
আলো করি অন্তর বাহির।”

সে সত্য, যে সৌন্দর্য কি? এক কথায় বলিতে গেলে সে সৌন্দর্য প্রেম,—যে প্রেমে লোক আপনা ভুলিয়া যায়। পৃথকত্ব ভুলিয়া যায় পরস্পরের সুখ, দুঃখ, সংসার, সম্বন্ধ আপন বোধ হয়। সেই আত্মহারা প্রেম হইতেই সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠে। সেই প্রেম হইতেই সমস্ত ব্যবহার, সমস্ত কার্য, সমস্ত সেবা, সমস্ত ক্রীড়া, সুসংগত ও মধুময় হইয়া উঠে। সে সৌন্দর্যের কাছে বাহ্যিক রূপের সৌন্দর্য হার মানে। সে সৌন্দর্যের কাছে—

“এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয়
মৃত্তিকার মূর্ত্তি শুধু নিপুণ চিত্রিত
শিল্প যবনিকা।”

এই শিল্প যবনিকার অন্তরালে প্রকৃত রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, সুরূপ কুরূপ তখনই চিনিতে পারা যায়। রূপের সাধিকা নারী, সাধন পথে কতদূর অগ্রসর হইয়াছে তখনই বুঝিতে পারা যায়। তখন কথায় কথায় তার রূপের পরিচয় পাওয়া যায়। সেই প্রেম রূপ বিনা সিদ্ধিলাভের কোথাও কোন আশা নাই। যদি তোমার প্রেম না থাকে নারী! তবে সংসার তোমার মরুভূমি, সুখ তোমার চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে জানিও। কিন্তু যদি তোমার হৃদয়ে প্রেম থাকে তাহা হইলে তুমি অনন্ত গুণের, অনন্ত সুখের, অনন্ত রূপের অধিকারিণী হইয়াছে। তোমার দুঃখ দারিদ্র্য কষ্ট আর নাই শুধু সংবেদনা, সহানুভূতি, অনন্ত আনন্দের ভাণ্ডার দেখিতে পাইবে। তখন সকল আদর্শ তোমার মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। কবির অভিপ্রেত “কার্যে সঙ্গিনী, ক্রীড়ার

সাথী, পরামর্শে মন্ত্রী, যত্নে মাতৃসমা, লালিত কলায় প্রিয়াশিষ্যা” শয়নে, স্বপনে, নিদ্রায়, জাগরণে শান্তিদারিণী হইয়া নরের আদর্শ সঙ্গিনী হইতে পারিবে। নারীকে কঠোর কর্ম জগতের সাহায্যকারিণী হইতে হইবে আবার নারী সুলভ, কোমলতা, নম্রতা, মধুরতার আবার হইতে হইবে—“নারী যদি নারী হয় শুধু শুধু ধরণীর শোভা, শুধু ভালো, শুধু ভালবাসা, শুধু সুমধুর ছলে শতরূপ ভঙ্গিমার পলকে পলকে লুটায়ে জড়ায়ে বেঁকে বেঁকে হেসে কেঁদে সেবার সোহাগে ছেয়ে চেয়ে থাকে সদা তবে তার সার্থক জনম কি হইবে কর্ম্মকীর্ত্তি বীর্যবল শিক্ষা দীক্ষা তার।”

কল কল কুলুনাদিনী গিরিনদীর মত পবিত্রতাময়ী নারী প্রেমের বন্যায় নেচে হেলে সংসারের দুঃখ তাপ ভাসাইয়া দিয়া তাহার চিত্রবাঞ্ছিত নরহৃদয়ে অনন্ত মিলনে মিলিত হইবে সে। সে মিলনে আকাশে বাতাসে মনে প্রাণে অন্তরে বাহিরে শুধু প্রেমের সুমধুর স্বপ্নের ছবি ফুটিয়া উঠিবে। তাহারই স্মৃতি সহায় করিয়া উন্মনা উদাসীন, নিষ্ক্রিয় নর কর্ম্মকঠিন জীবন-পথে অগ্রসর হইবে। নারী প্রেমামৃতে সেবায় সোহাগে তাহার দুঃখ তাপ অশান্তি দূর করিয়া দিবে ইহাতে নারী জীবনের সার্থকতা ও সিদ্ধি এবং ইহাতেই নারীর আদর্শরূপ ফুটিয়া উঠিবে।

বিখ্যাত রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীপণ্ডিত— বার্ক দাম্পত্যজীবনে বড়ই সুখী ছিলেন। তিনি তাহার স্ত্রীর রূপ সম্বন্ধে লিখিয়া গিয়াছেন যে “তাদের গঠন বর্ণ ও অবয়ব বিশেষ সুন্দর হইলেও সে সৌন্দর্য্যে আমি তত মুগ্ধ ছিলাম না, যত মুগ্ধ ছিলাম তাহার ব্যবহার মাধুর্য্যে, সদহৃদয়তায়, নির্দোষ চালচলনে এবং আমার সুখদুঃখের প্রতি তীক্ষ্ণ লক্ষ্য রাখায়। তাহার মুখ দেখিলেই তাহার মনের ভাব মুখে প্রকাশিত দেখা যাইত। তাহার ভদ্রতা জ্ঞান স্বাভাবিক ছিল। তাহার সংকল্পের দৃঢ়তা ছিল বটে কিন্তু তাহা হৃদয় দুর্ব্বলতাশূন্য কোমলতা ও নম্রতা মিশান ছিল। সকলে তাহার রূপের প্রশংসা করিত না বটে কিন্তু সে আমার হৃদয়ের মূর্ত্তীমতী আনন্দস্বরূপনী ছিল।”

একমাত্র প্রেম হইতেই উক্ত গুণগুলি বিকশিত হয়। প্রেমই নারীকে মধুময়, কর্তব্যপরায়ণ ও অপরূপ রূপবতী করে। প্রেমের রূপই নারীর প্রকৃত আদর্শ রূপ। ইহাতেই নারীর বিশেষত্ব নিহিত। নারী ভিন্ন এমন মধুর সুখে দুঃখে অবিচ্ছিন্ন, ত্যাগ-

মন্ত্রপুত, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-প্রদায়ী প্রেম—জগতে আর কেহ কাহাকেও নিতে পারে নাই। এ প্রেম অপার্থিব। প্রেমই ইহার একমাত্র মূল্য। এই প্রেমের বলে সীতা সাবিত্রী দয়মন্তী স্বামীর দুঃখ দারিদ্র্যে ছায়ার মত সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। এই প্রেমের বলে কর্ম্মদেবী অকাতরে নিজ হস্ত কাটিতে পারিয়া ছিল ও স্বামীর চিতায় রক্তমাংসের দেহটাকে কাঠখন্ডের ন্যায় নিক্ষেপ করিয়া স্বামীর আত্মায় মিলিতে গিয়াছিল। এই প্রেমের বলে আত্মমর্য্যাদা রক্ষার্থ কত শত রাজপুরসীমন্তিনী জহরব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিতে পারিয়াছিল। তাহাদের রূপ যৌবন ধ্বংস হয় নাই, অনল নির্ব্বাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের রূপ উজ্জ্বলতর রূপে ফুটিয়া উঠিয়া বিশ্ববাসীর নয়নসমক্ষে চিরবিরাজমান রহিয়াছে।

ভাবজগতে কোমলতাই নারী কঠোরতাই পুরুষ। কিন্তু তথাপি অবিমিশ্র কোমলতাই নারী ও অবিমিশ্র কঠোরতাই একথাও ঠিক হয় না। নারীতে কোমলতার মধ্যে কঠোরতা, পুরুষে কঠোরতার মধ্যে কোমলতাই আদর্শ। সতী যখন দক্ষযজ্ঞে শিবনিন্দা শ্রবণে প্রাণত্যাগ করিল, সীতা যখন স্বামীর সহিত বনগমন—ক্লেশ স্বীকার, দশানন গৃহে শত লাঞ্ছনা, ক্লেশ সহ্য করিয়াও লঙ্কাপতি প্রদত্ত ভোগ সম্পদ ঘৃণায় প্রত্যাখান করিল, পদ্মিনী যখন আত্মসম্মান রক্ষার্থ অনলে প্রবেশ করিল তখন আমরা আদর্শ নারীর কোমলে কঠোরতায় পূজা করি। তখন তাহাদের নারীর রূপের উপর দেবীর রূপের উজ্জ্বল বিকাশ হয়। সে রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। প্রেমেই নারী দেবী হয়। নারীই প্রেম, প্রেমই নারী। এমন নারীকে পাইয়াই নর প্রেমের রাজ্যে রাজার সুখ সম্পদ উপভোগ করে, দেবীপতি দেবতা হয় প্রেমময় রূপের অধিকারী ভগবানে সান্নিধ্য লাভ করে।

গঙ্গাযাত্রী ও প্রাকৃতিক দৃশ্য।

এই বর্ষের ১৮ই মার্চ আমার জীবনের পরম আনন্দের দিন বলিয়া চিরস্মরণ থাকিবে। এই দিন অপরাহ্ন ৩টার ট্রেনে রংপুর হইতে মনিহারী যাত্রা করি, কাটিহার পর্যন্ত নির্বিঘ্নে পঁহুছিলাম পথে বিশেষ কিছু হুর-হাঙ্গামা ছিল না। কাটিহারে ট্রেন বিভ্রাট-ট্রেন থামিয়াই আলো নিবাইয়া দিল। জানিতে পারিলাম কয়েকখানা গাড়ী

কাটিবে, দেখিলাম যাত্রীদের কষ্ট হইবে। এমন সময় একজন গার্ডের সাক্ষাৎ পাই, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, গাড়ী কি কাটিবেন? উত্তরে বললেন হাঁ। আমি তাঁহাকে অনেক বুঝাইয়া বলিলাম, একে ট্রেনের অভাব, তাহার উপর যদি এ ট্রেনের গাড়ী কাটেন, তবে যাত্রীদের কিরূপ কষ্ট, কেমন দুর্দশাপন্ন হইবে অবশ্য বুঝিতে পারেন। গার্ড বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন আর গাড়ী কাটা হইবে না। তখন সমস্ত ধাত্রী গাড়ীতে উঠাইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি প্রভাত হইল, পূর্বাকাশে তরুণ তপন সোনার থালার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। সমস্ত যাত্রীগণ গঙ্গার প্রীতে হরিধ্বনি দিতে লাগিল। সূর্য্য ক্রমশ আকাশে উঠিতে লাগিল, এঞ্জিন গাড়ীতে যুক্ত হইল, পরক্ষণেই ট্রেন ছাড়িল। মণিহারী স্টেশন পার হইলে গঙ্গার শোভা নয়নপথে পতিত হইল। ট্রেন যতই অগ্রসর হইতে লাগিল, ততই গঙ্গার বিশাল বিস্তীর্ণ সুপ্রস্থ মনোহর তীরভূমি দর্শন করিয়া মন বিমুগ্ধ হইতে লাগিল। তৎপর মণিহারী স্টেশনে পঁহুছিলাম। টিকিটবাবুরা টিকিট লইতে লাগিল। কারণ ঘাটে লোক আটক করার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। কয়েকখানি গাড়ীর টিকিট লইয়াই ট্রেন ছাড়িল। আবার সেই শোভা-সৌন্দর্য দর্শন করিতে করিতে ঘাটে চলিল। ঘাটের নিকটবর্তী হইয়া ট্রেন থামিল। সেখানে দেখি কতগুলি ঘর রহিছে। এখনে সমস্ত যাত্রীদের টিকিট লইল। আমি এর বৃত্তান্ত কিছুই জানি না, অনেক যাত্রী এখানে নামিবার জন্য উদ্যত। কিন্তু স্টেশন মাষ্টার ও রেল কোম্পানীর কর্ম্মচারীগণ নিষেধ করিল। নিষেধ মধ্যে আবার ট্রেন ছাড়িল। আস্তে আস্তে ঘাটে পঁহুছিলাম। সকল ধাত্রী ট্রেন হইতে অবতরণ করিয়া গঙ্গার ঘাটে গেল, তখন সকলের মনে একটা কি আনন্দের যেন লহরী খেলিতেছিল তৎপর এমন সময় তরঙ্গ-ভঙ্গ-ফেন মণ্ডিত গঙ্গার বিশালবক্ষের উপর দিয়া বাষ্পীয় পোত মন্থর ও মরাল গতিতে আসিয়া ঘটে পহুছিল। তখন সকলে ষ্টীমার দেখিবার জন্য ঘাটে গেলান এবং ক্যাপ্টেনকে বলিয়া ষ্টীমারে আরোহণ করিলাম। সমুদয় দেখা হইতে না হইতেই ষ্টীমার ছাড়ার জন্য হুইসেল পড়িল। তখন সকলে ষ্টীমার হইতে নামিয়া বাসস্থানের খোঁজ করিতে লাগিলাম। এই সময় বেল প্রায় ১২টা। সকলে অনাহারী আবার পূর্ববরাত্রেও আহার হয় নাই। একে বসন্তের প্রখর রৌদ্র তাহাতে আবার বালুকার উপর মেলার স্থান। এই দুইয়ের মিলনে যে কি ভাব ধারণ করে তাহা যে ভুক্তভোগী তিনি অবশ্য বুঝিতে পারেন। এইরূপ তাপক্লিষ্ট হইয়া অনাহারে সকলে ক্লান্ত হইয়া পড়িল। মেলার ম্যানেজার আমাদের থাকিবার জন্য একটা খড়ের ঘর ও দুইটা তাঁবু খাটাইয়া দিল। আমরা আগে জল খাওয়ার বন্দোবস্ত করিলাম পরে

ধীরে ধীরে পাকের সামগ্রী যোগাড় করিয়া রান্না করা হইল। সকলে সমবেত হইয়া আহার করিলাম। এ দিকে সূর্যদেব ধীরে ধীরে আগুন কর্ম্ম শেষ করিয়া পশ্চিম দিকে অস্তাচলে গমন করিল। যখন সূর্য সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইতেছিল তখন গঙ্গার বক্ষ এক অপূর্ব দৃশ্যে পরিণত হইল। ওপারের রাজমহল পর্বত ধূলায় ধূসরিত হইয়া ধূম্রবর্ণ ধারণ করিল, তাহা দেখিয়া যেন মনে হইল, প্রকৃতি দেবী সকলকে বলিয়া দিতেছে যে, হে মানবগণ! শীঘ্রই গভীর রজনী ঢাকিয়া ফেলিবে, তোমরা আপন আপন, বাসগৃহে নিরাপদে থাকিবার জন্য গমন কর। আবার বৃক্ষের শোভা সন্দর্শনের মনে হইতেছে যেন বৃক্ষ সকল শাখা বাহু বিস্তার করিয়া হেলিয়া-দুলিয়া ঈশ্বরের সান্ধ্য আরাধনায় নিযুক্ত হইবার জন্য সাজ সাজ বলিয়া লোকের জ্ঞান ও ভগবৎপ্রীতি সঞ্চার করিয়া দিতেছে। ক্রমে ক্রমে গভীর অন্ধকার আসিয়া জগৎ আক্রমণ করিল। আপনি শ্রেণীতে সাজাপ্রদীপ আকাশের তারকারাজির ন্যায় ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল তখন সমস্ত দিনের তাপক্লিষ্ট মন শান্তিরসে আপ্লুত হইয়া এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। আমাদের পাচক নৈশাহারের জন্য পাকে নিযুক্ত হইল। রাত্রি অনেক হইল আমরা নৈশাহার সমাপন করিয়া তাঁবুতে শয়ন করিলাম। আমি শয়ন করিয়া তাঁবুর দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলাম, আকাশ পানে চাহিতেই তাঁবু ভেদ করিয়া আকাশের তারকারাজির শোভা নয়নে পতিত হইল। এই তারকারাজি দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলাম। রাত্রি প্রভাত হইল, পক্ষীগণ চারদিকে ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিলাম। পূর্বদিকে তরুণ তখন উদিত হইল। বসন্তের আকাশ সমস্ত রাত্রি নির্মল ছিল। রাত্রিকালীন শিশিরবিন্দু দুর্ব্বাঘাসে পড়িয়াছিল, প্রভাতের সূর্য্যের কিরণ পতিত হওয়ায় ঐ শিশিরবিন্দু ঝক্ ঝক্ করিতেছে তাহা দেখিতে দেখিতে সহসা পরপারের সেই রাজমহলের প্রতি দৃষ্টি পড়িল। রাজমহলে এই বালসূর্য্যের কিরণপাতে পর্বতের দৃশ্য অতীব মনোহর ও মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল, কোথাও বা প্রাসাদের মণি-মুক্তা-খচিত দৃশ্যের ন্যায় দেখাইতেছিল। কোথাও বা স্বর্ণের ন্যায় বাক্ বাক্ করিতেছিল, যেখানে সূর্য্যের কিরণ পতিত হইতে পারে নাই তথায় অমাবস্যর নিশির গভীর অন্ধকারের ন্যায় ভয়ঙ্করভাব দেখাইতেছিল। এইরূপে প্রকৃতির নানাপ্রকার শোভা সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে স্ব স্ব কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলাম। দিনের পর দিন কাটিয়া চতুর্থ দিনে স্বদেশে যাত্রা করিলাম। আমি প্রিয়তম সহচর শ্রীমান কিশোরীমোহন রায় সহ দিনাজপুর ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম তখন রাত্রি প্রায় ২টা,

বিনা আলোতে হাঁটিয়া বাসা যাইবার উপায় নাই। কাজে কাজেই ষ্টেশনে অবস্থান করিতে হইল। পরদিন প্রাতে ষ্টেশনে আমার পূর্ব্বপরিচিত এক বন্ধুর সহিত দেখা হয়। তাহার সহিত আলাপাদি শেষ করিয়া শ্রীমানকে টাউন দেখাইতে ছলিলাম। টাউনের প্রায় অনেক স্থান দেখাইয়া লায়ণ হোষ্টেলে আহার করিয়া আবার কিয়দংশ দেখাইয়া ৩টার ট্রেনে রওনা হইয়া রাত্রি ৮৷৷ টার সময় রঙ্গপুর পঁহুছিলাম।

শ্রীবাবুরাম রায় বর্মা।
সাং গোন্দল গ্রাম।
পো: সুন্দরপুর।
জেলা দিনাজপুর।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালায় বাধ্যতামূলক

সামরিক শিক্ষার আয়োজন।

দৈনিক বসুমতী হইতে উদ্ধৃত।

বাঙ্গালায় বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্তনের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত ডাঃ এস, কে, মল্লিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ফেলো’দিগকে অনুরোধ করিয়া সম্প্রতি একখানি পত্র লিখিয়াছেন। আমরা নিম্নে ঐ পত্রের সারমর্ম্ম প্রদান করিলাম :—

স্বদেশ ও জন্মভূমিকে বিদেশি আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিও সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থার জন্য যে আইন, সেই আইনই সর্বশ্রেষ্ঠ আইন। পুরাকালে আমাদের দেশে সামরিক শিক্ষার জন্য এইরূপ আইন প্রচলিত ছিল। তখন যে রাজা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী না হইতেন তিনি রাজ্যশাসনের অনুপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মুসলমান শাসনকালেও প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তি প্রথমে সৈনিকরূপে তারপর

সাধারণ ভদ্রলোকরূপে আত্মপরিচয় দিতেন, তখন যে কেবলমাত্র ভদ্রপরিবারভূক্ত ব্যক্তিগণই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিয়া স্বদেশ রক্ষার্থে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাহা নয়; তাহাদের আত্মীয় স্বজন ও অধীনস্থ কর্মচারীবৃন্দ তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া যুদ্ধবিতা শিক্ষা বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। ফলে, শৈশবকাল হইতেই সকলের মনেই যুদ্ধবিদ্যা, শিক্ষার নিমিত্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত।

কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। ভারতীয়গণ এক্ষণে সহায়হীন ও ভগ্নোৎসাহ। যাহারা যত উচ্চবর্ণের, ব্যায়ামচর্চা ও যুদ্ধবিজ্ঞা শিক্ষার প্রতি তাহাদের তত বিতৃষ্ণা। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত সামান্য জ্ঞানার্জন করাই বর্তমান শিক্ষা প্রণালীর উদ্দেশ্য। ভারতীয়গণ ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন বলিয়া তাঁহাদিগকে পুনর্ব্বার নবভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভারত সরকার গত ১৯২০ সালে ইন্ডিয়ান টেরিটোরিয়াল অ্যাক্ট নামে এক আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন। যে সমস্ত ভারতবাসী স্বেচ্ছায় সামরিক বিভাগে যোগদান করিতে ইচ্ছা করেন, উক্ত আইনে বলে "তাহাদিগকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবার নিমিত্ত সামরিক বিভাগে নেওয়া হইতেছে। যদি যথেষ্ট লোক এইরূপভাবে স্বেচ্ছায় সামরিক বিভাগে যোগদান করেন, তাহা হইলে রাজ্য রক্ষার্থ স্থায়ী বেতনভুক্ত সৈনিকের প্রয়োজনীয়তা অনেকটা কমিয়া আসিবে।

আমি সেই হেতু আপনাদের বিবেচনার্থ এক্ষণে নিম্নলিখিত প্রস্তাব উপস্থাপিত করিতেছি।

(১) প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ৭ হইতে ১২ বৎসর বয়স্ক প্রত্যেক ছাত্রকে "বয় স্কাউট" রূপে শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) সেকেন্ডারি স্কুলে ১২ হইতে ১৬ বৎসর প্রত্যেক ছাত্রকে ব্যায়ামচর্চ্চা ও সামরিক ছিল শিক্ষা করিতে হইবে এবং উচ্চ শ্রেণীতে উন্নীত হইতে হইলে ঐ বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে হইবে।

(৩) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকে বাধ্যতামূলক সাময়িক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে এবং যে ছাত্র সামরিক শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে না পারিবে, তাহাকে পরীক্ষায় পাশ বলিয়া গণ্য করা হইবে না।

এতদ্ব্যতীত চাকরী দিবার সময় বাহারের যুদ্ধবিচার অভিজ্ঞতা আছে, তাহাদিগকেই যদি লওয়া হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, অনেকেই বিশ্বের মনোযোগের সহিত সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিবে, ফলে দেশের ও সরকারেরই উপকার সাধিত হইবে।

জাপানবাসীদিগকে নানা উপায়ে সামরিকভাবে অনুপ্রাণিত করা হইতেছে তথায় একটি সুন্দর প্রথা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। যখন কোন বলপূর্ব্বক নিযুক্ত সৈনিক স্থায়ীভাবে সৈন্যবিভাগে প্রবেশ করে, তখন তাহার জন্য তাহার গৃহে বিশেষ সমারোহের সহিভ এক শুভকার্য সম্পন্ন করা হয়। ইহা তাহাদের পক্ষে নবজীবন লাভ করা। আমাদের দেশেও এই প্রকার এক নিয়ম আছে। যখন ব্রাহ্মণ বালকগণ যজ্ঞোপবীত গ্রহণ করিয়া নবজীবন লাভ করে, তখনও এইভাবে শুভকার্য সম্পন্ন হয়।

বাঙ্গালায় এই প্রকার সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইলে দেশের যে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইবে, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। আমি জানি, অনেকে এ সম্বন্ধে ঠাট্টা বিদ্রূপ করেন। বাঙ্গালীদের ওয়াজীরিদের ন্যায় শক্তি ও সামর্থ্য নাই —এ কথা সত্য; কিন্তু তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধি যথেষ্ট আছে। সামরিক শিক্ষায় এই সমস্ত সদগুণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। আমার বিশ্বাস, বাঙ্গালী জাতিকে যদি সুবিধা দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাহারা স্বদেশ রক্ষার্থে ভবিষ্যতে যথেষ্ট বল সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইবে।

বসুমতী।

হিন্দু মহাসভা—

গত ১৩ই আগষ্ট তারিখে কাশীধামে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার এক অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভায় বেনারস হিন্দু ইউনিভারসিটির সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ, জয়পুরের পণ্ডিত গিরধর শর্মা, পাটনা হইতে বাবু জগৎনারায়ণ লাল, এলাহাবাদ হইতে পণ্ডিত রামাকান্ত মালব্য, শ্রীস্বামী দয়ানন্দ, অধ্যাপক গঙ্গাপ্রসাদ, মেটা প্রসাদ, মিষ্টার গুরুপ্রসাদ ধবন এবং পণ্ডিত দেবরতন শর্ম্মা মহাশয়গণ উপস্থিত ছিলেন।

হিন্দু মহাসভার সম্পাদক শ্রীযুক্ত দেবরতন শর্ম্মা মহাশয় জানাইয়া ছিলেন যে গত ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার সভার পর হিন্দু মহাসভার ৩৬২টা শাখা স্থাপিত হইয়াছে। যুক্ত প্রবেশে ১৬০, পঞ্জাবে ৬৫, বেহার উড়িষ্যায় ৬৫, বম্বেতে ২২, মধ্যপ্রদেশে ১৬, বাঙ্গালায় ১১, মাদ্রাজে ১১, বর্ম্মার ৩, রাজপুতানার ৩, আসাম, মধ্যভারতে, কেনিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড, মেসোপতিমিয়া প্রভৃতি প্রত্যেক স্থানে এক একটা শাখা সমিতি এ যাবত স্থাপিত হইয়াছে।

অতঃপর প্রত্যেক জেলায় ও তহশীলে শাখা গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। গঠন কার্য্যের জন্য প্রত্যেক প্রদেশে উপযুক্ত ব্যক্তি নিয়োগ এবং উপদেশক ও প্রচারক নিয়োগ ক্ষমতা সভাপতির উপর ন্যস্ত করা হয়। অসহায় স্ত্রীলোক ও সন্তানদিগকে রক্ষার জন্য বনিতাশ্রম, অনাথ আশ্রম স্থাপিত করা ও সেবকদল গঠনের প্রস্তাব গৃহীত হয়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে হিন্দু মহাসভার নেতাগণকে গঠন কার্য্যের জন্য ও মহাসভার ধনভাণ্ডার পরিপুষ্টিকল্পে অর্থ সংগ্রহের জন্য সকল স্থানে যাইতে অনুরোধ করা হইবে।

(সৌজন্যে: গিরীন্দ্রনাথ বর্মন, সমাজ সংস্কারক, মাথাভাঙ্গা)

Call for Papers

Scope: Any aspects of arts related to South Asia. Special focus on History, Orality, politics and Bengali language and literature.

Frequency of publication: Two issues per year (January-June & July- December).

Manuscript Submission Guidelines for the Contributors:

1. **MANUSCRIPT**: All articles should be submitted to the Editor, as an email word.doc attachment to editor.kshatriya@gmail.com. The format should be with ample margins on all sides and a regular number of lines per page. The cover page should carry only the title of the article and the author's name, and addresses (both postal and e-mail). This should be followed by an abstract of 100-200 words on a separate page and 4–5 keywords to enhance online access in the future. The manuscript should be **3500-5000** words. Follow 12 font, Times New Roman with double space for articles in English, but Kalpurus, 12 font with double space should be followed in Bengali. Book reviews are also invited of about 1000–1500 words.
2. Use a clear readable style, avoiding jargon. If technical terms or acronyms must be included, define them when first used. Use non-racist, non-sexist language and plurals rather than he/she.

3. **SPELLINGS:** Where alternative forms exist, choose '-ise' spellings instead of '-ize'. Thus most words with that ending ('recognise', 'organise', 'civilise' etc.,) will be spelt with an 's'. Use British spellings in all cases rather than American (hence, 'programme' not 'program', 'labour' not 'labor', and 'centre' not 'center').
4. **Language:** Bengali/ English.
5. **ABBREVIATIONS:** No stops are needed between capitals: e.g., CPI, INTUC, MP, MLA. Short forms likely to be unfamiliar to some readers should be spelt out in full the first time they occur. Please avoid 'i.e.' and 'e.g.' in the text but use them in notes if you wish.
6. **NUMBERS**: Write numbers in figures (rather than words) for exact measurements and series of quantities, including percentages. In a more general description, numbers below 10 should be spelt out in words. Use thousands, millions, billions and not lakhs and crores. In text use 'per cent', in tables the symbol '%'. Write '0.8' rather than '.8', except for levels of probability.
7. **QUOTATIONS**: Use single quotation marks, reserving double quotation marks for quoted words within a quotation. Spellings of words in quotations should not be changed. No quotation marks are required for longer passages (i.e., 45 words or more) broken off from the text.

Please mention the author's title and the title of the works in the endnotes in short forms as follows:

1. Hughes, *Networks of Power*, p. 23. [For Books]
2. Ray, 'Agrarian System of Cooch Behar State', pp. 232-33. (for article)
3. Ghosh A., et al (ed.), Brita Bibarani, p. 56 (more than one editor for a book)

The whole information for archival documents in the endnotes

1. Annual Administrative Report for the Cooch Behar State (Henceforth AARCB), 1909-1910, dated 12 June 1911, p. 12.

The following example illustrates the style to be followed in the Bibliography/ references:

The primary and Secondary References should be listed in alphabetical order of author, giving the surname first followed by initials or first name. Where more than one publication by the same author is referred to, please list them in chronological order.

Books:

Srinivas, M.N., Social Change in Modern India, New Delhi: Orient Longman Pvt. Ltd., 2007

Edited Volumes:

Troll, C.W., ed., *Muslim Shrines in India: Their Character, History and Significance*, Delhi: Oxford University Press, 1989.

Articles in Journals:

Ray, P. 'Subaltern Renaissance: Thakur Panchanan Barma & Rajbanshi Society' Journal of East-West Thought, Vol 13 (9), 2023, pp. 97-109.

Articles in Edited Volumes:

Gaeffke, P. ‘Alexander and the Bengal Sufis’, in Alan W. Entwistle and Francoise Mallison, eds, *Studies in South Asian Devotional Literature, Research Papers, 1988–1991*, New Delhi: Manohar, 1994, pp. 278–84.

***Declaration** should be provided by the contributor(s) in a separate sheet that his/her concern work is original and it is his/her own work and has not been published before.

*Facts and opinions in articles published are solely the personal statements of respective authors. Authors are responsible for all contents in their articles including the accuracy of facts, views, statements, citing of resources, and so on. Editors and Publishers have no liability for the violations of third-party rights.

*The decision of the Editorial Board is final regarding the selection and publication of the articles.

* All types of communication should be done through email.

Contact mails: editor.kshatriya@gmail.com

Editorial Team
Kshatriya